॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

১. বঙ্কিম উপন্যাসের পটভূমি : বঙ্কিমচন্দ্রের মানসজগৎ

২. বঙ্কিম উপন্যাসের সমাজ : যথাযুগীন আলোচনা ও সমালোচনা

।। বঙ্কিম উপন্যাসের পটভূমি : বঙ্কিমচন্দ্রের মানসজগৎ ।।

১.

[redacted] ঔপন্যাসিকের উপন্যাস রচনা তাঁর মানসজগতেরই শিল্পরূপায়ণ। আর লেখকের এই মানসজগৎ বহির্জগতের নানা প্রকার বাস্তব কার্যকারণের দ্বারা সামগ্রিক যোগফল। বিশেষ সমাজ পরিবেশ, সেই পরিবেশে লেখকের বিশিষ্ট সামাজিক অবস্থান, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ সংঘাত, দেশের বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় অবস্থা, অর্থনীতির নানা টানাপোড়েন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বহির্জাগতিক বিষয়সমূহ লেখকের মানসিক জগৎ গড়ে তোলে। এই সব জটিল ও বিচিত্র বাস্তব কার্যকারণ ছাড়াই শুধু মাত্র 'জনশক্তির স্বাধীন চিন্তাবিকাশ নতুন নতুন চিন্তা ও মতবাদের পথ প্রশস্ত করেছে'[১] এসবের 'স্বাধীন' মতবাদ আমাদের আলোচনার সহায়ক হবে না এবং সত্য খোঁজাতেও সাহায্য করবে না। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের মানসজগতের বিশিষ্ট রূপায়নের কার্যকারণ আমরা বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশের মধ্যেই খুঁজবো এবং তৎকালীন সমাজ পরিবেশে তাঁর চিন্তা কোন্ ভূমিকা পালন করেছে এটাও দেখবো। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক জগতের প্রস্তুতির সামাজিক পটভূমি আমরা লক্ষ্য করেছি। এখন দেখবো এই সামাজিক পটভূমি তাঁর মানসজগতকে কোন আকার দিল, আয়ত্ত করতে পারলেই বঙ্কিম উপন্যাসের সমাজ ও তার রূপায়ণ আমাদের বোঝা সহজ হবে। কেননা আমরা আগেই বলেছি ঔপন্যাসিকের উপন্যাস রচনা তাঁর মানসজগতেরই শিল্পরূপ মাত্র।

কিন্তু বঙ্কিমের মানসিক জগতের অনুসরণে বঙ্কিমজীবনী আমাদের কোন সাহায্য করে না। বঙ্কিমচন্দ্র আত্মজীবনী লেখেননি। তাঁর জীবনীসমূহ, যে কটি পাওয়া যায়, তার ভেতরে কিছু সন তারিখ ধরনের প্রয়োজন মেটা ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজন

ঘটে না। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত তাঁর সমকালীন সমাজ রূপান্তরে কোন সক্রিয় ভূমিকা নেননি, সামাজিক বিতর্কে প্রায়শঃই যোগও দেননি। [illegible] ফলে বঙ্কিম মানস বিশ্লেষণে বঙ্কিমের রচনার সাহায্যই সর্বপ্রধান। বিশেষতঃ বঙ্গদর্শন ও পরবর্তীকালে প্রকাশিত প্রচার - এই দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের রচনার মাধ্যমেই বঙ্কিমের মানসিকতাকে বুঝতে হবে। কিন্তু এখানেও কিছু অসুবিধা থেকে যায়। আবার ইতিহাসে দেখা যায় কালের বিবর্তনে কোন একটি শব্দের অর্থের সংকোচন প্রসারণ ও পরিবর্তন ঘটে। একই নিয়মে কালের বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে মানুষের ভাবনারও পরিবর্তন প্রসারণ ঘটে। যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোভাবজ্ঞাপক 'স্বাধীনতা' 'স্বদেশিকতা' ইত্যাদি শব্দ বর্তমানকালেও ব্যবহৃত হয় বটে এবং তবে তার অর্থ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ভিন্ন; এমনকি বর্তমানকালেও, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে। তাই দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন রচনার বিভিন্ন অংশ তুলে সম্পূর্ণ রচনার বক্তব্য থেকে আলাদা করে, ঐ ধরনের ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত [illegible] বা বস্তু শব্দকে আধুনিক প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং তার দ্বারা সমালোচকের প্রয়োজন সিদ্ধ হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতা বুঝতে আমাদের কোন ভাবেই সহায়তা করে না। যেমন 'স্বাধীনতা পরাধীনতা' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট ধারণা ও বক্তব্য আছে; সেই মূল বক্তব্যকে অস্বীকার করে কোন বিচ্ছিন্ন রচনা থেকে স্বাধীনতা শব্দযুক্ত কোন অংশ তুলে দিয়ে যদি আধুনিক অর্থে আমরা স্বাধীনতা বলতে যা বুঝি তা বোঝানো হয় তবে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে বটে, কিন্তু সত্যে পৌঁছতে আমাদের কোনভাবেই সাহায্য করে না। আমাদের আলোচনায় বঙ্কিমের বিভিন্ন রচনা থেকে প্রবন্ধ অখণ্ডিতভাবে উদ্ধৃতি ব্যবহার করবো

যদিও, কিন্তু বঙ্কিমের মূল অভিপ্রায়ের সঙ্গে যুক্ত করেই আমরা তা ব্যবহার করবো, বিচ্ছিন্নভাবে নয়।

'দেশাত্মবোধ তাঁহার প্রতিভার মূল উৎস' [২] এই ধারণা থেকে প্রায় প্রত্যেক সমালোচকই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণে তাঁর স্বাদেশিকতা প্রথম ও প্রধান সূত্র হিসেবে অবলম্বন করে থাকেন। [৩] তাদেরই মনে বঙ্কিমের মানস পরিচয় সন্ধানে ভারত-কলঙ্ক, বাঙালীর ইতিহাস, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, বাঙলার কলঙ্ক, বঙ্গদেশের কৃষক ইত্যাদি প্রবন্ধের দ্বারস্থ হন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় সন্ধানে এইসব প্রবন্ধ অবশ্যই জরুরী, কিন্তু এইসব প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু বিচ্ছিন্ন চিন্তার সন্ধান দেবে। বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যাসাগর পরবর্তীযুগের যুগস্রষ্টা একথা সর্ববাদী সম্মত, এবং এই যুগস্রষ্টা হিসেবে তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনার ভেতর দিয়ে সেকালের উপযোগী এক জীবনের প্যাটার্নের অনুসন্ধান করেছেন, দেশভাবনা যেখানে তাঁর সেই অনুসন্ধান ও আকাঙ্ক্ষিত জীবনের প্যাটার্নের অন্তর্ভূত একটি অংশ মাত্র। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণে আমরা তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধের প্রধানতঃ সাহায্য নেব, কেননা 'এই গ্রন্থই এক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনব্যাপী ধ্যান ও চিন্তার পরিণত ফল - তাঁহার অন্তর্জীবনের ইতিহাস বা আত্মপরিচয়ও ইহাতে মিলিবে।' [৪] ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত বঙ্কিমের জীবনের প্যাটার্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বোক্ত প্রবন্ধ-সমূহের সাহায্য নেব। ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত জীবনের প্যাটার্নকে ধরতে পারলে বঙ্কিমের প্রবন্ধ আলোচনায় সমালোচক যে বঙ্কিমের মতামতে 'অসঙ্গতি'র সম্মুখীন হন তার সমাধান হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস এবং আমরা দেখবো যে এই 'অসঙ্গতি' বঙ্কিম ব্যাখ্যাত জীবনের প্যাটার্নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বঙ্কিমের বহু বিষয় সম্পর্কে মতামতকে সম্প্রতি প্রচলিত অর্থে

গ্রহণ করতে গিয়েই জনমতির সম্মুখীন হই, আর এই আধুনিক কালের ব্যাখ্যা প্রয়োগ করতে গিয়ে বঙ্কিমব্যাখ্যাত জীবনের প্যাটার্নকে ভেঙে ফেলি ।

২.

১৮৮৮ সালে ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় । তার আগে ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস থেকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত নবজীবন পত্রিকায় খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, ১২৯২ এর চৈত্র পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে কিছু সংশোধন সংযোজন করেন । ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত বঙ্কিমভাবনা বঙ্কিমমানসের পূর্ব প্রকাশিত রচনা সমূহে প্রণালিকাকারে ছড়িয়ে আছে, অর্থাৎ বঙ্কিমমানসে ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে তাঁর মনে লালিত হয়েছে ও গ্রন্থাকারে বিভিন্ন রচনায় প্রকাশিত হয়েছে, ধর্মতত্ত্বে তিনি তারই সেই বিভিন্ন ভাবনাগুলোকে একটি সামগ্রিক সূত্রে গ্রথিত করেছেন, জীবনের অথবা জীবনযাপনের একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন তিনি অনুসন্ধান করেছেন । তিনি লিখেছেন : 'অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব ?' 'লইয়া কি করিতে হয় ?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি ।'[৩] 'এ জীবন লইয়া কি করিব ?' না কি করা উচিত, কোন্ জীবনযাপন প্রণালীর মাধ্যমে জীবন সার্থক হতে পারে তারই পথপ্রদর্শন করেছেন তিনি ধর্মতত্ত্বে । ধর্মতত্ত্বে অবশ্যই তিনি হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গ্রহণ করেছেন । কেননা, 'যখন ধর্মশূন্য ইংরাজের শিক্ষায় শিক্ষিত, যদি হিন্দু-ধর্মের স্থান গ্রহণ করিবার শক্তি আর কোন ধর্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম রক্ষা

হিন্দু সমাজের আর কি গতি আছে ?' কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি এটাও জানেন যে 'শাস্ত্রোক্ত যে ধর্ম তাহার সর্বাংশ রক্ষা করিয়া কখনও সমাজ চলিতে পারে না' এবং 'একটা প্রচলিত হিন্দুধর্ম আছে; তৎকর্তৃক শাস্ত্রের কতক বিধি বর্জিত এবং কতক পরিত্যক্ত এবং অনেক অশাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার বিধি তাহাতে গৃহীত হইয়াছে' এবং তার ফলে' এই বিমিশ্র এবং কলুষিত হিন্দু ধর্মের দ্বারা হিন্দু সমাজের উন্নতি হইতেছে না।' কাজেই 'যেটুকু হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম, যেটুকু সারভাগ, সেইটুকু প্রকৃত ধর্ম সেইটুকুই অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত।'[৫] ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের 'সারভাগ' সন্ধান করেছেন। পরবর্তী উদ্ধৃতাংশটির সঙ্গে তাঁর এখানেই পার্থক্য। প্রশ্ন হতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মকেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য মনে করলেন কেন? শুধুমাত্র তিনি নিজে হিন্দু, সেইজন্যই? তা নয়। অন্যান্য ধর্মের সম্বন্ধেও আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: 'যদি বলেন যে, হিন্দুধর্মের পরিবর্তে ধর্মান্তরকে সমাজ আশ্রয় করুক, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, কোন ধর্মকে আশ্রয় করিতে হইবে? পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠধর্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম, এই তিন ধর্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার আসন গ্রহণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে, কেহই হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ইসলাম কতকগুলো বন্যজাতি এবং হিন্দুনামধারী কতকগুলো অনার্যজাতিকে অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্যসমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই। ভারতীয় আর্য হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম রাজার ধর্ম হইয়াও কদাচিৎ একখানি ক্ষেত্রের বা খোদের গ্রাম অধিকার, অথবা দুই একজন কুক্কুট-মাংস-লোলুপ যুবসম্প্রদায়কে দখল ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারে নাই।'[৬] অতএব 'শ্রেষ্ঠতম' ধর্মকেই তিনি গ্রহণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আর্য-জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন আর তাই 'ভারতীয় আর্য হিন্দু ছিল' জন্য তিনিও তাঁর ধর্মতত্ত্বে হিন্দু ধর্মকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই আর্য-জাতিতত্ত্বের ব্যাকুলতা থেকেই তিনি লেখেন, 'এমন কি হইতে পারে না যে, যখন আর্যেরা প্রথম বাংলায় আসেন, তখন অনার্যেরা বা কোন জাতীয় মনুষ্য বাংলায় বাস করিত না? এমন কি হইতে পারে না যে, আর্যেরা বাঙ্গালাকে শূন্য ভূমি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার পর অনার্যেরা আসিয়া বন্য ও পার্বত্য প্রভৃতি প্রদেশ খালি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল?'[৮] কিন্তু যখন জানা গেল 'আর্যেরা বাঙ্গালায় আসিবার পূর্বে বাঙ্গালায় অনার্যদিগের বাস ছিল।'[৯] ঠিক তখনই তার মনে জাগে বাঙালী 'আর্যবংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ কায়স্থাদিবংশ অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়াছেন।'[১০] এবং 'ভারতীয় আর্যদিগের বর্ণবৈষম্যহেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক স্রোত মিশিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয় নাই।'[১১] কেননা 'অনার্যজাতি যে আর্যজাতিদিগের অনার্যতা পরিত্যাগ করিয়া আর্য ধর্মগ্রহণপূর্বক হিন্দু হইয়াছে' এবং তার কারণ 'মনুষ্যের প্রকৃতিই এই যে, যে বড়, লোকে তাহার অনুকরণ করে।'[১২] বাঙ্গালার অধিক লোক অনুসারে[১৩] বাঙালী অধিকাংশ মানুষই নিম্নবর্ণের হিন্দু, অর্থাৎ 'অনার্যবংশজাত' হলেও 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালীর জাতি অন্যজাত।'[১৪] এটা মনে রেখেও, যখন বাঙালী ব্রাহ্মণ 'আর্যবংশজাত' এটা প্রমাণ করতে পারলেন তখন সগর্বে বলে উঠলেন: 'আমরা সেই প্রাচীন আর্যজাতি সম্ভূতই রহিলাম — বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্য। ... আর্যগণ বাঙ্গালায় অদ্ভুত কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যান নাই — আর্য কীর্তিতে উজ্জ্বল পৃথিবীতলে। এখন দেখা যাইতেছে, আমরা সে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী। সেই কীর্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদের পূর্বপুরুষ। রোমে, রোমে, গ্রীসে, মিশরাদির মত

আমরাও ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে ।'[১৩] তাই সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গজয়ের কাহিনী, যা বঙ্কিমচন্দ্র বারবার অস্বীকার করেছেন, তৎকালীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য প্রতিপন্ন করে মন্তব্য করলেন, 'সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে ।'[১৪] তাই বঙ্কিমচন্দ্র আর্যধর্ম হিন্দুধর্মকে তাঁর ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন ।[১৫]

৩.

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কার আন্দোলন যেমন শিক্ষিত বর্ণহিন্দু আন্দোলন তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টাও মূলতঃ এই শতাব্দীর শিক্ষিত বর্ণহিন্দুর আশাপ্রত্যাশার আকাঙ্ক্ষাজাত, বঙ্কিমচন্দ্রের আবেদনও তাঁদেরই কাছে । কেননা যে ধর্মকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চান 'তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সমাজে লোকপ্রিয় হইবে, আমার সেরূপ ভরসা আমি এক্ষণে রাখি না ।'[১৬] কিন্তু একই সঙ্গে তিনি এটাও জানেন যে 'জাতীয় ধর্মে জাতীয় চরিত্র গঠিত । যে জাতীয় ধর্ম বুঝে না, সেও জাতীয় ধর্মের অধীন নয়, জাতীয় ধর্মে তাহার চরিত্র শাসিত হয় । ধর্মের সূক্ষ্ম মর্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে । যে অল্পজন বুঝে, তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত্র শাসিত ও গঠিত হয় ।'[১৯] এই ধর্মতত্ত্বে ব্যাখ্যাত ধর্মের আবেদন তিনি ঠিক সাধারণ মানুষের কাছে করেন নি, তাঁর লক্ষ্য সেক্ষেত্রে 'মনস্বিগণ' এবং তিনি জানেন 'মনস্বিগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হইলে, ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে । জাতীয় ধর্মের মুখ্য ফল অল্পলোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণ ফল সকলেই পাইতে পারে ।'[২০] বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য তাই উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী, তাই বলেছেন : 'তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক - উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয় ।'[২১] কেননা তিনি জানেন ইতোমধ্যে সমাজ পরিবেশ প্রভৃতি পরিমাণে

হলেও পাল্টে গেছে, শিক্ষিত সমাজের জীবনযাত্রার প্যাটার্নে পরিবর্তন এসেছে, পাশ্চাত্য জ্ঞান ধারণার সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে শিক্ষিত শ্রেণীর একাংশের ভেতরে হলেও প্রগতিমনস্কতা জেগেছে, সমাজের অন্যান্য শ্রেণীরও মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়; এই অবস্থায় ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা নয়, তার পুনর্গঠনের প্রয়োজন। কেননা, ইতোমধ্যে বাবু দ্বারকানাথ মিত্রই শুধু জজ হননি, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন, যা পূর্বনির্দিষ্ট সামাজিক প্যাটার্নে সম্ভব ছিল না। পিতা যাদবচন্দ্রও সংস্কৃত পড়ে টোল খোলেননি, ইংরেজী পড়ে প্রথমে নিমক মহালে কাজ নেন ও পরে তিনিও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। বঙ্কিমচন্দ্রও টোলের পণ্ডিতের কাছে না গিয়ে মেদিনীপুরে টীড সাহেবের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। এসবকিছুই প্রমাণ করে যে পূর্ব-নির্দিষ্ট সামাজিক প্যাটার্ন এখন আর যথাযথভাবে দাঁড়িয়ে নেই। তাই উনিশ শতাব্দীর মনোভাবের উপযোগী বা গ্রহণযোগ্য করে তিনি ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। তবে একটি সত্য তিনি মানতেন: 'আমার প্রকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সত্য মিথ্যা।'[১] সেজন্যই, 'বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং, কি নিজের অগোচরে, হিন্দুধর্মের প্রায় মূল ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন।' (বঙ্কিমমানস, পৃ. ১১৫) অথবা তিনি 'প্রচলিত হিন্দু আচরণের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবেই আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছিলেন' (পৃ. ১৫০) এমন বলার কোন কোন কারণ নেই। জন্মান্তর-কর্মফল-বর্ণবিভাগের মূলভিত্তির উপরে, যে ভিত্তিটিই প্রকৃতপক্ষে সামন্ত-ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির নির্ভর ও সামাজিক গতিশীলতার বিরোধী, হিন্দুধর্মের সংস্কারে প্রয়াসী ছিলেন এবং হিন্দুধর্মের জন্মান্তর-কর্মফল-বর্ণবিভাগের ভিত্তির আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থন করার পরে 'মূলভিত্তি শিথিল' বা 'আঘাতের পর আঘাতের' কোন প্রশ্নই আসে না। আর সংস্কার যে পুরনো ব্যবস্থার ভিত্তিকেই শক্তিশালী করে ও আয়ু বাড়িয়ে দেয় একথা 'লেনিনবাদের ভিত্তি' আলোচনায় স্তালিনও বলেছেন।

ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : 'ধর্ম সুখের একমাত্র উপায়' । [১৩] ঊনবিংশ শতাব্দীতে জীবনের পরিবর্তনের সংগে সংগে যখন আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে মানুষের, শহুরে শিক্ষিত মানুষের জীবনের বিচিত্র বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য যখন জীবনযাপনের উপকরণ বাড়ছে, যখন মানুষের জাগতিক সুখের আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম প্রচার । প্রচার যে তার প্রমাণ প্রচুর লেখক, যখন তিনি ১৮৮০ সালে সোনার ভরি যখন ১৫ টাকা তখন ৪০০ টাকা মাইনে পেয়ে লেখেন, 'এ বাজে টাকার বড় গোলযোগ ।' (অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ২৬০) তাই তিনি বললেন : 'ধর্ম সুখের একমাত্র উপায় । ইহকাল কি পরকালে অন্য উপায় নাই ।'[১৪] এ জন্যই ধর্মতত্ত্ব শুরু করলেন বাস্তব মানুষের বাস্তব সুখদুঃখ দিয়ে :

> 'গুরু - বাচস্পতি মহাশয়ের সংবাদ কি ? তাঁর পীড়া কি সারিয়াছে ?
>
> শিষ্য - তিনি ত কাশী গেলেন ।
>
> গুরু - কবে আসিবেন ?
>
> শিষ্য - আর আসিবেন না । একেবারে দেশত্যাগী হইলেন ।
>
> গুরু - কেন ?
>
> শিষ্য - কি সুখে আর থাকিবেন ?
>
> গুরু - দুঃখ কি ?
>
> শিষ্য - সবই দুঃখ - দুঃখের বাকী কি ? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্মেই সুখ । কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধার্মিক ব্যক্তি, ইহা সর্ববাদীসম্মত । অথচ তাঁহার মত দুঃখীও আর কেহ নাই, ইহা সর্ববাদী সম্মত ।' [১৫]

এইভাবে তিনি শুরু করলেন এবং এই রচনাকাণ্ড বাস্তবজীবন বাস্তবজীবনের সুখদুঃখের

প্রশ্ন দিয়ে অর্থ ব্যাখ্যান শুরু করলেন, মনে হলো তিনি হয়তো এই বাস্তবজীবনের সুখদুঃখের বাস্তবসম্মত সমাধানের ইঙ্গিত করবেন, অর্থাৎ বাস্তবজীবনের সুখদুঃখের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কেননা বাচস্পতি মহাশয়ের যে দুঃখ, 'তিনি ছিল দরিদ্র, অন্ন জোটে না। তারপর এই দারিদ্র্যবোধে ক্লিষ্ট, আবার পুত্রদায় হইয়া গেল' [১৫] তা বাস্তবিক, এই দুঃখ কোন আধ্যাত্মিক দুঃখ নয়। কিন্তু 'দুঃখ'-দুঃখী বঙ্কিমচন্দ্র যে উত্তর দিলেন, 'হয় তাঁর কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্মিক নন'। [১৬] তখন আমরা বুঝি যে বঙ্কিমচন্দ্রের এ উত্তর ঠিক বাস্তবসম্মত নয়। তিনি বললেন: 'সুখদুঃখ মানসিক অবস্থামাত্র — সুখদুঃখের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই।' [১৭] অভ্যুদিত বাস্তবের যে কার্যকারণ সম্বন্ধের ফলে আসে মানুষের সুখদুঃখ, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বাস্তব কার্যকারণ নিরপেক্ষ একটি বিশুদ্ধ মানসিক ক্রিয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন, এবং এইভাবে, মানুষের বাস্তবজীবনের বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার সমগ্রটি সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকলেন এবং সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখলেন। অথচ তাঁর ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় তাঁর যে মানসিক পরিবর্তন ও আনন্দ বেদনার প্রকাশ, যেমন পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পিতা বা ভ্রাতাদের সম্পর্কে ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা — 'যেখানে বড়ভাইর মত সহোদরদের মুখদর্শন করিতে হয়, সে দেশের মধ্যে কোন সম্বন্ধ রাখিব না' (ভাই সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা চিঠি, ১৮৮৭ অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ১১৮-১১) — অথবা ১৮৮৭ খ্রীঃ কনিষ্ঠা কন্যা উৎপলকুমারীর আত্মহত্যার পর তাঁর যে বেদনাবোধ ও মানসিক পরিবর্তন — 'ক্যাপ্টেনসাহেবের ঘরের উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিবে না' (নোলিনকে লেখা চিঠি। অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ১০০) — অথবা পিতা যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর জন্য ক্ষোভ — 'কেবল পিতা হাইকোর্টের জজ, আর [illegible] ব্যবজীবী।'

শিক্ষাই হাতে ইহার কারন।'(সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা চিঠি, ১৮৭৪, অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ৩৬) - এইসব থেকে মানুষিক বাস্তবের যে কার্যকারণের জনাবলে মানুষের দুঃখদুঃখের উৎসবণ্ঠী না বোঝার তাঁর কোন কারন ছিল না। তাঁর এই সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থার পর্যন্ত তার ও পাওয়া যাবে। বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমাজনীতির বিপর্যয়ের কথা বলে ও বিশ্লেষণ করে, 'যাহারা বিবেচনা করেন যে, জমিদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী, আমাদের মদ্ভুত বিপ্লবের কোন কারন নাই।' [২৯] দীর্ঘ প্রবন্ধটির শেষ বাক্যে একথা বললেও তার আগেই তিনি বলে রেখেছেন: '১৭৯৩ সালে যে ভুল ঘটিয়াছিল এখন তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি।' [৩০] 'বঙ্গীয় ইং লিশ ডিরোজিয়ান'রা নিজ স্বার্থের প্রয়োজনেই এই সামাজিক স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন - ড. প্রদীপকুমার সিংহের এই সংজ্ঞার যথার্থ প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র একথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। [৩১]

৪.

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যুক্তিবাদ লাভ করার মতো এবং নিজস্ব বিশিষ্ট ধরনের যুক্তির সিঁড়ি বেয়েই তিনি তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন। কাজেই বাচস্পতি মশায়ের যে উদাহরণ দিয়ে তিনি তাঁর ধর্মতত্ত্ব শুরু করে শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন সে সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় দেখা দেবে এটা তিনি জানতেন।

কাজেই শিষ্যের জবানীতে সে সংশয় প্রশ্ন হিসেবে তিনিই উত্থাপন করলেন এবং তার একটা উত্তরও দিলেন। শিষ্য মুখে প্রশ্ন তুললেন: 'পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই যাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ?' [৩২] আমরা গুরু-শিষ্যের নিম্নলিখিত সংলাপ লক্ষ করবো:

'শিষ্য — পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ?

গুরু — অনেক কোটী কোটী। যাহারা শরীর রক্ষার উপযোগী অন্নবস্ত্র পায় না — অথবা পায় না — তাহারা যথার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ বটে।

শিষ্য — এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের নিজ কর্মকৃত অধর্মের ফল?

গুরু — অবশ্য'। [৩৩]

বঙ্কিমচন্দ্র ইহকাল-পরকাল বিশ্বাস করতেন এবং কর্মফলবাদেও বিশ্বাস করতেন। ধর্মতত্ত্বে তিনি লিখেছেন 'তুমি পরকাল মান না মান, আমি মানি।' [৩৪] আবারও বলেছেন: 'হিন্দুধর্মবাদের মূলতত্ত্বই এই যে, এ জন্মের কর্মফল পরজন্মে পাওয়া যায়।' [৩৫] অর্থাৎ মানুষের বাস্তব অভাব অনটন দুঃখ দারিদ্র্য সমস্ত কিছুরই মূল নির্দেশ তিনি করতে চান বর্তমান জন্মের ও পূর্বজন্মের কর্মফল, অধর্ম। তিনি পরকাল ইত্যাদি বাদ দিয়ে ইহকালকেই মাত্র নির্দেশ করেছেন, কেননা 'অনেক লোক পরকাল মানে না — মুখে মানে তো হৃদয়ের ভিতর মানে না; মনে করে, ছেলেদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে শান্ত করিবার একটা প্রাচীন প্রথা মাত্র।' [৩৬] এবং এজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ব্যাখ্যায় এই 'প্রাচীনপ্রথা' বাদ দিতে চেয়েছেন। আর এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপাদন বণ্টনের ব্যবস্থা, প্রচলিত সামাজিক প্রথা নিয়মের যে বাস্তব কার্যকারণ থেকে মানুষের দারিদ্র্য, মানুষের দুঃখকষ্ট, সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হিন্দু

ধর্মের চিরপ্রচলিত ধর্মাধর্ম ও কর্মফলবাদ সংশ্লিষ্ট করলেন এ ব্যাপারে দায়ী করলেন : এভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সন্নিহিত বাস্তবকে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জন্য দারিদ্র্যের বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দায়িত্বকে অস্বীকার করলেন। কিন্তু শুধু যে অস্বীকার করলেন তাই-ই নয়, তিনি দারিদ্র্যের জন্য দায়ী করলেন দরিদ্রদেরই। তিনি লিখলেন : 'অন্নোপার্জনের উপযোগী অথবা [illegible] গ্রাসাচ্ছাদন বস্ত্রাদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার সংগ্রহের উপযোগী তাহাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। যাহারা তাহার সম্যক অনুশীলন করে নাই বা সম্যক পরিচালনা করে না, তাহারাই দরিদ্র।'[১৭] ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে, মানুষ যখন প্রগতিবাদী হয়ে উঠছে, যুক্তিবাদী হচ্ছে, সামাজিক সমস্যার আর্থিক কারণের দিকে মনোযোগী হচ্ছে, তখন শুধুমাত্র অবৈজ্ঞানিক-ভাবে প্রচলিত ধর্মাধর্ম কর্মফলবাদের দোহাই দিয়ে মানুষের আর্থিক দুঃখকষ্ট দারিদ্র্যের ব্যাখ্যা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না তিনি; দারিদ্র্যের কারণ মানুষের স্বভাবগুণের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন তিনি, দারিদ্র্যকে দরিদ্রের স্বভাবজ বলে ব্যাখ্যা করলেন। সমাজ বা আর্থিক ব্যবস্থার দোষ নয়, দরিদ্রের আপন স্বভাব দোষকেই এখানে তিনি দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে নির্দেশ করলেন। বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তার পরিণতি হিসেবে জমিদারদের অত্যাচার বর্ণনা করলেন, বললেন : '[illegible] বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কথা জানিল।'[১৮] কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বললেন : 'আমরা জমিদারদের দোষ দিই বা আইনের দোষ দিই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দশা আজিকালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতর লোকের দুর্গতি ঐতিহাসিক, বহুদিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় তদ্দিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের

কৃষকদিগের দুর্দশার সূত্রপাত।'[৩৯] তিনি বললেন: 'লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের দুরবস্থা অনিষ্টের কারণ'[৪০] এবং 'বাস্তে বাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দশা আরম্ভ হইল।'[৪১] প্রতিকারের উপায় হিসেবে বললেন: 'দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশান্তর গমন' এবং 'বিবাহপ্রবৃত্তির দমন।'[৪২] দারিদ্র্যের জন্য প্রকৃতির অবস্থাকেও দায়ী করলেন: 'দুইটি প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষের শ্রমোপজীবীদের চিরদুর্দশা। প্রথম ভূমির উর্বরতাধিক্য, দ্বিতীয় বায়ুাদির তাপাধিক্য।'[৪৩] কিন্তু এই দারিদ্র্যের যে আসল কারণ তার পাশে গেলেও তিনি গেলেন না। 'বঙ্গদেশের কৃষক' এই রচনার বস্তু উপাদানে উদ্ধৃত প্রবন্ধটি ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে পুরো প্রবন্ধটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে গেলে অবশ্য দেখবো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, মহাজন অধিকার ভূমী বা কুটির সংস্কার - এই তিন বিষয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের কোন সমালোচনা নেই, বিচ্ছিন্নভাবে কৃষকদের জন্য যদিও তিনি দুঃখ করেছিলেন। ভূস্বামীদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন: 'ভূস্বামীরা বাঙ্গালী জাতির চূড়া, কে না তাঁহাদিগের প্রীতিভাজন হইবার বাসনা করে?'[৪৪] প্রসঙ্গতঃ, তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা নীলাব্জকুমারীর বিয়ে দিয়েছিলেন উত্তরপাড়ার জমিদার বংশে, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের খুড়তুতো ভাই মুকেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বৃটিশ শাসকদের সম্পর্কে বলেছেন: 'তাঁহারা প্রজার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী'।[৪৫] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে বলেছেন: '১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল এখন তাহার সংশোধন সম্ভবে না।'[৪৬] স্বভাবতঃ প্রশ্ন হবে, তাহলে অশ্রুলো পূর্ণায় কৃষকের জন্য কান্না কেন? তার উত্তরও প্রবন্ধের শুরুতেই আছে: 'তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ - দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য হইতে পারে?

কিন্তু সকল কৃষিজীবী খেপিলে কে কোথায় থাকিবে ? কি না হইবে ? [৪৭] সারা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলাদেশের কৃষকের অবস্থার সঙ্গে 'সকল কৃষিজীবী খেপিলে কে কোথায় থাকিবে ?' এই বাক্যটি মিলিয়ে নিলেই প্রবন্ধটি লেখার উদ্দেশ্য বোঝা যায় । তিনি বলেছেন যে 'আমরা কেবল ইহাই চাহি যে, সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, এখন সুবিচার করিলে তাহার যতদূর প্রতিকার হইতে পারে, তাহাই হউক ।'[৪৮] বঙ্কিম ভিক্টোরিয়ানরা বড়ো বেশী রকম সামাজিক শান্তির আকাঙ্ক্ষী, তাঁরা 'সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক' নন[৪৯]; সামাজিক বিপ্লবকে বড় ভয় করেন । বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং লিখেছেন : 'নূতন সমাজ ও নেতৃগণের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা সমাজ ধীরে ধীরে সুপথে চালাইবেন, বিপ্লব না ঘটে ।'[৫০] কাজেই, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, বঙ্গদেশের কৃষক ও প্রজারক্ষক 'সাম্য' প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধার করে 'যুক্তিবাদের নির্দেশে তাকালে বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী শাসন ও স্বদেশী লোকের দুঃখ তথাকথিত রক্ষক নিবাসীগণের আচরণের নিন্দায় এবং চিন্তাধারার জড়তা উৎপাটিত করেছিলেন এবং এই বিস্ফোরণে প্রচলিত সমাজ-সম্পর্ক শিহরিয়া উঠিয়াছিল' (বঙ্কিমমানস, পৃ ১০০) বলা যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় নয় । বরঞ্চ সাঁওতালবিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ ও অন্যান্য কৃষকবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসক-ইংরেজশাসন সৃষ্ট হিন্দু মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণের পারস্পরিক 'সমাজসম্পর্ক' যখন 'শিহরিয়া উঠিয়াছিল' তখনই বঙ্কিমচন্দ্র সামন্ত-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আধুনিক যুক্তিবাদের আলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে এলেন এবং তার প্রধান সাক্ষ্য প্রবন্ধটি প্রত্যাহারের ঘটনায় ও উল্লিখিত অন্য দুটি প্রবন্ধের মধ্যেও জড়িয়ে আছে, অনাবৃতও আছেই ।

৫.

বঙ্কিমচন্দ্র শশধর তর্কচূড়ামণি নন এ কথা আগেই বলেছি। তিনি নিজেই বলেছেন: 'পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না — তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।'[৩১] কেননা, 'অমুক শিমুকে ছুঁইতে নাই, অমুক আন্নে খাইতে নাই, শূণ্য কলসি দেখিলে যাত্রা করিতে নাই ... অনেকেই স্বীকার করিবেন যে এসকল হিন্দুধর্ম নহে। পুঁথির আচার মাত্র।'[৩২] কিন্তু একই সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র, যে তত্ত্বকে তিনি অনুশীলন তত্ত্ব বলেছেন, 'অধ্যয়ন পরিচ্ছেদের উপাসনায়, বিধবার ব্রহ্মচর্যে, সমস্ত ব্রত নিয়মে' তাঁকে 'অনুশীলনতত্ত্ব অন্তর্নিহিত'[৩৩] কথা বলেছেন। বলেছেন: 'অধ্যয়ন পরিচ্ছেদের উপাসনায়, বিধবার ব্রহ্মচর্যে, সমস্ত ব্রত নিয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে, এই অনুশীলন তত্ত্ব অন্তর্নিহিত। যদি এই তত্ত্ব এখন তোমাকে বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় ধর্ম কথিত হইয়াছে, তাহা এই অনুশীলন তত্ত্বের উপর স্থাপিত।'[৩৪] তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যাবে যে বিভিন্ন ধরণের প্রচলিত সংস্কার তাঁরও ছিল।' ১০ অম্বুবাচী [illegible] দিন। শীতে [illegible] বারবেলা বাদ দিয়া যাত্রা করিত' (অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ১১৯) — এ রকম উপদেশ তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিষকে দিয়েছে। অথবা একটি নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে কালো বাদুড় দেখলে তিনি অমঙ্গল আশঙ্কা করেন। (দ্র. অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ১১০)।

পারতান্ত্রিক বন্ধন থেকে নারীর মুক্তি আধুনিক কালের লক্ষণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর প্রমুখ কয়েকজন এই ব্যাপারে তাঁদের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুসমাজ কোনদিনই নারীকে পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে

দেখেনি, সমান অধিকার দিতে চায়নি। সামাজিক আচার বন্ধনের নিয়মাবলীর দিকে তাকালেই আমরা দেখবো যে নারীকে সর্ববিধ উপায়ে নীতি নিয়মের নিগড়ে প্রাণপণে বেঁধে রাখার প্রচেষ্টা প্রবল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : 'প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেননা বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ।'[৫৫] এই নীতির অযৌক্তিকতা তাঁর মত আধুনিক মানুষের চোখে পড়েনি, তিনি এই নিষেধকে স্বাভাবিক হিসেবেই নিয়েছেন, কোন প্রতিবাদ করার আবশ্যকতা বোধ করেন নি। কেননা সমাজে নারীর প্রয়োজন শুধুমাত্র 'প্রজার বিলোপ' থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা, 'স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা'।[৫৬] আর 'স্বামীর সেবা, পুত্র পালন ও ধর্মের সহায়তা ইহাই স্ত্রীর ধর্ম।'[৫৭] স্ত্রী-পুরুষের সাম্য বা সমানাধিকারে তিনি ঠিক বিশ্বাসী ছিলেন না। শিষ্য যখন গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'পাশ্চাত্যেরা যে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য স্থাপন করিতে চাহেন সেটা অযৌক্তিক বিড়ম্বনা মাত্র ?'[৫৮] তখন গুরু উত্তরে সেই বিখ্যাত উক্তি করলেন : 'সাম্য কি সম্ভবে ? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারে ? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি ?'[৫৯] মানুষ-সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষে সাম্য সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি আলোচনা করিতে চান না, 'সেই অবস্থায় স্ত্রীলোক সকল আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনে সক্ষম কিনা, তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই।'[৬০]
নারীসমাজ যদি পুনরায় স্বাধীন ও আত্মরক্ষায় সক্ষম হয় তবে স্ত্রীশক্তি তাহাদিগের
কিন্তু বর্তমানে, মানুষের এই সমাজবদ্ধ জীবনে ^ সে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষ সমকক্ষতা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহ প্রথার বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্ম বিনষ্ট না হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও বলিতে হইবে।'[৬১]

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের সাম্য প্রবন্ধের কথা মনে পড়বে । সাম্য ধর্মতত্ত্বের
বেশ কিছুটা পূর্ববর্তী, ১২৮০-৮২ সালের ভেতরে লেখা, সাম্য প্রবন্ধের সম্পূর্ণ
পঞ্চম অধ্যায়টি নারীপুরুষের সাম্য বা সমানাধিকার সম্পর্কে তিনি আলোচনা
করেছেন । বঙ্কিমচন্দ্র এই অধ্যায়ে লিখেছেন : 'মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার
বিশিষ্ট । স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী।'
এবং 'যে সকল বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে অধিকার বৈষম্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে
স্ত্রী-পুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না । যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু
কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে ।'[62] এজন্যই বোধ হয় পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য
প্রবন্ধটি আর প্রকাশ করতে চান নি, বলেছেন : 'সাম্যটা ভুল নয়, খুব বিক্রয়
হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না ।'[63] কিন্তু এখানেও, বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন প্রসঙ্গে,
তাঁর বিশিষ্ট মানসিক গঠন ও তার ফলে তাঁর পশ্চাদ্গামিতা লক্ষ করা যাবে ।
মেয়েদের লেখা পড়ার অধিকার স্বীকার করে, তারপর বলছেন : 'ত্রয়োদশ বৎসরের
মধ্যে যে লেখাপড়া শিখা যাইতে পারে, তাহাই আমাদের সাধ্য । অথবা তাহাও
সাধ্য নহে - কেননা, ত্রয়োদশবর্ষীয়া বা কুলবধূ বা কুলকন্যা, গৃহের বাহির হইয়া
বহি হাতে করিয়া কালেজে পড়িতে যাইবে কি প্রকারে ?'[64] যে সমালোচক স্ত্রীদের
পুরুষের সমান সুযোগ দেবার পক্ষপাতী, তিনি '[illegible]' উপাধির বহরে পড়িয়েই
লিখছেন : 'আমরা এসকল উপাধির মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নহি ।'[65] একইভাবে
লক্ষ করবো, বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে বলছেন 'বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি দুরূহ
কথা ।'[66] পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্পর্কে বলছেন : 'উচিত, অনুচিত, দুরূহ
কথা, ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই ।'[67] নারীর দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে
বলছেন :'যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্বার

পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পতিভক্তিভাববিশিষ্টা, স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।'[৫৮] এমন লেখার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো যুক্তিবাদী মনের অধিকারীও তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিবাহের তাৎপর্য সম্বন্ধে ভেবে দেখেননি। নারীশিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে [illegible] প্রসঙ্গে তিনিও বলেছেন: 'স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম পাতিব্রত্য। অদ্যাপি আর্যমহিলাগণ পৃথিবী মধ্যে পাতিব্রত্য ধর্মে তুলনারহিতা। কিন্তু যা ছিল তাহা কি আর আছে?'[৫৯] বহুবিবাহ নিরোধবিষয়ক বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব [illegible] বঙ্কিমচন্দ্রের পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম [illegible] কেন্দ্রিক আচার ভাবনারই ফল। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের পক্ষে এ ব্যাপারে গোঁড়ামুক্তি প্রকাশ সম্ভব ছিল না তবে বহুবিবাহ ভাল প্রথা নয় একথা স্বীকার করে নিয়েই তিনি বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের [illegible] করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন: 'এতদিনে বাঙ্গালীর পক্ষে [illegible] করা আবশ্যক হইল, – অনুমানে [illegible] পর্যাপ্ত লাভ করা যাইতে পারিবে।'[৬০] দুর্ভাগ্য এমন, যে বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ লেখার পরেই তাও এই সুযোগ মিলল। অন্যান্য অনেক কথা তিনি ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিদ্যাসাগরকে অপদস্থ বলেছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি ভালো করে পড়লেই দেখা যাবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি, বিশেষতঃ অনেক মুসলমানের 'বিদ্যাসাগর' নেই বলে তাঁর যে দুঃখপ্রকাশ, সেটাকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর যে তির্যক অভিযোগ, অথচ যা সত্যি নয়, সেই একই মনোভাবের যথার্থ প্রকাশ বলেই অনেকের মনে হবে।[৬১] এমন কি, [illegible] ব্যাখ্যাও তাঁর [illegible] বিরোধী।'[৬২] এই বিরোধ সম্পর্কে [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন: 'শাস্ত্র [illegible] অনুযায়ী সমাজপতিদের

কল্পনায় বাংলাদেশে যে সব সীমাবদ্ধতার সম্ভাবনা তার কথা স্মরণে রেখেই বঙ্কিম এ উক্তি করেছিলেন'[৭৩] তা যথার্থ বলে মনে হয় না। সহবাসসম্মতি আইন সম্পর্কে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে ১২৯৮ সালে লিখেছেন: 'ঈদৃশ রাজনিয়ম প্রাচীন দেশাচার বিরুদ্ধ হইবে না, কাজেই তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপন করাও আমার মত নহে।'[৭৪] অর্থাৎ দেশাচারবিরুদ্ধ হবে বলেই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেছেন। বিদেশী শাসকের সামাজিক আচার নিয়ে হস্তক্ষেপের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেন নি বলেই তিনি বিদ্যাসাগরের আইন করার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিলেন বলে যারা মনে করেন তাদের কথাও অযথার্থ মনে হয় এই মন্তব্য থেকে: 'ইহা আমাদিগের দেশের প্রাচীন রীতিবিরুদ্ধ। তাহার নিষেধ জন্য যদি কোন আইন হয়, তাহাতে আমি ক্ষতি দেখি না।'[৭৫]

৬.

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' হিন্দুধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত; আরও স্পষ্ট করে বললে, পৌরাণিক হিন্দুধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: 'আমাদের সর্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার যত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল।'[৭৬] এই 'সর্বাঙ্গসম্পন্ন' করার জন্য বেদ-কেন্দ্রিক থেকে উপনিষদ-কেন্দ্রিক এবং সেখান থেকে পৌরাণিক, এইভাবে হিন্দুধর্মের পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি লিখেছেন: 'যাহা শক্তিমান বা উপকারী বা সুন্দর, তাহারই উপাসনা এই

আদিম বৈদিক ধর্ম। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও চিতের উপাসনার অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল।'[৭৭] তারপর 'উপনিষদের ধর্ম - চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা। তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে।'[৭৮] এই অভাব পূরণের জন্যই পৌরাণিক হিন্দুধর্ম; 'এই তিন ধর্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে।' এবং সে জন্যই 'ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত।'[৭৯] তবে এই সঙ্গেই তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: 'অবশ্য হিন্দুধর্মে অনেক জঞ্জাল জন্মিয়াছে - ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। ... তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই।'[৮০] হিন্দুজাতির উন্নতির অভাববোধ থেকেই পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সংস্কৃত রূপই তিনি তাঁর ধর্মতত্ত্বে তুলে ধরলেন, যার অন্য নাম অনুশীলনধর্ম। অনুশীলন ধর্ম শুধুমাত্র হিন্দুরই 'মনুষ্যত্ব' বিকাশের অনুশীলন, বাঙালী মুসলমানের নয়, খ্রীষ্টানেরও নয়, কেননা 'মুসলমান বা খ্রিস্টিয়ান কখনও হিন্দু হইতে পারে না; কেননা যে সকল আচার হিন্দুত্ব প্রকাশক, তাহারা পুরুষানুক্রমে সেই সকল আচার করিয়া পুরুষানুক্রমে পতিত।'[৮১]

ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন যে মানুষের ধর্ম হলো মনুষ্যত্ব।[৮২] আবার বলেছেন: 'অনুশীলনই ধর্ম।'[৮৩] ধর্ম ও অনুশীলন এই দুটি বিষয় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: 'অঙ্কুরের পরিণাম, মহামহীরুহ। মাটি খোঁড় হয়ত একটি ছোট ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য, অঙ্কুর দেখিতে পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্কুর প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ - কৃষকেরা যাহাকে

গাছের পাট বলে, তাহা চাই। ..... মনুষ্যেরও তদ্রূপ। যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর। বিহিতকর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে।'[৮৪] মানুষের মানবিক বিকাশের সম্পূর্ণতার জন্য যে চেষ্টাচর্চা বা অনুশীলন বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই মানুষের ধর্ম হিসেবে দেখেছেন; মানবিক বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশেই ধর্মের সার্থকতা। কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি মানবিক বিকাশের যে বাস্তবকারণসমূহ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি, তাকে অস্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবনিরপেক্ষ মানুষের কতগুলো শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করতেন এবং ঐ শক্তিগুলোর তিনি নাম দিয়েছেন 'বৃত্তি'। বলেছেন, 'এখন মনুষ্যের সমুদয় বৃত্তিগুলিকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হলে। (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জনী (৩) কার্য্যকারিনী, (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।'[৮৫] কিন্তু এখান থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যাত অনুশীলন ধর্মকে ঈশ্বরনিরপেক্ষ ধর্ম মনে করবার কোন কারণ নেই। তিনি বলেছেন: 'যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার চলিবে না। আমি পরকাল হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি।'[৮৬] কেননা, তিনি মনে করেন, 'অনুশীলনের উদ্দেশ্য, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে স্ফূরিত ও পরিণত করিয়া ঈশ্বরমুখী করা।'[৮৭] তাহলেই মানুষ মোক্ষলাভ করবে; এবং 'মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শনীতি ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।'[৮৮] কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র আগেই বলেছেন: 'সুখ-দুঃখ মানসিক অবস্থা মাত্র - সুখদুঃখের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই।'[৮৯] আর এইভাবে মনকে বাস্তব-নিরপেক্ষভাবে বিশেষ একটি অবস্থায় চর্চা বা অনুশীলনের

ভেতর দিয়ে নিতে পারলেই বাচস্পতি মশাইয়ের দারিদ্র্য রোগ পুত্রদাহ ইত্যাদি জাগতিক দুঃখকে আর দুঃখ মনে হবে না । ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার পটভূমিকায় এই দর্শন বিচার করলেই এই মতবাদের জন-বিরোধী চরিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের তাকে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার কারণ স্পষ্ট হবে । বাচস্পতি মশাই মানসিক অনুশীলনের দ্বারা এরূপ মানসিক অবস্থায় যেতে পারেন নি বলেই তিনি এইসব জাগতিক দুঃখকে দুঃখ মনে করেছেন এবং সেজন্যই বাচস্পতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন : 'তিনি ধার্মিক নহেন ।'[১০] এভাবেই আমরা দেখবো যে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবজীবন, বাস্তবজীবনের সুখদুঃখ, সেই মানুষের সুখদুঃখের ভাবনাসমূহ থেকে শেষপর্যন্ত আমাদের অনেক দূরে নিয়ে গেলেন, পুরোনো হিন্দুধর্মভাবনাতেই; তবে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় ।' তাইতো তিনিই বলেছেন : 'আমার সব কথাই পুরাতন । নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস । ... আমি সেই আর্যঋষিদিগের পদপ্রান্তে আসনপূর্বক, তাঁহাদিগের প্রচারিত পথেই যাইতেছি ।'[১১]

৭.

ভক্তিতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের অনেকটা স্থান দখল করেছে । আর বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক গঠনে যে রক্ষণশীলতা তথা স্থিতাবস্থার প্রতি পক্ষপাতিত্ব তারও প্রমাণ মিলবে তাঁর ভক্তিতত্ত্ব আলোচনায় । তিনি লিখেছেন :' ভক্তি কথাটা হিন্দুধর্মে বহু পুরাতন অর্থবাচক । এবং হিন্দুধর্মের ইহা বড় প্রসিদ্ধ ।'[১২] জ্ঞানবাদী জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে জানে বটে' কিন্তু জ্ঞানে কি ঈশ্বর পাওয়া যায়?'[১৩] ভক্তিবাদের উদ্ভবের ইতিহাস প্রসঙ্গে বললেন :' এই ছিদ্রেই ভক্তিবাদের সৃষ্টি ।

ভক্তিবাদী বলিলেন, জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কিন্তু জানিতে পারিলেই কি তাঁহাকে পাইলাম ? ... আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করি, তবে কি তাঁহাকে পাইব ? ... তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাঁহাকে পাইব । সেই প্রগাঢ়ের অনুরাগের নাম ভক্তি ।'৯৪ বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ চরিত্রের ক্ষেত্রে তিনি ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বরূপ আবিষ্কার করেছেন । তিনি বলেছেন : 'পুরাণে একদিকে বেদ, বিভিন্ন দর্শনাদি, আইনের কোষাগার, আর একদিকে প্রহ্লাদ চরিত্র থাকিলে প্রহ্লাদ চরিত্রই গুরু হয় ।'৯৫ কেননা প্রহ্লাদ 'সর্ব দুঃখ, ক্লেশ, আত্মত্যাগ, মুক্তিমার্গ পরিত্যাগী'৯৬ 'কেননা প্রহ্লাদ নিষ্কাম'৯৭ প্রহ্লাদের ঈশ্বরভক্তি, 'অহৈতুকী ।' ভক্তিসূত্রে তাঁর অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে বললেন : 'যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি ।'৯৮ অর্থাৎ জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী এই সবকটি বৃত্তির জাগতিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত করলেন এই ভাবে : 'মনুষ্যে প্রীতি বিনা ঈশ্বরে ভক্তি নাই' যেহেতু 'ঈশ্বর সর্বভূতে; জগতের কাজই তাঁহার কাজ । অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কার্য গীতোক্ত 'স্বধর্ম'; তাহার সাধনে তৎপর হও, ... তাহা হইলে যাহাতে উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ম, তাহাতে মন স্থির হইবে । তাহা হইলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইবে । চিত্তশুদ্ধিই সুখ ।'৯৯ ঈশ্বরভক্তির জাগতিক অনুশীলনই 'মনুষ্য - প্রীতি ।' ভক্তি প্রীতি দয়া - এই তিন বৃত্তিকেই প্রীতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন । তবে একই সঙ্গে বলেছেন 'ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ।'১০০ সামাজিক জীবনে ভক্তির পাত্রদের উল্লেখ করে বলেছেন 'মনুষ্য - যথা রাজা, গুরু,

পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র।'[১০১] ভক্তির পাত্র নির্বাচন সম্পর্কে বলেছেন: 'যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র।'[১০২] এখানে স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠবে, শ্রেষ্ঠতা নির্ধারণের মাপকাঠি কি হবে, কোন অর্থে শ্রেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে? এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্মের প্রাচীন মাপকাঠিকেই যা ব্যবহার করেছেন সেটা তাঁর এই বক্তব্যে বোঝা যায়: 'হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং সাধারণের যে বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্মবেত্তা, তাঁহারাই ধর্মশিক্ষক, তাঁহারাই শিক্ষক তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্যপ্রণেতা, তাঁহারাই কবি। ... সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল।'[১০৩] প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণশ্রেণীর উত্থানের আর্থ-সামাজিক কারণগুলোকে বাদ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণের সমাজ আত্মপ্রসারকে তার অপরিমিত শক্তি বলেই হয়েছিল বলে মনে করেছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নীতিনিয়মের মধ্যে সমাজের নিম্নশ্রেণী, বিশেষতঃ দেশের অধিকাংশ মানুষই শূদ্র শ্রেণীভুক্ত এটাও মনে রাখতে হবে, কোনভাবে স্বার্থসংরক্ষক সমাজকে সফল করেনি কিছু করতে পারে নি। সর্বপ্রকার কৃতিত্ব তিনি ব্রাহ্মণদেরই দিয়েছেন: 'ইউরোপে আজিও যুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ – সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ – সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত – সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।'[১০৪] বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে 'কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে?' – এই আশঙ্কার সঙ্গে উপরোক্ত

উক্তিটি মিলিয়ে পড়লেই শিক্ষাবস্থার পরবর্তী বঙ্কিমকে চিনতে অসুবিধা হবার কথা নয়। অথচ রেভারেণ্ড হেস্টির সঙ্গে তর্কযুদ্ধে হিন্দুধর্মকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি যখন হিন্দুধর্মের আচার, ও মূর্তিপূজা, এমন কি বর্ণবিভাগকেও 'অনাবশ্যক' বলে ঘোষণা করে বললেন 'I leave the Kernel without the husk' ১০৩, তখন এটুকু বোঝা যায় যে বর্ণবিভাগকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজের কাছে সমর্থন করতে তাঁর লজ্জা বেধেছে, বুর্জোয়া পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনার নিরিখে অসমর্থনীয় ও লজ্জাকর ভেবেই সংকোচ; কিন্তু একই সঙ্গে, তিনি যে এখানে তাঁর মনের কথা বলেন নি, ধর্মতত্ত্বে তার প্রমাণ রেখেছেন। যুবক বিদ্রোহ বিপ্লবের 'সামাজিক উৎপাতকে' 'সুখদুঃখ একটা মানসিক অবস্থা মাত্র — সুখদুঃখের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই' — একথা বলে আর সান্ত্বনা লাভ করতে পারলেন না। এজন্যই ভক্তির 'সামাজিক প্রয়োজন' প্রসঙ্গে বললেন 'নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না।' ১০৪ ইউরোপীয় ভিক্টোরিয়ানরা সামাজিক ঐক্য ও বন্ধন সম্পর্কে বড়ো বেশী রকম চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এজন্যই যখন যুরোপীয় চিন্তাভাবনার প্রভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তার সমাজতন্ত্রের প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিল তখনই সামাজিক ঐক্য ও বন্ধনের প্রতিনিধিরা যথেষ্টরকম চঞ্চল হয়ে পড়লেন। সেই ঐক্য ও বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা থেকে, যখন ইংরেজ শাসনের শোষণে জর্জরিত গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী, ধর্মতত্ত্বে রাজভক্তির প্রয়োজন বঙ্কিম উল্লেখ করলেন: 'পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান্ — নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ

ভক্তি করিবে। নর্ড রীপন সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি দেখা গিয়াছে, এইরূপ ও অন্যান্য সদুপায় দ্বারা রাজভক্তি অনুশীলিত করিবে। দুঃখকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্মে পুনঃ পুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। ... বিলাতে এমন রাজভক্তির প্রশংসা নাই। যেখানে আছে- যথা [overtyped] জার্মানি বা ইতালি, সেখানে রাজ উন্নতিশীল।'[১০৭] উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু সমাজে ভক্তির অভাবের ফলে সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তনের তিনি সমালোচনাও করেছেন: 'পিতা এখন My dear father অথবা বুড়োটা [বেটা]। মাতা বাপের পরিবার। বড় ভাই, জ্ঞাতিমাত্র- শিক্ষক, মাস্টার বেটা। [overtyped] পুরোহিত চাল কলা লোলুপ ভণ্ড। যে স্ত্রী দেবতা ছিলেন, তিনি এখন কেবল প্রিয়বংবদাত্রে- কেহ বা ভৃত্য ও মনে করেন। .... সুযোগ পাইলে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন। আত্মপুরুষ অথবা অনিষ্টকারী রাক্ষস। সমাজশিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল- গালি ও ছিদ্র বিন্দুপের স্থান।'[১০৮] সমালোচনার ধরণ দেখেই বোঝা যায় এখানে আবেগ প্রবল এবং লেখক এই সামাজিক পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারেন নি; আবার ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মানবিক সম্পর্কের শিথিলতা- আনতেই তিনি যথাযথ মনে করেছেন আর সেজন্যই এ সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কব্যবস্থাও তাঁর কাছে অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক মনে হয়নি।[১০৯] বিশেষত: 'জীবিকা নির্বাহের কার্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্তি অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না।'[১১০] বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য থেকে এটা বোঝা যায় যে তিনি তাঁর বৃত্তির অনুশীলন তত্ত্বের কাঠামোয় 'জীবিকা-নির্বাহের' বাস্তব কারণটিকে বাদ দিতে চেয়েছেন।

৮.

ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের সর্বপ্রকার বৃত্তির অনুশীলন ও সামঞ্জস্যের মাধ্যমে মনুষ্যত্বলাভের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: 'বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম করি, না হয় কিছু জানি। কর্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই।'[১১১] এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে পাদটীকায় লিখেছেন: 'কোমৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিনভাবে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করে, 'Thought, Feeling, Action' ইহা আমরা। কিন্তু Feeling অবশেষে thought কিম্বা Action প্রাপ্ত হয়। এই জন্য অভিপ্রায়ের ফল জ্ঞান ও কর্ম, এই দ্বিবিধ বলাও যায়।'[১১২] কিন্তু এই জ্ঞান ও কর্মের একই সঙ্গে অনুশীলন মানুষের পক্ষে সম্ভব, সমস্ত মানুষের পক্ষে? বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: 'মনুষ্য সমাজের অবনতাবস্থায় তাহা সাধারণের ঘটিয়া উঠে না। কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধান স্বধর্মস্থানীয় মনে করেন, কেহ কর্মকে প্রধানকে স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করেন।'[১১৩] প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: 'আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অবনতাবস্থায় গনিতেছি।'[১১৪] এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীনভারতের চতুর্বর্ণবিভক্ত দৃঢ় সমাজভিত্তিক এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় শিল্পনির্ভর সমাজব্যবস্থাকে, ঊর্ধ্বগতিশীল সমাজকে, এক করে ফেলেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপের সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ বর্ণবিভক্ত হিন্দুসমাজের যে চারিত্রিক পার্থক্য তা তিনি ধরতে পারেন নি। বিশেষতঃ কেহ জ্ঞান বা কর্মকে মানুষেরা 'স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করেন' যখন বলেন, তখন মনে হতে পারে এই বৃত্তি সুনির্বাচিত, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে ওঠে না। নির্বাচন - সম্ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রেরও খুব কাম্য ছিল বলে মনে হয় না। তিনি লিখেছেন: 'কথা

এই যে, যাহার যে স্বধর্ম, অনুশীলন তদনুবর্তী না হইলে সে স্বধর্মের সুপালন হইবে না। অনুশীলন স্বধর্মানুবর্তী হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধর্মের প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তি বিশেষের বিশেষ অনুশীলন চাই।'[১১৩] অন্যত্র বলেছেন: 'ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্যেরা বিবেচনা করিলেন যে, যাহার পিতৃপিতামহ যে ব্যবসায় করিয়াছে, সে সেই ব্যবসায়েতেই সুদক্ষ হয়। তাহাতে সুশিক্ষা তাকে বলিয়া লোকে প্রথমতঃ ইচ্ছা করিয়া পৈতৃপিতামহিক ব্যবসায় অবলম্বন করিত। শেষে উচ্চব্যবসায়ীদিগের নিকট নীচ ব্যবসায়ীরা ঘৃণ্য হওয়াতেই হউক অথবা ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র সমাজনীতির বলেই হউক, বিদ্যাব্যবসায়ী যুদ্ধব্যবসায়ীর সঙ্গে মিশিল না। যুদ্ধব্যবসায়ী কৃষিকের সঙ্গে মিশিল না। এইরূপেই জাতিবর্ণের সৃষ্টি। .... শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় সকল আর্যেরা আপনার হাতে রাখিল, নীচ ব্যবসায় শূদ্রের উপর পড়িল।'[১১৪] বঙ্কিমচন্দ্র যদিও তিনি কেবল [illegible] ব্রাহ্মণ পূজ্য বলেছেন কিন্তু তাঁর রচনাবলীর কোথাও তিনি জন্মসূত্রে নির্ধারিত বর্ণপ্রথাকে ধিক্কার বা এই প্রথাকে অস্বীকার করেন নি বা কোথাও উচ্চশক্তি সকল সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক এমন কোন মনোভাব প্রকাশ করেন নি। বরঞ্চ ভক্তিতত্ত্ব আলোচনায় স্থিত সমাজ কাঠামোকেই তিনি সমর্থন করেছেন, তার কোন রকমের পরিবর্তন তাঁর কাছে সমাজের পক্ষে প্রলয় অহিতকর বলেই মনে হয়েছে। তিনি লিখেছেন: 'যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক তাহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।'[১১৫] এখানে তিনি 'ব্রাহ্মণের মত' ভক্তি করতে চেয়েছেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। কেবল অনেকে ব্রাহ্মণকে ভক্তি ও 'নুচি ভাজেন নুচিও বেচেন হাঁড়িধাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসায় চালান'[১১৬] এমন ধরনের ব্রাহ্মণকে ভক্তি না করার কথা বলে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর [illegible]

নতুন জাতিভেদকেই তাও স্বীকৃতি দিয়েছেন, বাংলাদেশে বর্ণ জাতিভেদের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বর্ণ-বিন্যাস জাতিভেদও স্বীকৃত হয়েছিল। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রবন্ধে ব্রাহ্মণদের আর্যত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে 'কায়স্থগণ আর্যবংশসম্ভূত বটে' কেননা, 'এক্ষণে কায়স্থগণ বঙ্গদেশের উজ্জ্বল রত্ন' - এই কথা পূর্বোক্ত মনোভাবকেই প্রতিফলন।

নারী ও পুরুষের সুনির্দিষ্ট কর্মবিভাগ যেমন বঙ্কিমচন্দ্র নির্ধারণ করেছেন, যা মূলতঃ হিন্দুধর্ম নির্দিষ্ট কর্মবিভাগ, ঠিক একই ভাবে তিনি হিন্দু ধর্ম নির্দিষ্ট বর্ণ বিভাগকেন্দ্রিক কর্মবিভাগও আমাদের গ্রহণযোগ্য করতে চেয়েছেন। 'স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষার ভার' দিয়েছেন তিনি পুরুষকে এবং 'স্বামীর সেবা, পুত্র পালন ও ধর্মের সহায়তা'-র ভার পড়েছে স্ত্রীর উপরে। তার অন্যথা ঘটলেই 'সমাজ ও ধর্ম বিনষ্ট' হবে মনে করেছেন।[১১৯] 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়' তিনি লিখেছেন: 'মনুষ্যের কর্ম মনুষ্যের জীবন নির্বাহকেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ (৩) রক্ষা। (১) যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধর্মী (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্য ধর্মী এবং (৩) যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধধর্মী। ইহাদিগের নামান্তর যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি?'[১২০] শূদ্রের সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেছেন: 'যখন জ্ঞানধর্মী, যুদ্ধধর্মী, বাণিজ্যধর্মী বা কৃষিধর্মীর কর্মের এত বাহুল্য হয় যে, তত্তদ্ধর্মিগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়।'[১২১] কর্মবিভাগ থেকে বর্ণবিভাগ স্বীকার করেও কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কর্মবিভাগ নিরপেক্ষভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব মানবিক সত্তাকেও স্বীকার করতে পারেন নি, বিশ্বনির্ভর যথাযথভাবে স্বীকার করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন: 'যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবীকার

অন্য ই হউক, আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম, তাহার Duty.'[১২২] 'আর যে কারণেই হউক' বলে দৃঢ়ভিত্তি কুসংস্কারে প্রান্ত বর্ণবিভাগকে তিনি পাশ কাটালেন। তিনি বললেন: 'তবে অন্য সমাজের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে ধর্ম পুরুষপরম্পরাগত।'[১২৩] এ ব্যবস্থা সমর্থনে বললেন: 'কেবল হিন্দুসমাজেই যে এরূপ, তাহা নহে, হিন্দুসমাজ সংসৃষ্ট মুসলমানদিগের মধ্যেও এরূপ ঘটিয়াছে।'[১২৪]

১০

ধর্মতত্ত্বের শেষবাক্যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: 'সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।'[১২৫] ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রীতি তথা স্বদেশ চিন্তার কথা বলেছেন। মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন: 'বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল, তিনটি ভাবে - স্বজাতি, স্বদেশ ও সমাজ।'[১২৬] বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের বিশিষ্ট রূপটি বোঝার জন্য আমরা তাঁর স্বসমাজ স্বজাতি ও স্বদেশভাবনার পরিচয়টি নিতে চাই।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: 'আমরা সেই প্রাচীন আর্য জাতিসম্ভূত বলিলাম - বাঙ্গালায় যখন থাকি না কেন, আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্য।'[১২৭] অন্যত্র লিখেছেন: 'বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারিপ্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য, দ্বিতীয় অনার্য হিন্দু, তৃতীয় আর্যানার্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান।'[১২৮] প্রথম উদ্ধৃতির 'আমরা' কি 'চারিপ্রকার বাঙ্গালী' বুঝিয়েছে? না, তা বোঝায়নি। বরঞ্চ তিনি দোষে, গৌরবে, [illegible]

মতো 'ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী' হয়ে খুশী হয়েছেন ।[১২৯] বল্লালের সময়কালীন 'বঙ্গীয় আর্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে' জন্য তাঁদের সম্বন্ধে 'সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্যদিগের কিছু কমিয়াছে বটে' বলে তিনি স্বস্তি পেয়েছেন । সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন : 'এখনও বঙ্গীয় আর্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই । এখন যে সময় শোকময় উপস্থিত। আয়ু থাকে না থাকুক, বুঝিতেছি যে বাঙালী জাতিকে পৃথিবী মধ্যে মহা যশস্বী হইতে, তাহার সময় আসিতেছে ।'[১৩০] এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজনারায়ণ 'বঙ্গীয় আর্য' ও 'বাঙালীকে' সমার্থক হিসেবে [illegible] দেখেছেন । তবুও তিনি বলেন যে, 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙালীর প্রতি অবজ্ঞান ।'[১৩১] একথা বলেও 'আর্যবংশজ ব্রাহ্মণ অনার্যবংশজ অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রহিয়াছেন' একথা বলে তিনি তৃপ্তি পেয়েছেন । পৃথিবীর চতুর্দিকে যে আর্যরা ছড়িয়ে পড়ে 'অশেষ অতুল্য সাহিত্য শিল্প দর্শনাদি প্রণয়ন' করে 'পৃথিবীর নেতা ও শিক্ষাদাতা' হয়েছেন, 'তাঁহাদিগের শোণিত বাঙালীর শরীরে আছে' জেনে তিনি পুলকিত, লিখেছেন : 'যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি সকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙালীর শরীরেও সেই রক্ত বহিতেছে ।'[১৩২] তিনি লিখেছেন : 'আমাদিগের একটি প্রাচীন ধর্ম আছে, যাহা হাজার বৎসর হইতে সেই ধর্ম নানাবিধ কাব্য দর্শন ও উৎকৃষ্ট নীতির গ্রন্থের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া লোক মনোমোহন হইয়াছে'[১৩৩] সেজন্যই তিনি সেই [illegible] প্রাচীন হিন্দু ধর্মকেই 'জাতীয়ধর্ম' হবার উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন । যদিও তিনি বাঙালীর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে 'যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালী'[১৩৪] বলেছেন, তবুও মোট লোকসংখ্যার অর্ধেক বাঙালী মুসলমান সম্পর্কে তিনি কিছু ভাবার সময় পাননি । হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

'ইসলাম কতকগুলো বন্য জাতি এবং হিন্দুনামধারী কতকগুলো অনার্য জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্যসমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই। ভারতীয় আর্য হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে।'[১৩৩] এই বক্তব্য থেকে অনার্য হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কে তাঁর মনোভাব এবং প্রকৃত হিন্দু তিনি কাদের মনে করতেন তা বোঝা যায়। মুসলমান সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনায় বক্তব্য থেকে তাঁর ধারণা বোঝা যায়। 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে তিনি মুসলমানদের 'আত্মজাতি গৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী', '[illegible] [illegible] চিকুর' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। [illegible] প্রবন্ধে মুসলমানদের 'অলোলুপ ক্ষুদ্র, আত্মপ্রতিষ্ঠা পরায়ণ'[১৩৪] বলে উল্লেখ করেছেন। হিন্দুধর্মে নির্দেশিত প্রীতিবৃত্তির বিস্তার প্রসঙ্গে বলেছেন: 'জগৎসুদ্ধ মুসলমান হইলে জগৎসুদ্ধ কে ভালবাসিতে পারে'[১৩৫] [illegible] পারে না। বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক প্রীতিবিস্তার সম্পর্কে এ কথাটি কি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না? এখানে 'মুসলমান কিন্তু মুসলমান ভালবাসতে পারে না' বলায় এটি তো বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মিলিত হবার সম্ভাবনা নেই-ই বোঝায়। ইংরেজের প্রভুত্ব ও [illegible] নবহিন্দুর [illegible] অনুকূল অবস্থা উনিশ শতকী মধ্যে এই ভাবনা প্রভাবিত হয়েছে: বঙ্কিমভাবনায় তারই প্রকাশ মাত্র দেখা যায়। তাই ড. অরবিন্দ পোদ্দার যখন বলেন: 'তাঁহার সাময়িক জীবনাদর্শের মধ্যে মিলাইয়া দেখিলে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা চলে না'[১৩৬] তখন মনে হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সেই ঐতিহাসিক পটভূমির চরিত্র বৈশিষ্ট্যকেই স্বীকার করেছেন তিনি। বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের মুসলমানবিদ্বেষের কারণ এই শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসেই নিহিত, বঙ্কিমচন্দ্র

এই শ্রেণীবৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করতে পারেন নি । ড. ভবতোষ দত্তও বঙ্কিমচন্দ্রকে এই অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে গিয়ে বলেছেন : 'এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন । প্রথমতঃ উপন্যাস ও প্রবন্ধকে আলাদাভাবে দেখা এবং তুলনা করা দরকার । দ্বিতীয়তঃ মুসলমান রাজশক্তি এবং মুসলমান জনসমাজ যে ঠিক এক নয়, এটাও মনে রাখা উচিত ।'[১৩৯] বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ থেকে রক্ষা করার এ প্রয়াস সার্থক বলে মনে হবে অনেকের কাছেই । কেননা একই লেখকের প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য এটুকুই যে প্রবন্ধে লেখক স্বমত ও জীবনের নানাবিধ বিষয় সম্পর্কিত ধারণাকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উপন্যাসে সেইসব বিষয়গুলি চরিত্রদের মধ্যে রূপায়িত করেন, সুতরাং এই দুই প্রকার রচনার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও বক্তব্যের দ্বৈততার কল্পনা ঠিক স্বীকার্য নয় । দ্বিতীয়তঃ বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু রাজশক্তি ও হিন্দু জনশক্তি অথবা মুসলমান রাজশক্তি ও মুসলমান জনশক্তিকে শাসক ও শাসিত শ্রেণী হিসেবে ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করেছেন তার কোন প্রমাণ তাঁর রচনায় নেই । বরং হিন্দু ও মুসলমানের নির্বিশেষে ধর্মীয় জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ধারণাই তিনি বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ করেছেন । মধ্যযুগের এই বঙ্গের রাজতন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যে ধর্মীয় ভিন্নতার জন্য জাতিগত ভিন্নতার কল্পনা, সর্বনীতি নিরপেক্ষভাবে, তাঁর হিন্দুপ্রীতি ও মুসলিম বিদ্বেষের, একটি নিদর্শন প্রকাশ পায়। তার আগেই যে কথা বলা হয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের বিশেষ প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্থাপন করলে এই বিদ্বেষের কারণ অনুধাবন অসম্ভব নয় । ড. গোপালও যখন 'তাহার রাজনৈতিক চিন্তাধারা সৌভিকত্বপূর্ণ কালের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যকে (বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভাষা ও ভাষা) অতিক্রম করিতে পারে নাই'[১৪০] বলেন তখন তিনি অভিযোগটি পরোক্ষে স্বীকার করেন,

কেননা ইংরেজের প্রতি এই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়বোধ স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এসেছে মুসলিম বিদ্বেষ। অন্যদিকে অনার্য হিন্দু সম্পর্কে তাঁর কোন উচ্চ ধারণা বা তাঁদের একত্রিত করার কোন তাকিদ তিনি বোধ করেন নি। তাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় যে জাতীয় সম্ভাবনা তাঁর চোখে পড়েছে এবং তিনি উল্লেখিত করেছেন তা হলো 'জাতীয় আর্যদের অভ্যুদয়।'(১১) তিনি লিখেছেন: 'অনেক জাতীয় আর্যদের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই। এখন সে সময় দেখিতে উপস্থিত। কাল সময় না হইল, মুসলমানের যে সাধনী শক্তিতে পৃথিবী জয় করা সম্ভব হইবে, তাহার অঙ্কুর জাগিয়াছে।'(১২)

অতএব একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের দেখা দরকার। দেশটি তখন ইংরেজ অধিকারে এবং দেশের অর্থনীতি ইংরেজের শোষণে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। বাঙ্গালা দেশের তাঁর সমস্ত সময় জুড়ে ইংরেজরা তখন অত্যাচারের বাজারে খুলে বসেছে, তাঁরা শুধু এর ফলে সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে কোন নীতিগত আপত্তি আনা করে নি, নারীদের জীবনে সমস্যায় দুর্গতি নেমে এসেছে, সমগ্র ভারতে বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে জোটবদ্ধ বিদ্রোহ-বিক্ষোভের বিষয়ে শিক্ষা হয়েছে, যে বিদ্রোহ নষ্ট করা হয়েছে সমস্ত প্রবাহ শক্তি প্রয়োগ করে। তাই একটি পরাধীন দেশের স্বাদেশিকতার প্রাথমিক শর্ত হলো বিদেশী শাসনের বিরোধিতা, বিদেশী শাসন শোষণ উচ্ছেদের প্রচেষ্টা। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতা তথা ভূমিকাটি লক্ষ্য করা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বাক্য 'সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি' একথা তিনি বলেছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বলেছেন: 'আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism

একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ।'[১৪৩] তিনি লিখেছেন : 'ভিন্নজাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না।'[১৪৪] পুনশ্চ লিখেছেন : 'যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহাসনারূঢ় পরন্তু এবং অন্য দেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র।'[১৪৫] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই ধারণার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরো বলেছেন : 'আমরা মুসলমানদিগের অধীন উভয় অবস্থাতেই পরতন্ত্র ও পরাধীন নহি, ইংরেজের শাসিত অবস্থাতেই স্বতন্ত্র ও অধিক স্বাধীন বটে।'[১৪৬] অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতা পরাধীনতা সংক্রান্ত রাজনৈতিক অবস্থার চেয়ে ধর্মনৈতিক দিকটিকে গুরুত্ব দিতেন বেশী এবং ইংরেজের রাজত্বকালে হিন্দুধর্মের উপরে কোনপ্রকার আক্রমণ ঘটেনি এই ধারণাতেই তাঁকে ইংরেজদের শাসনকালকে তুলনামূলক 'মুক্ত ও স্বাধীন' বলতে প্ররোচিত করেছে। তিনি লিখেছেন : 'ইংরেজের রাজত্বে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কেবল পরানুবাদ ও পাশ্চাত্যপ্রিয় শিক্ষালব্ধ হইলে, হিন্দুর চরিত্র ধর্ম ও প্রকৃতি বিলুপ্ত হইবে।'[১৪৭] ইংরেজ শাসনে হিন্দুদের ধর্ম কোনপ্রকার আক্রান্ত হয়নি না — এমনকি, সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে হিন্দুসমাজের সংস্কারমূলক কাজেও তার শাসকগোষ্ঠীর কোন উৎসাহ দেখায় নি, এটাও মনে রাখতে হবে — এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সিরাজদৌলার শাসনের চেয়ে ইংরেজ শাসনকে অনেক বেশী 'মুক্ত ও স্বাধীন' মনে হয়েছে। একারণেই তিনি ধর্মীয় রাজার শক্তি কথাটা হিন্দু ধর্মীয় জীবনচর্যার প্রতীক রূপে কথা বলেছেন; তিনি বলেছেন : 'প্রজার ভক্তিবলেই রাজা শক্তিমান নহিলে রাজ্যের শান্তি রক্ষা হয় ; রাজা দুর্বল হইলে সমাজ থাকে না। অতএব রাজাকে সমাজের শিরোভূষণ ভক্তি করিবে। ধর্ম জীবন সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ ও উৎকর্ষাদি দেওয়া গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্যান্য অনুশাসন দ্বারা রাজভক্তি প্রকাশ করিবে।'[১৪৮] অতএব বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজবিরোধী ছিলেন এমন একটা ধারণা সৃষ্টি

করার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিকৃত করার চেষ্টা মাত্র । ইংরেজ শাসন শোষণের কল্যাণে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি সেই শ্রেণীর আদর্শ প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র নিজ শ্রেণী স্বার্থেই ইংরেজবিরোধিতা করতে পারেন না এবং করেননি। এমন কি হিন্দু ভারতবর্ষ ও ইংরেজ ভারতবর্ষের তুলনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : 'আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ ছিল। হিন্দু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় দুইই তুল্য, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল ।'[১৩২] সুতরাং 'আনন্দমঠের শিরোনামায় 'ইংরেজ দেশকে অরাজকতার হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছে' এই উক্তির উপস্থিতে বঙ্কিমমানসের কোনো স্বরূপ পরিবর্তন নেই ।'[১৩৩] কল্পবাদিত আদর্শ বলেই মনে হয় । বিদ্রোহের যে সংগঠনের মূলক প্রবন্ধের ধর্মীয় বিদ্রোহের জোরে এই কল্পনা করা হয়েছে যে তাতে শিয়োরপাত্র সংগতি, কর্মজিজ্ঞাসা ভীতি ও বৈরাগ্যপ্রীতি আছে । ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তার মোহ যা ছিল তা স্বার্থ মতো নিয়ে । 'আধুনিক ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর লোকে বুদ্ধি মুক্তি লাভ করে এবং যোগ্যতানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না।'[১৩৪] ইংরেজ শাসনে তাঁর মোহ এইটুকুই । নতুবা, ভারতের দুঃখ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা এবং শাসক প্রসঙ্গে, ইংরেজ শাসনে 'বাঙালী প্রজা'র যে দুর্গতি হয়েছে এবং হিন্দুরা কার্যবৃত্তি ব্যাপারে মুসলমান আমলের চেয়ে অনেক নিশ্চিত হতে পেরেছে একথা তিনি বলেছেন । ইংরেজ শাসনে বাঙালিদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে তিনি কোনভাবেই স্বীকার করতে পারেন নি, বরঞ্চ উন্নতির প্রমাণই তিনি হাজির করেছেন ।

১০ .

ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক পর্ব থেকেই, অন্তত কোলকাতার সমাজে, সমাজ-জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার সঞ্চার হয়েছিল, জীবিকার ক্ষেত্রে অন্তত হিন্দুসমাজের বর্ণভিত্তিক কর্মবিভাগ ও সামাজিক স্তরবিন্যাসকে সামান্যভাবে হলেও আঘাত করেছিল, ব্রাহ্মণ বৈদ্যের ব্যবসা বাণিজ্যকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করছিল না শুধু ব্রাহ্মণের জীবিকা

অধ্যাপনা গ্রহণ করেছিল ও করতে [illegible] পারছিল। এ জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর হিন্দু ধর্ম-বর্ণ অনুসারী অনুশীলনতত্ত্বকে 'জীবিকা নির্বাহের পর' অবশিষ্ট সময়ের জন্য রেখেছিলেন। অন্যদিকে, কোলকাতার বিকাশ ও তার আর্থিক জীবন শিল্পকেন্দ্রিক না হয়ে মূলতঃ বাণিজ্যিক ও প্রশাসনকেন্দ্রিক হলেও, চাকুরী ও অন্যান্য প্রযুক্তক কাজের জায়গায় বাঙালিদের প্রাধান্য থেকে নানাবর্ণের লোকের আসতে থাকে, এক পর্যায়ে অনুবৃত্তির গতিশীলতায়, যদিও সেগুলো দুর্বলতায় শীর্ণ হলেও, ব্যাহত হয়েছিল। ফলতঃ, কোলকাতা শহরে অন্ততঃ, হিন্দুসমাজের ঐতিহ্যিক প্রাচীন সমাজ কাঠামোর পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্য থেকেই আমরা দেখেছি, ইংরেজের প্রভাব সাধারণ ও ইউরোপ ও বাণিজ্যের প্রয়োজনেরই, এ সম্পর্কে, মূলতঃ কোলকাতা শহরে, আলোচনা নিশ্চিত শুরু হয়েছিল। কথা হচ্ছে এটাই যে প্রাচীন সমাজ কাঠামোর সংস্কার বিষয়ে যারা বিরোধী ছিলেন, যাদের ভূমিকা এই ছিল যে, এঁদের অনেকেই হিন্দুধর্মবিরোধী, হিন্দু পুনরুত্থান হিন্দুধর্মের অনুসৃত নির্ধারিত বর্ণ তথা বর্ণবিন্যাস থেকে সরে এসে, এঁদের প্রায় সকলেই বর্ণ বিরোধী বৃত্তিকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জীবিকার ব্যাপারে তাঁরা বর্ণসংস্কারকে অস্বীকার করলেও, ব্যক্তিজীবনে এই বর্ণসংস্কার অবলম্বন করে হিন্দু ধর্মসংস্কার টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন বা দ্বারকানাথের বৈশ্যের বৃত্তিবাণিজ্য গ্রহণ করেও শূদ্রের স্পর্শে বেদপাঠে অধিকার মধ্যে এই মনোভাবের উদাহরণ রয়েছে। তার মানে, পুরাণো সমাজব্যবস্থা বজায় থাকলে বর্ণব্যবস্থার বন্ধন ও বাধ্যতা ছাড়াও সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন ও বাধ্যবাধকতা বজায় থাকবে; অথচ এভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্ক বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ বিষয়ে

থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্রও একটু স্বার্থ ছিল বলে তাঁকেও এ ব্যাপারে অন্যায়কারী বলেছে, বিশেষতঃ সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই। এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রও নিস্পৃহ ছিলেন না। 'অমর ভারত সিন্ধু' বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে জানিয়েছেন: 'শূদ্রকে পড়া শিখাইতে গেলে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ পাই কেমনে [illegible]। ব্রাহ্মণকে পড়া শিখাইতে পারিলে শূদ্রের প্রণাম পাই কেমনে [illegible]।'[১৩৩] অর্থাৎ শূদ্রদের achievement oriented [illegible] সমাজ ব্যবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রও চাননি। প্রাচীন বর্ণ ব্যবস্থাকে [illegible] বঙ্কিমচন্দ্র পোষণ করতে চেয়েছেন, ঈ. উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবাদর্শের মতোই। অর্থাৎ জীবিকার ব্যাপারে তাঁর নিকৃষ্ট ও শূদ্র [illegible] সমাজের মূল্যবোধগুলো পুরোপুরি পোষণ করতে চাইছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক ভাবনা ও মূল্যবোধ হিন্দু ধর্মের সামন্ততান্ত্রিক [illegible] ভাবনা ও মূল্যবোধ থেকেই মূলতঃ গড়ে উঠেছে।

[illegible] প্রধান [illegible] বৈশিষ্ট্য হিসেবে মধ্যযুগের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের কথা বলা যায়।[১৩৪] মধ্যযুগের [illegible] সামাজিক [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'আধুনিক' প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধই হচ্ছে মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য। [illegible], এবং [illegible] [illegible] হিন্দুধর্মের [illegible] [illegible] [illegible] এবং এই [illegible] [illegible] হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক সামাজিক মূল্যবোধ - [illegible], [illegible] ও [illegible], [illegible] ও [illegible] সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা, বিভিন্ন [illegible] [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] [illegible] [illegible] সামাজিক ভূমিকা ইত্যাদি - মধ্যযুগের, যাকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে, সামাজিক [illegible] হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে বিদ্যমান ছিল; এমনকি, এই বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেও, এই ভাবনা আমাদের [illegible] হয়ে বিরাজ করছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োজনে সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে ফেলেছে এবং নতুন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপযোগী মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়ক এবং [illegible] [illegible] [illegible] সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক

পঠন ও সামাজিক মূল্যবোধও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়েছে । অন্যদিকে, ভারতবর্ষকে যেহেতু বৃটিশ অর্থনীতির স্বার্থে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র দেশের কাঁচামাল রপ্তানি ও ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাতদ্রব্যের আমদানীর প্রয়োজনে, তাই এই ইংরেজ অধিকৃত এ দেশে সুসংবদ্ধ শিল্পায়ন সম্ভব হয়নি, বিজ্ঞানচর্চার পথ খোলেনি; এখানে স্বাধীন বুর্জোয়াশ্রেণীর পরিবর্তে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার উদ্ভব হয়েছে; এ দেশের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার স্বার্থ জড়িয়ে ছিল ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া স্বার্থের সঙ্গেই । এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি । তবুও, শোষণের প্রয়োজনে মুদ্রা অর্থনীতি প্রচলন করার ফলে সুপ্রাচীন অর্থব্যবস্থা ও জীবনযাত্রার পরিমণ্ডলে যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, সমগ্র দেশের তুলনায় খুবই সামান্যভাবে এবং সুদূর কোলকাতায়, তাদেরই ফলে কতিপয় অর্থনৈতিক এই সামান্য পরিবর্তনের সাথে মিলিয়ে পুরোনো মূল্যবোধের কিছু কিছু সংস্কার সাধন প্রয়োজন পড়েছিল । রামমোহনের হাত, বঙ্কিমচন্দ্রও সেই সামান্য সংশোধনই আকাঙ্খা করেছিলেন, শরৎচন্দ্র ও তাঁর অন্যান্য গল্প রচনায় তার প্রমাণ রয়েছে । সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভেতরেই তিনি অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে চেয়েছিলেন । তার সঙ্গেই এল, বাংলার মধ্যবিত্ত ভাবপ্রবণতার যে স্বরূপ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি, সেই আদর্শই বঙ্কিমের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত লেখার কেন্দ্র ছিল উচ্চবর্ণীয় হিন্দু মধ্যবিত্তের আকাঙ্খা : 'জাতীয় জাগরণের অভ্যুদয়'[১১৩] আর এই 'অভ্যুদয়' এই শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী ইংরেজের আশ্রয়কে তাঁরা অনিবার্য বলে মনে করেছেন । তাই এই 'জাতীয় জাগরণ' ইংরেজ বিরোধিতা করতে পারে নি । 'শূদ্র' ও মুসলমান দেশের এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খার দিকে তাকাতে পারেনি, বরঞ্চ এদের স্বাতন্ত্র আন্দোলনের প্রতিপক্ষে তাঁরা দাঁড় করেছেন বিপরীত স্বার্থ ব্যক্ত, ইংরেজ শাসনের সমর্থন ও প্রশংসা করে, পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান ধারণা টিকিয়ে রেখে তাদের কুক্ষিগত করে রেখে তারা এদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার চাননি, কেননা তাতে শোষণের পুরো বনিয়াদই ক্রমশঃ ভেঙে পড়বে । বিশেষতঃ বাংলাদেশের লোকসংখ্যার প্রায়

অর্থাৎ কৃষক মুসলিম জনসাধারণের কথা মনে রেখে ইংরেজ শাসকদের প্রশ্রয়ে মুসলিম বিদ্বেষ ক্রমশঃ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে নিপীড়িত হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে ইংরেজদের ও 'বনেদি বাবু'দের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে। এ অবস্থা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বিরাজ করছিল, অন্যদিকে অনুমান করা হয় ১৮৫৭ সালের পর থেকে পুনরুত্থান নিয়ে সাধারণ হিন্দু [illegible] মুসলিমবিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করেছে, ঐতিহাসিকে যা হিন্দু পুনরুত্থানবাদ নামে পরিচিত। এ কথা আমরা আগেই উল্লেখ আলোচনা করেছি। ভক্তিবাদীদের হিন্দুত্ববাদের পুনরুত্থানের প্রভাবে, 'বনেদি বাবু'দের নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যে প্রতিফলিত, শিক্ষিত উপন্যাসে। শিক্ষিত উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রচিত্রণে সাহিত্যের এই বিভিন্ন প্রবণতাগুলিই স্পষ্ট, যার সমগ্র পরিচয়ের প্রচেষ্টা করছি।

১৬.

সমকালীন কোলকাতার জীবনের উপাদান নিয়ে, যার ভিত্তিতে সামাজিক পরিস্থিতি, যা রচিত উপন্যাসগুলিতেই যথার্থ পটভূমি ও পরিবেশ, কেননা পূর্ববর্তী কালে বহু সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা উপন্যাসে সাধারণ পটভূমি ও পরিবেশ রচনা করে না, কালীপ্রসন্ন সিংহ উপন্যাসে প্রথম এই কোলকাতার জীবন ও পরিবেশকে প্রথম ব্যবহার করেন নি, প্যারী ও টেকচাঁদ উপন্যাসে ব্যবহার করলেও তা মাত্র পটভূমি হিসেবেই দেখা গেছে, কোলকাতার জীবন এই উপন্যাসের

জীবন-প্যাটার্ণে কোন প্রতিষ্ঠাত হেনেনি। তার পরিবর্তে বঙ্কিম গ্রহণ করেছেন বিগত কালকে, বিগত কালের মানুষদের, অথবা যখনি সমকালকে গ্রহণ করেছেন তখনও সমকালের প্রাচীন মানুষদের, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত ভূস্বামী শ্রেণীকে। কিন্তু এখানেও দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পনের মতো তিনি প্রাচীন মানুষদের প্রাচীন ব্যবস্থায় থেকে তাদের উত্থান-পতনকে বর্ণনা করেন নি। যে শিল্পবোধ থেকে তিনি তাঁর উপন্যাসে চরিত্র ও জীবন-প্যাটার্ণকে নির্দিষ্ট করেছেন সেই শিল্পবোধ, ঐক্য বা অন্যভাবায় শক্ত জটিলতা, তাঁকে এই ব্যবস্থার প্রতিভূ কী করে নি। বস্তুত যে জীবনের প্যাটার্ণ তিনি খুঁজেছেন তা ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিম সমকালীন বাঙালীদের বাস্তব পরিবেশ থেকে আবিষ্কার করা ও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না, কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিম সমকালীন বাঙালীদের বাস্তবতার প্রতি তিনি তাঁর উপন্যাসের বিষয় শিল্পের গ্রহণ করেছেন তবে তাঁর সমস্ত শিল্প জীবনের প্যাটার্ণই হতো অপূর্ণ। বঙ্কিম তাই বাস্তবতা থেকে সরে এলেন রোমান্টিকতায়, গ্রহণ করলেন অতীতকাল ও অতীতকালের মানুষদের, অতীত তাঁকে সাহায্য করলো কল্পনার প্রসারতায়; অতীতকালকে অবলম্বন করেই তিনি তাঁর জীবনের প্যাটার্ণকে রূপায়িত করে তুললেন, তাঁর শক্ত জটিলতা অতীতকালকে অবলম্বন করেই সার্থকতাকে স্ফূর্তি পেল। কেননা, 'উপন্যাসের বিষয় সম্বন্ধে লেখকের সচেতনতা অথবা লেখকের জীবনচেতনা অথবা সমাজ সভ্যতা সম্বন্ধে চেতনার নামান্তর'[১৩৪] জন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর

সামাজিক স্থায়িত্ব প্রয়াসী শিক্ষিত বাঙালী মধ্য বিত্তের পক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সন্নিহিত বাস্তবতায় প্রবেশ ও প্রকাশ কোনটাই সম্ভব ছিল না। কেননা বাঙালী মধ্য বিত্তের আদর্শ তোরাব বা ভবানী পাঠক নয়, তার আদর্শ রাজসিংহ; বঙ্কিমচন্দ্র জগৎসিংহ বা হেমচন্দ্রকে অবলম্বন করেই ক্রমশ রাজসিংহের আদর্শে পৌঁছতে চেয়েছেন। বাইরনের নারী চরিত্রের আদর্শও বঙ্কিমের নয়, বঙ্কিমের আদর্শ সতী নারী চরিত্র প্রফুল্ল; স্টেবিলিটি প্রয়াসী বাঙালী মধ্য বিত্তের পক্ষে বাইরনের নারী চরিত্রকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বাস্তব পরিবেশে স্থাপন করলে প্রয়াসী প্রার্থিত স্টেবিলিটিকেই আঘাত করবে। প্রাচীন পটভূমিকায় তোরাব চরিত্রের যথাযথ বিকাশ বা ভবানী-পাঠকের যথাযথ পরিণতি স্টেবিলিটিপ্রয়াসী বাঙালী মধ্য বিত্তের স্টেবিলিটিকেই আঘাত করে বসবে, তাই তোরাব শ্রেণীর চরিত্ররা তাঁর উপন্যাসে স্থান পায় বস্তুতার খানিকটা হিসেবে, আর ইতিহাসের ভবানী পাঠক হন অন্য ভবানী পাঠক; "বঙ্কিম ভয় পেলেন ইতিহাস থেকে যথাযথ ভবানী পাঠকের মুক্ত রূপ উঠে এসেছে। ইংরেজের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে যে ভবানী পাঠক প্রাণ দেয়, সে বড় ভয়াবহ দস্যু। স্টেবিলিটি সন্ধিৎসু বঙ্গীয় ভিক্টোরিয়ান তাকে কি করে সাহিত্য পটে প্রশ্রয় দেবেন?"[১০৫] তাই তিনি সন্নিহিত বাস্তব থেকে পিঠ ফিরিয়ে তাকালেন পেছনে, অনেক পেছনে; মোগল-পাঠান, হিন্দু-পাঠান, মোগল-রাজপুত, মুসলিম-ইংরেজ বিরোধের কালকে উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে নির্বাচন করলেন, রাজা বাদশা জমিদার রানী রাজকুমারী ইত্যাদি চরিত্রকে স্থাপন করলেন সেই পটভূমিকায়, ইতিহাসের আলো অন্ধকারে নিজস্ব কল্পনার আলো নিক্ষেপ করলেন, গড়ে তুললেন নিজস্ব জগৎ, জীবনের প্রাচীর্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু মধ্য বিত্তের মানসিকতা নিয়েই তারা এলো প্রাচীন পটভূমিকাসহ উপন্যাসে; এ জন্যই জগৎসিংহের

স্বয়ং তিলোত্তমার বিবাহপ্রস্তাবক এ অভিরাম স্বামী 'মন্দবংশীয় কন্যা। মুসলমানের পালিত পুত্রের বধূ হইবে?' এই প্রশ্ন করেন, এজন্যই জীবনে দু-দুবার 'পদস্খলন' সত্ত্বেও অভিরাম স্বামী 'পরমহংস' এবং বিমলাকে 'পাপীয়সি' বলে ক্রোধ প্রকাশ করেন। একই মানসিকতায় মৃণালিনীর মাধবাচার্য মুসলমান অধিকার থেকে হিন্দুরাজ্য উদ্ধারের জন্য দেশের নানাপ্রান্তে ছুটে বেড়ান; কেন বেড়ান তার উত্তর নেই, যেন ব্যাপারটা স্বতঃসিদ্ধ। তৎকালীন মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকেই মুসলিম 'কাফেরের বজ্জাতি' নিয়ে সীতারামের কাহিনী শুরু করতে হয়, 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে' এই শিবর প্রত্যয় থেকে সীতারাম হিন্দুরাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হন, 'মুসলমানের অত্যাচার' থেকে হিন্দু প্রজার উদ্ধারে ব্রতী হন। এইভাবে মধ্যশ্রেণীর জ্ঞানবিমুক্ত চেতনা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শিল্পীসুলভ জীবনের পাটাতেই মধ্যেই চরিত্রকে ধরে রাখতে চান, যখন পারেন না তখনই পাপ ও পাপীয়সীর প্রশ্ন এসে যায়। তাঁর এই সংবৃত প্রতিজ্ঞাতেই তাঁকে বাস্তবতা থেকে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙালী জীবনের বাস্তবতা থেকে তাঁকে রোমান্স ও রোমান্টিক জগতে নিয়ে গেছে। অবশ্য রোমান্স ও রোমান্টিকতা ঠিক সমার্থক নয়। রোমান্টিক ও বাস্তববাদী দুজনেই তাদের নিজস্ব মাধ্যম অবলম্বনে চেতনার বিস্তৃতি সাধন করে থাকেন। 'রোমান্সের ক্ষেত্রে এই চেতনার বিস্তৃতি সাধনের প্রবণতা প্রকৃত হয়ে থাকে।'[156] কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তবতা মূলতঃ বিষয়মুখী, রোমান্টিকতা মূলতঃ বিষয়ীমুখী। বাস্তববাদী বিষয়ের টানাপোড়েনের ভেতর দিয়েই সত্যে পৌঁছতে চেষ্টা করেন কিন্তু অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে, আর অন্য দিকে, রোমান্টিক মূলতঃ তাঁর সংবৃত অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়কে আত্মীভূত করেন, রোমান্টিক নিজস্ব করে নেন। ফলতঃ রোমান্টিক ও বাস্তববাদীর চেতনার বিস্তার ভিন্নমুখী

হচ্ছে বঙ্কিম। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সংবৃত অভিজ্ঞতার আলোকে চেতনার যে বিস্তৃতি সাধন করেছেন তা তাঁর বর্জিত ব্যাখ্যাত জীবনেরই রূপায়ণ আর তা করতে গিয়েই তিনি বাস্তব জগৎ থেকে নিরস্ত রোমান্টিক জগৎ তৈরী করেছেন। শেটাবলিটি প্রাণী বাঙালী মধ্যবিত্তের পক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বাস্তবতাকে গ্রহণ ও সাহিত্যে তার চিত্রায়ণ অসম্ভব ছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্টিকতার আশ্রয় নিয়েছেন: প্রাচীনকালের পটভূমিকায় বাঙালী মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষার ছবি গড়ে তুলেছেন। আলালের ঘরের দুলাল থেকে বাংলা উপন্যাসের দুর্গেশনন্দিনীতে প্রত্যাবর্তনের কারণ এটাই। এর তার ফল আমাদের সাহিত্য ও সমাজ কোনটার পক্ষেই ভালো হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান দশটি উপন্যাসকে আলাদা আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করে আমাদের বক্তব্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করবো; রাধারাণী, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রজনীকে আমরা বাদ দেবো - কেননা এদের উপরোক্ত দশটি উপন্যাসের অতিরিক্ত কোন সমাজচেতনা প্রকাশিত হয়নি।

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১। চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ড. ভবতোষ দত্ত, পৃ. ৪৩ কলিকাতা, ১৯৭১,

২। বঙ্কিমবরণ, মোহিতলাল মজুমদার, পৃ. ৬, ২য় সং, ১৩৫৮,

৩। 'আমরা প্রথমে বঙ্কিমমানসকে উপলব্ধির পথে অগ্রসর হবার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশদৃষ্টিকে প্রথম সূত্র হিসেবে ব্যবহার করবো।' বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৭ কলিকাতা, ১৯৭৬,

৪। মোহিতলাল মজুমদার, পৃ. ৩২

৫। ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিমরচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ পৃ. ৫৮২। কলিকাতা, ১৩৮৭,

৬। হিন্দুধর্ম " পৃ. ৭৭৮

৭। " " পৃ. ৭৭৮

৮। বাঙ্গালীর উৎপত্তি, " পৃ. ৩৪৭

৯। " " পৃ. ৩৫২

১০। " " পৃ. ৩৫২

১১। " " পৃ. ৩৫২

১২। " " পৃ. ৩৫৩-৪

১৩। দ্র. " " পৃ. ৩৪৪

১৪। বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বঙ্কিমচন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, পৃ. ৩৪৪

১৫। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, " পৃ. ৩২৬

১৬। " " পৃ. ৩২৭

১৭। উপর্যুক্ত ৯-১৩ উদ্ধৃতি থেকে, এমনকি সম্পূর্ণ 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধের বক্তব্য ও টোন থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে মুসলমান ও উচ্চবর্ণের বাইরে বাঙালী সমাজের গরিষ্ঠাংশের - মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের - সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কোন রকম সহমর্মিতা ও একাত্মতা বোধ করেন নি বরঞ্চ বাঙালী সমাজের এই মুসলিম ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও, সম্পর্ক-নিরপেক্ষ করে তিনি পাঁচ-লোকে-দূরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেই গর্বিত। তাই পিছিয়ে প্রান্তিকে সমবেদনা নাই' বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যকে উদ্ধার করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৈন্যাবৃত বৃত্তি সম্পর্কে তাঁর বিরূপতা তথা আপামর জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত হবার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে, যেমন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে বলেছেন, এমন মনে করার যথার্থ কারণ নেই। বঙ্গদর্শনের 'সূচনায়' যে কথা বলেছেন, 'উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগেরকোন দুঃখে দুঃখী নহেন' এবং 'মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান ও কৃতবিদ্য দিগের কোন সুখে সুখী নহে'। (বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮২), আর বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে 'তুমি আমি কয়জন ?... দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। ... সকল কৃষিজীবী সেদিনে কে কোথায় থাকিবে ? কিনা হইবে ?'

(বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃ. ২৮৮-৯) এই আশঙ্কাকে পশ্চাদপটে ~~[illegible]~~ রাখলে দ্বিতীয় বাক্যটিই যে প্রধান, কেননা কৃতবিদ্য ও ধনবান 'কয়জন'? দেশের অধিকাংশই মূর্খ ও দরিদ্র, তারা 'শৈশবে কে কোথায় থাকিবে?' তাই 'সুশিক্ষিত বাঙালীদিগের অভিপ্রায় সকল' মূর্খ ও দরিদ্রদের বোঝানোর জন্যই বাংলাভাষায় বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ, যাতে কৃতবিদ্যদের তারা 'চিনিতে পারে .... সংস্রব আসে।' অর্থাৎ 'ধনবান ও কৃতবিদ্যদের সুখে' তারাও যাতে নিজেকে সুখী ভাবতে পারে এবং 'দেশা'র সম্ভাবনা নষ্ট হয় তারই প্রচেষ্টা এটা, জনসাধারণের স্বার্থে জনসাধারণের স্বর্গ মিলবার আকুতি থেকে নয়। তেমনই দীনবন্ধুর নীলদর্পণকে 'নাটকের অবমাননা' মনে হয়েছে।(বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০) এবং পাবনার কৃষক বিদ্রোহ ও মীরমোশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: 'পাবনা জেলার প্রজাদিগের আচরণ জানিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি। সুতরাং উপস্থিত যুক্তাযুক্তি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমরা পরামর্শ দিই যে, এ সময়ে এ গ্রন্থের বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য।'(বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০)

১৮। বঙ্কিমরচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫১

১৯। " " পৃ. ৬৫১

২০। " " পৃ. ৬৫১

২১। " " পৃ. ৬২২

২২। " " পৃ. ৬৫২

২৩। বঙ্কিমরচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮১

২৪। " " পৃ. ৫৮৯

২৫। " " পৃ. ৫৮৪

২৬। " " পৃ. ৫৮৪

২৭। " " পৃ. ৫৮৪

২৮। " " পৃ. ৫৮৬

২৯। বঙ্গদেশের কৃষক, রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃ. ৩১৪

৩০। " " পৃ. ৩০৯-১০

৩১। দ্র. Nineteenth Century Bengal, Chap. V., Pradip Sinha, Calcutta, 1965.

৩২। [illegible] রচনাবলী, ২য় খণ্ড পৃ. ৫৮৫

৩৩। " " পৃ. ৫৮৫

৩৪। " " পৃ. ৬১২

৩৫। " " পৃ. ৬০৪

৩৬। " " পৃ. ৬০২

৩৭। " " পৃ. ৫৮৫

৩৮। বঙ্গদেশের কৃষক, রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫

৩৯। " " পৃ. ২৯৯

৪০। " " পৃ. ৩০১

৪১। " " পৃ. ৩০১

৪২। " " পৃ. ৩০১

৪৩। " " পৃ. ৩০৪

৪৪। " " পৃ. ২৯২

৪৫। " " পৃ. ৩০৭

৪৬। " " পৃ. ৩০৯

৪৭। " " পৃ. ২৬৮-৯

৪৮। " " পৃ. ৩১০

৪৯। " " পৃ. ৩০৯-১০

৫০। লর্ড রিপনের উৎসবের জমাখরচা। রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১১

৫১। দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, পাদটীকা, বঙ্কিমরচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭৬

৫২। " " পৃ. ৭৭৬

৫৩। কমলাকান্ত, রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃ. ৫৮৫

৫৪। " " পৃ. ৫৮৫

৫৫। " " পৃ. ৬৬১

৫৬। " " পৃ. ৫৭

৫৭। " " পৃ. ৬ ৫৭

৫৮। " " পৃ. ৬৫৮

৫৯। " " পৃ. ৬৫৮

৬০। " " পৃ. ৬৫৮

৬১। " " পৃ. ৫৮

৬২। সাম্য " পৃ. ৩১১

৬৩। বঙ্কিমপুর্ণ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ১১৬ / বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ভূমিকা, ১২/,

৬৪। সাম্য, রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০১

৬৫। " " পৃ. ৪০১

৬৬। " " পৃ. ৪০১

৬৭। " " পৃ. ৪০২

৬৮। সাম্য, রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০১

৬৯। প্রাচীনা ও নবীনা, " পৃ. ২৫৩

৭০। বহুবিবাহ, " পৃ. ৩১৭

৭১। বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।
বঙ্গদর্শন: নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, রবীন্দ্রগুপ্ত সম্পাদিত, পৃ. ১৭৭-১৮১।
কলকাতা, ১৯৭৫

৭২। বঙ্কিমচন্দ্র আত্মস্মৃতি প্রথায় দ্রষ্টব্য। রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃ. ৫৩৮-৫।

৭৩। সংবাদ বাংলা পাঠাগার, পৃ. ১০০

৭৪। জন্ম এক বঙ্কিমচন্দ্র, গোপালচন্দ্র রায়, পৃ. ২৬৫। কলকাতা ১৯৭৯

৭৫। " " পৃ. ২৬৫

৭৬। বঙ্কিমচন্দ্র, রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৮

৭৭। " " পৃ. ৬৬৮

৭৮। " " পৃ. ৬৬৮

৭৯। " " পৃ. ৬৬৮

৮০। " " পৃ. ৬৬৮

৮১। বাঙালীর উৎপত্তি রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃ. ৩৫৩

৮২। বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃ. XXXX ৫১০

৮৩। " " পৃ. XXXX ৫৮৯

৮৪। " " পৃ.৫৯১

৮৫। " " পৃ. ৫৯৫

৮৬। " " পৃ. ৬০৫

৮৭। " " পৃ. ৬৬০

৮৮। " " পৃ. ৫৯৩

৮৯। " " পৃ. ৫৮৪

৯০। " " পৃ. ৫৮৪

৯১। " " পৃ. ৫৯৫

৯২। " " পৃ. ৬২০

৯৩। " " পৃ. ৬২৩

৯৪। " " পৃ. ৬৩৪

৯৫। " " পৃ. ৬৪৩

৯৬। " " পৃ. ৬৪৩

৯৭। " " পৃ. ৬৪৩

৯৮। শরৎচন্দ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃ. ৬২০

৯৯। " " পৃ. ৬৪৭

১০০। " " পৃ. ৬১৫

১০১। " " পৃ. ৬১৫

১০২। " " পৃ. ৬১৫

১০৩। " " পৃ. ৬১৭

১০৪। " " পৃ. ৬১৮

১০৫। গোপাল চন্দ্র রায় পৃ. ৩১১

১০৬। শরৎচন্দ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃ. ৬১৬

১০৭। " " পৃ. ৬১৬

১০৮। " " পৃ. ৬২০

১০৯। বন্দীদের বৃক্ষ প্রবন্ধ পুস্তিকা ।

১১০। শরৎচন্দ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃ. ৫১১

১১১। " " পৃ. ৬৭৮

১১২। " " পৃ. ৬৭৮

১১৩। ধর্মতত্ত্ব রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃ. ৬৭৮

১১৪। " " পৃ. ৬৭৮

১১৫। " " পৃ. ৬৭৯

১১৬। বাঙালীর উৎপত্তি, " পৃ. ৩২৪

১১৭। ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৮

১১৮। " " পৃ. ৬১৮

১১৯। " " পৃ. ৬৩৬

১২০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা " পৃ. ৬১৪

১২১। " " পৃ. ৬১৫

১২২। " " পৃ. ৬১৫

১২৩। " " পৃ. ৬১৫

১২৪। " " পৃ. ৬১৫

১২৫। ধর্মতত্ত্ব, " পৃ. ৬৭১

১২৬। মোহিতলাল মজুমদার, পৃ. ১

১২৭। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬

১২৮। বাঙালীর উৎপত্তি, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩

১২৯। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, " পৃ. ৩২৫

১৩০। " " পৃ. ৩২৭

১৩১। বাঙালীর উৎপত্তি, " পৃ. ৩৪৪

১৩২। " " পৃ. ৩৪৭

১৩৩। " " পৃ. ৩৪৪

১৩৪। " " পৃ. ৩৫০

১৩৫। দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম " পৃ. ৭৭৬

১৩৬। [illegible], " পৃ. ১০৩

১৩৭। ধর্মতত্ত্ব, " পৃ. ৬৪৬

১৩৮। বঙ্কিমমানস, ড. অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ. ১৫০,

১৩৯। ড. ভবতোষ দত্ত, পৃ. ১৫৭

১৪০। ড. অরবিন্দ পোদ্দার। পৃ. ১৪৭

১৪১। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, রচনাবলী, ২য় খণ্ড পৃ. ৩২৭

১৪২। " " পৃ. ৩২৭

১৪৩। বঙ্কিমচন্দ্র, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬১

১৪৪। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪

১৪৫। " " পৃ. ২৪২

১৪৬। " " পৃ. ২৪২

১৪৭। বঙ্কিমচন্দ্র " পৃ. ৬৬০

১৪৮। " " পৃ. ৬১৬

১৪৯। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, " পৃ. ২৪৪

১৫০। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১
১৫০ক. বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪
১৫১। বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড পৃ. ১৪০

১৫২। দ্র. Sociology of Renaissance, A. V. Martin, London, 1945.

১৫৩। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭

১৫৪। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১২

১৫৫। বাস্তবতার দুই শতাব্দী ও বাংলা উপন্যাস, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়,
পূর্বাশা, বৈশাখ, ১৩৬৩ পৃ. ২৩

১৫৬। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১০৯ ।

।। বঙ্কিম উপন্যাসের সমাজ : মধ্যশ্রেণীর ভালোলাগা ও ভালোবাসা ।।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যেরই অন্যতর রূপ। তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে, ধর্মতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় যে জীবনের আদর্শ তিনি গড়ে তুলেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন তারই বাস্তব রূপায়ণ তার সমগ্র উপন্যাস। বঙ্কিম তাঁর জীবন সম্পর্কে বিশিষ্ট দৃষ্টি 'প্রুফ' প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে। কিন্তু প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্ক হলো বুদ্ধির, আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবার হলো হৃদয় দিয়ে, তাই ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে বঙ্কিম প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। বাদ দিলে হয়, না হলে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।'[১] কোন্ প্রয়োজন থেকে বাদ সেখানে বিশেষ হলো তা যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। তবে দুর্গেশনন্দিনী তাঁর প্রথম উপন্যাস এবং এই প্রথম উপন্যাসেই তিনি তাঁর বিশিষ্ট জীবনের পরিপূর্ণ ও যথাযথ আদর্শকে খুঁজে পেয়েছেন একথা ঠিক নয়। কিন্তু যে জীবনের আদর্শকে তিনি উত্তর রূপ দেবেন তার আভাস এই প্রথম উপন্যাসেও নেই; তাঁর মনের বিশিষ্ট প্রবণতা এই উপন্যাসেও নজরগোচর হবে।

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস মূলত জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেম ও তার সফলতা বর্ণনায় নিবদ্ধ: 'তিলোত্তমার প্রতি জগৎসিংহের আকর্ষণকে কেন্দ্র করে মূল প্লট তৈরী।'[২] কি ভাবে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বীরেন্দ্রসিংহের কন্যাকে লাভ করলো তা-ই হলো উপন্যাসের বর্ণিত বিষয়। লক্ষ করার বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র

একটি প্রেমকাহিনীর পটভূমি হিসেবে নির্বাচন করেছেন মোগল-পাঠান বিরোধের স্থান ও কালকে, ইতিহাসের ও কল্পিত রাজপুত্র রাজপুত্রীদের নিয়ে তার কাহিনী গড়ে তুলেছেন। শৈলেশ্বর মন্দির গড় মান্দারন পাঠান রাজপুরী বিজন পথঘাট ইত্যাদির মাধ্যমে ইতিহাসের আলোছায়ায় অতীতকালকে রূপায়িত করেছেন। এই পটভূমি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় পটভূমি; পরবর্তী প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসেই বঙ্কিম [illegible] অনুরূপ পটভূমি ব্যবহার করেছেন এবং এইভাবে ঐতিহাসিকতার দায়িত্বকে অস্বীকার করে অতীতের আলোছায়ায় আপন কল্পনায় নিজস্ব একটা যুগ রূপায়িত করেছেন, নিজ অনুভব-লব্ধ জীবনের প্যাটার্নকে রূপায়িত করেছেন। প্রথম বাংলা উপন্যাসের নায়ক নায়িকাকে বঙ্কিমচন্দ্র ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস থেকে নিয়ে এলেন; তাঁর নায়ক নায়িকা কেউই বাঙালীই নন, রাজপুত। পরবর্তীকালে হিন্দুর বাহুবল প্রসঙ্গে যিনি রাজসিংহ লিখবেন তাঁর পক্ষে বোধহয় একথা বলা চলে যে এরা হিন্দু বটে। নায়ককে লেখক যেভাবে উপস্থিত করেছেন তা থেকে একথা প্রমাণ হতে পারে:

(ক) ... পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকার মধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "মন্দির মধ্যে কে আছ?" কেহই প্রত্যুত্তর করিল না; কিন্তু অলঙ্কার ঝঙ্কার শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বৃষ্টিধারা ও ঝটিকার প্রবেশ রোধার্থে দ্বার যোজিত করিলেন, ... পুনর্বার কহিলেন: 'যে কেহ মন্দির মধ্যে থাক, শ্রবণ কর, এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে, যদি পুরুষ হও, তবে ফলভোগ করিবে, আর যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাও, রাজপুত হস্তে অসিচর্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।' (পৃ ৫৩) নয় শুধু, 'আমার

বংশের' বলে ব্যক্তিগত দম্ভ নয়, 'রাজপুত বংশের' বলে জাতিগত দম্ভপ্রকাশ করেছে নায়ক।

(খ) প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'নবীন সেনাপতি' শিরোনামায় পাঠান সেনার অত্যাচার দমনে মানসিংহ যখন কত সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কে যেতে প্রস্তুত প্রশ্ন করলেন তখন 'প্রথম সৈন্য বলবী' 'পঞ্চদশ সহস্র' সৈন্য নিয়ে যেতে চাইলেন; জগৎসিংহ সর্বাপেক্ষা কম পঞ্চ সহস্র সৈন্য নিয়ে যেতে প্রস্তুত। উপন্যাসে আছে:

'রাজা হৃষ্টচিত্তে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কুমার জগৎসিংহ তাঁহার দৃষ্টির অভিলাষী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তৎপ্রতি রাজার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র তিনি বিনীত ভাবে কহিলেন, 'মহারাজ! রাজপ্রসাদ হইলে এ দাস পঞ্চসহস্র সহায়ে কতলু খাঁকে সুবর্ণরেখা পারে রাখিয়া আসিবে।'

রাজা মানসিংহ অবাক হইলেন। সেনাপতিগণ কানাকানি করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা কহিলেন, 'পুত্র! আমি জানি যে, তুমি রাজপুতকুলের গরিমা, কিন্তু তুমি অন্যায় সাহস করিতেছ।'

জগৎসিংহ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, 'যদি প্রতিজ্ঞা পালন না করিয়া বাদশাহের সেনাবল অপচয় করি, তবে রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় হইব।'

রাজা মানসিংহ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'আমি তোমার রাজপুত কুলধর্মপ্রতিপালনের ব্যাঘাত করিব না; তুমিই এ কার্যে যাত্রা কর।'(পৃ.৫১)

এরই সঙ্গে লেখকের নিম্নোক্ত বিবরণ যুক্ত করলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে: 'ক্রমে রাজপ্রতিনিধি খাঁ আজিম, তৎপরে শাহবাজ খাঁ, কেহই শত্রুবিজিত দেশ উদ্ধার করিতে পারিলেন না। পরিশেষে এই আয়াসসাধ্য কার্যোদ্ধার জন্য একজন হিন্দু যোদ্ধা প্রেরিত হইলেন।'(পৃ. ৫৪)

'আনন্দমঠ' [illegible] আনন্দমঠ আদর্শ নয়, কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশে এসেছে, যেমন পরবর্তীকালে [illegible] সন্ন্যাসী [illegible] বৈষ্ণব রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করলেন। কিন্তু সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ, যথাস্থানে আলোচিত হবার যোগ্য। আপাতত, এ উপন্যাসে একটি প্রেম কাহিনীর বর্ণনাই মুখ্য এবং লেখক নায়কের বীরত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন নায়িকা লাভের প্রয়োজনেই। তাই [illegible], উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই, নায়ক নায়িকার 'চারি চক্ষে মিলন' ঘটিয়েছেন এবং তৎপর নায়ক [illegible] বিষয় [illegible] নায়িকা বিষয়ে [illegible] ভালোবাসা। [illegible] নায়ক ও নায়িকা প্রসঙ্গে [illegible] পরিচিত করতে গিয়ে [illegible], নায়িকা [illegible] দিয়ে। প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রিয় ও [illegible] বিষয় [illegible] সুন্দরী নারী [illegible]। এই [illegible] বঙ্কিমচন্দ্রের [illegible] উপন্যাসের [illegible] এবং উপন্যাসের ঐতিহাসিক [illegible] নারী সম্পর্কে, বিশেষত সুন্দরী নারী সম্পর্কে, এবং সেই সুন্দরী নারীর সম্মুখে পুরুষের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশেষ ধারণা ছিল এবং তা আমরা [illegible] 'আনন্দ [illegible]' প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় [illegible]। বঙ্কিমচন্দ্রের [illegible] নায়িকাই সুন্দরী এবং তাঁর নায়কেরা ঐ সুন্দরী নারীর সম্মুখীন হওয়া মাত্র তাদের এযাবৎ গাম্ভীর্য [illegible], যাকে বঙ্কিমচন্দ্র 'সুন্দর' [illegible] [illegible] তাদের চিন্তা প্রতিক্রিয়া [illegible] যুক্তি বুদ্ধি সমস্ত পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, [illegible] নারীরা পুরুষের জীবনের প্রধান [illegible] হওয়া মাত্র পুরুষ [illegible]। এর [illegible] শ্রী ও সীতারামের সম্পর্ক।

দুর্গেশনন্দিনীতেই এই মনোভাবের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যাবে। শুধু দেবালয়ের মধ্যে আলো অন্ধকারে অবগুণ্ঠিতা নায়িকার লক্ষিত দর্শনে জগৎসিংহ মুগ্ধ হয়ে পড়লেন দুর্গ মধ্যে, তিনি তিলোত্তমাময় হয়ে উঠলেন অথচ দুর্গে বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা পরিচয় পাওয়া মাত্র মুঘলের শত্রুর বিষয় জানলেন, কিন্তু তবুও পুনর্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা সম্ভব নয়, বিমলার সঙ্গে দেখা করলেন শৈলেশ্বর মন্দিরে, বিমলার সহায়তায় বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে আহত ও বন্দী হলেন। [illegible] এই গর্হিত কাজে ঠিকমত [illegible] পাঠকের মনে অনেক প্রশ্ন জেগে থাকে, [illegible] চতুর্দিকে শত্রুসেনা ঘিরে আছে তবুও দুর্গের চতুর্দিকে প্রহরী ও [illegible] নেই বা কেমন যখন দুর্গে প্রবেশ করলেন ও জগৎসিংহ যখন যুদ্ধ করতে করতে বন্দী হলেন তখন অবশ্যই বীরেন্দ্রসিংহ কি করলেন বা কি ভাবছিলেন, তবুও বিমলা এবং দুঃখিনী হওয়া সত্ত্বেও [illegible] জগৎসিংহকে প্রেমের আশ্রয় দিলেন এবং তার প্রেম তিলোত্তমাকেও দিলেন; কিন্তু ঔপন্যাসিকের প্রতিভা এখানেই যে তিনি ঐশ্বর্য [illegible] ঘটনার দুর্বলতা ও নাটকীয়তায় পাঠকের চিত্তকে [illegible]। তবে দুর্গেশনন্দিনীর এই পরিচ্ছেদের প্রথমে জগৎসিংহের প্রেমের সহায়ক হিসেবে, কেননা বিমলার সহায়তা ছাড়া তিলোত্তমাদর্শন জগৎসিংহের পক্ষে সম্ভব ছিল না, বিমলাকে এমনভাবে উপস্থিত করলেন যার ফলে বিমলার সঙ্গে পরিচয় সম্পর্কে পাঠক কৌতূহলাক্রান্ত হতে বাধ্য এবং সেই কৌতূহলের নিরসন ঘটাতে লেখক উপন্যাসে বিমলা-বীরেন্দ্র কাহিনীর সূত্র উপন্যাসকে টেনে আনলেন। যদিও মূল উপন্যাসে বিমলার ভূমিকা মুখ্য নয় গৌণ ভূমিকা, তবুও সেই কাহিনীটি যে উপন্যাসের একটি প্রধান কাহিনী হয়ে উঠেছে তার মূলে লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা অস্বীকার হয়, তবু সে প্রশ্ন আমার মনে

করুন পাঠকের কৌতূহল অটুট রাখার আকাঙ্ক্ষায় লেখক বিমলার পরিচয় যে দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন সে কথা মনে রেখে চরিত্রটির প্রাথমিক উপস্থাপনায় যে রহস্য রেখেছেন সেটা দেখা যাক :

(ক) .... কামিনী উত্তর করিল, '... আমরা সম্বন্ধে প্রতিবাসিনী, আপনি আমাদিগকে রাখিয়া আসিলে আমাদিগের সৌভাগ্য, কিন্তু যখন আমার প্রভু – এই কন্যার পিতা – ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি এ রাত্রে কাহার সঙ্গে আসিয়াছ; তখন ইনি কি উত্তর করিবেন ?' 'যুবক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'এই উত্তর করিবেন যে, আমি মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সঙ্গে আসিয়াছি ।' ' যদি কস্মিনকালে মন্দির মধ্যে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও মন্দিরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা অধিকতর চমকিত হইয়া উঠিতেন না । (পৃ. ৩৫)

(খ) বীরেন্দ্র সিংহ – বিমলা তোমার আজ এ বেশ কেন ?

বিমলা – আমার প্রয়োজন আছে ।

বীরেন্দ্র – কি প্রয়োজন আছে আমি শুনিব ।

বিমলা – 'তবে শুনুন' বলিতে বলিতে বিমলা কন্দর্পশরধারিণী চক্ষুর্দ্বয়ে বীরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, 'তবে শুনুন, আমি এখন অভিসারে গমন করিব ।' (পৃ. ৬৮)

(গ) এই কথা বলিবামাত্র ক্রোধে পরমহংসের চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুরিত হইতে লাগিল; কঠোর স্বরে কহিলেন, 'পাপীয়সী ! নিজ হতভাগ্য বিস্মৃত হও নাই ?' (পৃ. ৬৫)

এইভাবে বিমলাকে উপন্যাসে চিত্রিত করে লেখক পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টি করলেন এবং দীর্ঘসময় ধরে পাঠককে উৎকণ্ঠায় রেখে উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে এই কৌতূহল নিবৃত্তি করলেন। আমরা জানলাম বিমলা অভিরাম স্বামীর কন্যা বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী তিলোত্তমার বিমাতা। কিন্তু এইটুকুই শেষ নয়। আমরা জানলাম অভিরামস্বামীর প্রথমা কন্যা তিলোত্তমার মাতা। বিমলা শূদ্রীগর্ভজাত, অভিরাম স্বামী তথা দাসীকন্যা অবৈধসম্ভূত কন্যা। বিমলার শারীরিক সৌন্দর্যে সুন্দরী বিমলার সর্বনাশ … বিলাসী বীরেন্দ্রসিংহ তাকে … কিন্তু শূদ্রী কন্যা বলে বিবাহস্বীকৃতি না পাওয়ায় অভিরাম স্বামী কন্যাকে আশমানীদের অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেন যাতে তাদের দেখা না হয়। কিন্তু উভয় বীরেন্দ্রসিংহ অভিরামের অনুমতি … আশমানীদের অন্তঃপুরে থাকা … কর্তৃক ধৃত ও বন্দী হন। তারপর বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভের জন্য তিনি বিমলাকে বিবাহে রাজী হন এই শর্তে যে বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের পত্নীরূপে কী পরিচয় পাবেন না। এই বিমলা দাসী পরিচয়ে বীরেন্দ্রসিংহের গৃহে নিযুক্ত থেকে বহু অপমানে ছিলো। কাহিনীর সম্মুখে … বিমলার সঙ্গে বীরেন্দ্রের যোগাযোগ … । প্রথমে মানসিংহ কর্তৃক ধৃত ও বন্দী এবং অবশেষে বিমলার কারাবন্দীতায় ওসমান কর্তৃক ধৃত হয়ে কতলুখাঁর আদেশে নিহত হতে হলো। দ্বিতীয় খণ্ডে ওসমানের সহায়তায় তিলোত্তমা উদ্ধারে এমনকি জগৎসিংহের … সঙ্গে বিমলার … । কিন্তু তবেই পর্বে … অতিনাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে দুর্গেশনন্দিনী … প্রতিহিংসা … এ উপন্যাস … পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। পাঠকের এ সম্পর্কে … লেখক মনে … প্রশ্ন থেকে যায় যে, যে নারী শূদ্রকন্যা সম্পর্কে

পরন্তু একমাত্র বিবাহ ব্যাপারে নীতি-রীতির প্রশ্ন তোলে এবং বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য বিবাহ না করলেও যাকে আজীবন সামাজিকভাবে উপ-পত্নী করে রাখে, সেই পত্নী বা উপ-পত্নীর মনে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ কতটা পুষ্ট হতে পারে এবং প্রাণ সঞ্চয় করে তেমন সুস্থির হওয়ার প্রতিদান দেবার ইচ্ছা জাগতে পারে কিনা ? পরবর্তীকালে যিনি আদর্শ নারী চরিত্র হিসেবে প্রফুল্ল সৃষ্টি করলেন তাঁর মনে স্বভাবতঃ এ প্রশ্ন উঠেছিল । হিন্দু বিবাহের পবিত্রতা ও জন্মান্তরের বন্ধন এবং সর্বোপরি স্বামীকে অনুসরণের যে সাধনাবলে সতী সাবিত্রী হতে নায়িকাদের [illegible] তাদেরই [illegible] বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে নায়িকাদের যথাযথ ও সুস্থ চিত্র হয়ে রয়েছে । কেননা তাদের স্বামীর সম্পর্কে কথায় প্রতিফলিত চিরন্তন নিষ্ঠা [illegible] নায়িকাদের যথার্থ হয়ে রয়েছে । বিপরীত দিকে এই নিষ্ঠা [illegible] আদর্শ নিয়ে অনেক উপন্যাস লেখা হয়েছে । অধিকাংশ স্বামী [illegible] প্রতিশ্রুতি [illegible] উপন্যাসে প্রকাশ, বিবাহের [illegible] হওয়া [illegible] ও মৃত্যু হয়েছে । উপন্যাসে [illegible] অন্য [illegible] পরিবেশ হলে এক [illegible] আদর্শের [illegible] এবং [illegible] পূর্ব [illegible] উপন্যাসে [illegible] এই [illegible] । নায়িকাদের প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে এই [illegible] থাকলেও [illegible] একটু ভিন্ন [illegible] । [illegible] স্বামী পূর্ববর্তী জীবনে দু'বার দুটি নিরুপণীয় [illegible] [illegible] আনুগত্য [illegible] দু'জনের [illegible] সম্পর্ক [illegible], যার [illegible] দুই স্ত্রী । [illegible] ও [illegible] তাঁকে 'পরমহংস' [illegible] মতো [illegible] পূর্ববর্তী [illegible] দেখায় নি । পরবর্তীকালের

ঈশ্বরচন্দ্র [illegible] এই ব্যাপারে [illegible] দাবী অবশ্য পূরণ করেছেন ও কিন্তু তাঁর [illegible] [illegible] পরিচয় রয়েছে। [illegible] কথা [illegible] [illegible] হবে না যে, [illegible] [illegible] ঈশ্বরের [illegible] যখন তিনি সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] যে [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রভাব, কিন্তু [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] নি। অন্যদিকে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] নি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]

রাজপুত ও বীরভূম মধ্যে একত্রীকরণে তিনি হিন্দুর বাহুবল খুঁজেছেন হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখবেন, এই উপন্যাসের রাজপুত হিন্দু জগৎসিংহকে বীরেন্দ্রসিংহে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত ঐতিহাসিকের মতেও, কতলু খাঁর দুর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও অবিচলিত সাহস দেখাবে, এটাই স্বাভাবিক। এই মনোভাব না বিশ্বাস না থাকলে একত্রীকরণে শত্রু মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে উপন্যাসের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারতেন না। আসলে, এই উপন্যাসের রচনা সময়ে 'ঊনবিংশ শতকের সংস্কারশীল যুগে হিন্দুত্বের পুনরুত্থান আবির্ভাব' তারই চিহ্ন 'বীরেন্দ্রসিংহের মধ্যে এই নতুন জাতীয়তার প্রতিচ্ছবি দেখেছেন'[৩] তারা পরবর্তী সময়ে এমন ধারণা। তবে শিক্ষিত বিত্তবান, যাঁরা বিদ্রোহ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার বুদ্ধিজীবী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ পরিচয় থেকে দূরে থাকেন নি, তারা ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুদের শাসক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের একই সঙ্গে মুসলিম ও ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক জটিলতার আবির্ভাব দেখে সচেতন হয়ে আসতে হয়েছিল, তখন এমন একটি হিন্দুত্বের সমন্বয়ে প্রতিবাদী চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের সাম্প্রদায়িক চৈতন্যের আবির্ভাব থেকে উঠে আসা চরিত্র, যারা এই সময়ের ব্রাহ্মণ্য সংস্কারভিত্তিক রাজনীতিকে সমর্থন দিয়ে ও সমাজের জনগণের প্রয়োজনে, ইংরেজ প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে ব্রাহ্মণ্য বৈদিকের আচারনীতিকে মানিয়ে নেবার প্রয়োজনে, কিন্তু সংস্কার মাত্র চেয়েছিল, কোন মূলগত পরিবর্তনের দাবী ছিল না। তাই এখানে 'জীবনের যে আদর্শ নির্দিষ্ট বাধা ধরিয়া আসিয়া পৌঁছে গিয়াছে, প্রতিবাদ তাহার বিরুদ্ধে।'[৪] এমন সিদ্ধান্ত আলোচিত সিদ্ধান্ত বলেই মনে হয়। তবু উপন্যাসটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসটি রচনার আগে আমাদের ভূমিকা দরকার।

'হিন্দু' শব্দটি খুব প্রাচীন নয়। 'সংস্কৃত শব্দ নয় প্রাক-ইসলামীয় ভারতীয় গ্রন্থে শব্দটি পাওয়া যায় না।'[৫] পারস্য দেশবাসী আর্যভাষাভাষী জনগণের

সম্পর্কে প্রথম শব্দটি ব্যবহার করেন ও পরবর্তীকালে সেই একই অর্থে অন্যরাও এটি ব্যবহার করে। 'প্রাক-মুসলমান যুগের ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলি যে নিজেদের হিন্দু বা ঐক্যবদ্ধ ধর্মসম্প্রদায় বলে মনে করতেন না তার প্রচুর প্রমাণ প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক উপাদান থেকে পাওয়া যাবে।'[৪] যাই হোক, বৃটিশ শাসনের প্রথম দিক থেকেই হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজ ইত্যাদি সম্পর্কে একটা নতুন ধারণা দেখা দিল এবং এই ধারণা গড়ে উঠার ব্যাপারে বৃটিশ কূট কৌশল যথেষ্ট সাহায্য ও সহায়তা করলো। বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের মধ্য-বিত্তের হিন্দু শহুরে এই ধারণা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর মনে যথেষ্ট উৎসাহ জোগায়। তারই ফলে বৃটিশ লিখিত ও অন্যান্যদের ইতিহাসে ভারতীয় জাতি হিন্দুজাতি হয়ে দাঁড়াল, ভারতীয় জনগণ মানেই হিন্দু জনগণ আর মুসলমান শাসক বিদেশী শাসক, অতএব মুসলমানরা বিদেশী। আর এই সঙ্গে এই ধারণাও গড়ে দেওয়া হলো যে প্রাচীন ভারতই ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ, মুসলমান শাসনকাল থেকে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির পতন শুরু হয়। এরই সঙ্গে মুসলমান শাসনকালে হিন্দু জনসাধারণ অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েছে এবং তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি ঐ সময়ে আক্রান্ত ও বিপন্ন হয়েছে এই ধারণাও ক্রমশঃ হিন্দু জনসাধারণের মনে গেঁথে দেওয়া হতে থাকলো। অথচ আমরা একথাটা ভুলে যেলাম যে, যে কোন শাসকেরই মূল কথা হলো জনসাধারণের অতিরিক্ত উৎপাদন আত্মসাৎ করা, ধর্মপ্রচার বা প্রসার নয়, এবং এ ব্যাপারে হিন্দু বা মুসলমান শাসকের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। যেমন আলাওয়ায় বা

বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্র শুরু করার জন্য শুধু মুসলমান সম্রাটেরাই মন্দির ধ্বংস করে নি, হিন্দু রাজাও করেছে। মনে রাখা দরকার, এমন অবস্থা যদি সত্যই চলতো তবে অশিক্ষিত হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে মুসলিম জনসাধারণের বিরোধ সংঘর্ষের সংবাদ মধ্যযুগেও পাওয়া যেত। 'অষ্টাদশ শতকে মুঘল রাজশক্তি, শিখ ও জাঠ অভ্যুত্থান দেখা দিলো এবং মোগল রাষ্ট্রের মধ্যে মারাঠী ও শিখদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধলো, তখনো হিন্দু সামাজিক জীবনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। এমন কি, ঔরঙ্গজেবের তথাকথিত 'হিন্দুবিদ্বেষ' সত্ত্বেও হয়নি।'[৪] অথচ এর আগেই বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাল হিন্দু পুনরুত্থানের কাল, যখন মুসলিম শাসন জাতীয় পরাধীনতার নিম্নপর্যায়ের কারণ হিসেবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুর মনে বদ্ধমূল, তাদের লেখাতেও তা প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই অবস্থার প্রবক্তা হয়েই মুসলিম শাসক শাসকদের লোকজীবনকে কুৎসিত করে এঁকেছেন, তাঁদের আচারের কুৎসিত চিত্র এঁকেছেন, তুলনামূলকভাবে হিন্দু শাসকদের লোকজীবনকে অত্যন্ত মহান করে এঁকেছেন। একবারও তিনি মনে করতে পারেন নি যে মানুষের বাস্তবজীবনের প্যাটার্ন মূলত তার সামাজিক অবস্থান দ্বারাই নির্ধারিত হয় এবং মুসলিম সম্রাট ও নবাবদের বাস্তবজীবনের প্যাটার্নের মধ্যে সমকালীন হিন্দু রাজা জমিদারদের জীবনের প্যাটার্নে হেরফের বিশেষ করার মত বেশী একটা কারণ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোভাব থেকেই বীরেন্দ্রসিংহের সবরকম অনাচারের পরও তার পূর্বজীবন ও কাহিনীর বিপরীত ও

কদর্য্য পূর্বজীবন এঁকেছেন ; অথচ ইতিহাসে 'তাহার উৎকট হিন্দুয়ানি-র উল্লেখ নাই।'[৮] কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ ইত্যাদিতে এই চিত্রেরই সম্প্রসারণ মাত্র। নতুবা আয়েষার পিতাকে ওভাবে চিত্রিত করার কোন ঔপন্যাসিক প্রয়োজন ছিল না ; তিলোত্তমা সম্পর্কে জগৎসিংহের সংশয় ও অবিশ্বাস অন্য ভাবেও আনা যেত। পূর্বোক্ত মুসলমান বিরোধী মনোভাবের আরও প্রমাণ পাওয়া যায় বিমলা-দিগ্গজ-কথোপকথনে, এবং মুসলিম শাসনে হিন্দুধর্মের লোপের সম্ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শেষ উপন্যাস সীতারাম পর্যন্ত উল্লেখ বা প্রসঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

> গঙ্গারাম কহিলেন, 'যখন মোছলমানবাবুরা ধরে এলেন, তখন আমাকে কহিলেন যে, আয় বামন্ তোর জাতি মারিব। এই বলিয়া তাঁহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া মুরগীর পালো বাঁধিয়া খাওয়াইলেন।
>
> রাজপুত্র এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর সকলের কি হইয়াছে?'
>
> 'আর আর ব্রাহ্মণ অনেকেই ঐরূপ মোছলমান হইয়াছে' (পৃ. ১০৯)

এই বিবরণ ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়, কেননা ঐতিহাসিক বলেছেন : 'কিন্তু লক্ষণীয় হলো শুধুমাত্র সেইসব ব্যক্তিদেরই ধর্মান্তরের কথা উঠতো যাঁরা হয় বিদ্রোহ করেছেন অথবা রাষ্ট্রের বিরোধিতা বা অনুরূপ কাজ করেছেন। সেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলো তাঁদের ক্ষমা করা এবং তাঁদের গুরুত্বের কথা মনে রেখে তাঁদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট আনুগত্যের স্বীকৃতি আদায় করা।'[৯] এদিক থেকে বরঞ্চ মৃনালিনীর পশুপতিকে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রস্তাব ঐতিহাসিক ভাবে গ্রহণযোগ্য বলা যায়। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠবে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই বিশিষ্ট মনোভাব নিয়ে আয়েষা ও ওসমান চরিত্র সৃষ্টি করলেন কি করে এবং কেন?

গ্রন্থসূত্র

এই সুন্দর চরিত্র দুটিই কি পূর্বোক্ত ত্রুটির বিশেষ প্রমাণ নয়?

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা আয়েষাকে পাই, ওসমানকে আংশিক পেয়েছি, এখানেও পাচ্ছি। তারপর তিনটি পরিচ্ছেদ জুড়ে যুদ্ধে আহত অচেতন রাজপুত্র জগৎসিংহকে আয়েষা নিজের সেবায় সুস্থ করে তুললেন, ওসমান কায়মনে তাকেই সহায় হইলেন, সাহায্য করলেন। এই নিদারুণ অবস্থায় সেবা ও সৌন্দর্য আয়েষাকে ঔপন্যাসিক একটি বিশিষ্ট নারী চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। বিমলার দুশ্চরিত্রাতেও আমরা দেখি তুলনাহীন সেবাময়ী আয়েষাকে, বিমলার থেকেও তিলোত্তমা জীবন যায় যাক তবু শিল্প সম্পর্কে কোনরকম বিন্দুমাত্র আকাঙ্খাই তার মনে জাগে নি। রাজপুত চরিত্রের দুর্গটাই শুধু এ ব্যাপারে কোন সম্বন্ধ না থাকাই সম্ভব, কিন্তু সর্বাবস্থায় সুন্দর এই নবাবের আদর্শের কথা তিনি বর্ণনাতেও বলেছেন, রাজপুত চরিত্র তার সম্মান দুর্গশূন্য। কিন্তু ঔপন্যাসিক এই সময়ও এক বন্দী জগৎসিংহের সাহচর্যে আয়েষাকে আনলেন ও আমৃত্যু সর্বাবস্থায় প্রেমের এই পরিণতি অসম্ভব নাকি সমালোচকেরা অবিশ্বাস্য হিসেবে কল্পনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন: 'এরূপ চিত্র ঐতিহাসিক সম্মত নহে।'[১০] যে কারণে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাকে স্থান দিতে হয়েছে সেই একই কারণ থেকেই আয়েষা ও ওসমান চরিত্রের সৃষ্টি। এই অলৌকিক ও নৈতিকতার অভাবে জগৎসিংহকে কতলু খাঁর অন্তঃপুরে স্থাপন না করলে আয়েষার পরিচয় ও প্রণয়ের উদ্ভবই সম্ভব ছিল না; আর তাহলে বন্দী রাজপুত্রের সঙ্গে জগৎসিংহের ^ সঙ্গে রাজপুত্রী আয়েষার সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল না। এই সম্ভাবনা না ঘটলে আমরা যে 'বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' ও 'যত্ন ওসমান নয় জগৎসিংহ ....' এই দুটি উক্তির মূল্য-সন্ধান পেতাম না তাই নয়, জগৎসিংহকে লেখক যতটা বৃহৎ ও মহৎ করে চিত্রিত করতে চাইছেন তাও সম্ভব হতো না।

মনে রাখা দরকার, কতলু নিধনে 'কতলী তোমার প্রাণেশ্বর' বলার আগে পর্যন্ত ওসমানের সঙ্গে জগৎসিংহের সম্পর্ক দ্বন্দ্বপূর্ণ; কতলুনিধনের ঘটনার পরেই ওসমান জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই জগৎসিংহ আয়েষার মতো সুন্দরী মমতাময়ী ও মহীয়সী নারীর প্রেমের [illegible] পাওয়া সত্ত্বে বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিচয় দেবার সুযোগ পেয়েছে এবং এখানে আয়েষা যদি সাধারণ বা স্বল্পচারিত্র হতো তবে জগৎসিংহের পরীক্ষা কঠিন হতো না, আয়েষা সুন্দর ও আকর্ষণীয় বলেই জগৎসিংহের বলিষ্ঠতা প্রমাণ করেছে। অবশ্য আয়েষার অন্তরের সোনারাজে 'রাজপুত্রের মনে অন্ধকার ঘরে যেন কেহ প্রদীপ জ্বালিয়া দিল' সুতরাং তখন [illegible] সুস্থির [illegible] যে এই কঠিন পরীক্ষায় পাশ করবেন জন্য নতুন ? একবারে সুন্দরী নারীকে প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তি সাধুরই থাকে। বিশেষতঃ 'মনুষ্যকীর্ত্তি রক্ষা মুসলমানের পক্ষে গুরুতর দণ্ড হইবে।' এমন প্রশ্ন যখন উপন্যাসে ওঠে, তখন এ সংশয় থাকতেই পারে। ওসমানকে স্বাজাত্যপ্রীতির ঔজ্জ্বল্যের দ্বন্দ্বপূর্ণ একটি সুন্দর চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করার কারণেই, জগৎসিংহকে বিজয়ী করে তার যোগ্য পুরুষকে দীপ্ত করে তোলা। বিশ্বাসঘাতকের মতো চরিত্রকে পরাজিত করে হলো এই লেখক দেখার বস্তু ? বিশেষতঃ লেখক ঐতিহাসিক দিক থেকে পরাজিত কতলু খাঁকে বিজয়ী করার প্রয়োজন ছিল, মেবার-দুর্গ, শান্তিপুর, মান্দারণ, [illegible] সুতরাং জন্য এ প্রয়োজন ছিল। তবে উপন্যাসের দিক থেকে আয়েষার পূর্ব আয়োজন [illegible] [illegible] উপন্যাসোচিত নয় ও [illegible] আয়েষা চরিত্রকেও কিছুটা ম্লান করেছে মানতেই হবে আর ওসমানের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান একইভাবে ওসমানের চরিত্রের স্বাভাবিকতা নষ্ট করেছে। ওসমান চরিত্র এই ঘটনার পূর্বে 'দুর্গের প্রশস্ততা ও আশ্রিত ব্যক্তির যে পরীক্ষা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে

এইরূপ বর্বরতা শুধু যে অশোভন তাহা নহে, অবিশ্বাস্যও।'[১১] দ্বিতীয় খণ্ডে এসে মূল কাহিনীর দিক থেকে যে মূল সমস্যা দেখা দিয়েছিল - জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা বিমলার মুক্তি - বঙ্কিমচন্দ্র সে সমস্যার অতি নাটকীয় ও সহজ সমাধান করেছেন বিমলাকে দিয়ে অতিনাটকীয়ভাবে কতলু খাঁকে প্রমোদ ভবনে হত্যা করিয়ে; অন্যপক্ষে ওসমানের সাহায্য গ্রহণ করেছেন বটে তবে যে পূর্বঘটনাসূত্রে ওসমান সাহায্য করেছে তাও অস্বাভাবিক ও সুযোগ গ্রহণ বলে মনে হয়, ঘটনার অনিবার্যতায় সে কারণ আসেনি। ওসমান শৈশবে বালিকা বিমলার দ্বারা উপকৃত এই সূত্রে ওসমান বিমলাকে মুক্ত করার অভিলাষ জানান; বিমলা অবশ্য সে সুযোগ ভিন্নভাবে ব্যবহার করেছে। এই অতিনাটকীয় ও অবিশ্বাস্য ঘটনার মাধ্যমেই লেখক দ্রুত উপন্যাসের জট ছাড়িয়েছেন; মৃত্যুমুখী কতলু খাঁ জগৎসিংহকে মুক্তি দিয়ে শান্তি প্রার্থনা করেছে, তিলোত্তমা ও বিমলা শরণাপন্ন হয়ে মুক্তি লাভ করেছে, ইতিপূর্বে বিদ্যাদিগ্গজ কর্তৃক জগৎসিংহের মনে যে সংবাদের বিষ ঢুকে ছিল ও 'প্রতিমা বিসর্জন' - এই যে আতঙ্ক জগৎসিংহের জেগেছিল সে বিসর্জনকে বিসর্জন দিতে পারলেন কতলু খাঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে, অবশ্য আয়েষার অনুরোধে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, 'তার প্রেমী নারী শত্রুর হাতে [illegible] বন্দিনী এবং ধর্ষিতা, এই সংবাদে জগৎসিংহের যন্ত্রণা এবং এ অবস্থায় প্রেমের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে অর্ধ-পত্নীর সতীত্বের প্রশ্ন।'[১২] সামন্ততান্ত্রিক জীবনের প্যাটার্নে যে লেখক ফিরে যেতে চান তার পক্ষে, এবং তাঁর উপন্যাসের নায়কের পক্ষেও, সতীত্ব একটি বড়ো প্রশ্ন কেননা নারীর সামন্ত বন্ধনের দৃঢ়তম রজ্জু ঐ সতীত্বের ভাবনা ও বিশ্বাস। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমাদের থেকেই যায় যে কতলু খাঁ হত্যাকারীর নাম কেন

বললেন না, অথচ এতো কথা বললেন ? যে কথা শোনার পর আয়েষা বা ওসমানের কি প্রতিক্রিয়া হতো, গল্প কি ভিন্নমুখী হবার সম্ভাবনা ছিল ? কিন্তু অন্য সম্ভাবনা তো লেখকের কাম্য ছিল না, তাই কতলু খাঁ হয়তো হত্যাকারীর নাম মুখে আনে নি। এর পর মৃত্যু ও তারপরেই ওসমান-বিজয়ী রাজপুত্রের তিলোত্তমা বরণ করতে আর কোন অসুবিধা হয়নি। অসুবিধা হতে পারতো; কেননা তিলোত্তমাকে ইতিমধ্যে পুরুষ বর্জনের যে নানা অপবাদ জড়িয়ে গেছেন তাতে যে কোন আত্মসম্মান সচেতন মহিলার দিক থেকে এর পর মিলনের ব্যাপারে কিছু বাধা আসা অসম্ভব ছিল না, প্রত্যক্ষ অভিমান। কিন্তু তিলোত্তমা কিছুই করেন নি, তার না করে বোধহয় ভালই হয়েছে, কেননা আত্মসচেতন আত্মমর্যাদায় মুখর মহিলা তার স্রষ্টার সম্ভবত অপছন্দ ছিল না, যারা মুখর হয়েছে তারা কেউই সুখী হয় নি। তিলোত্তমা নীরব থেকেই প্রিয়জনকে লাভ করে সুখী হয়েছেন। তবে এ তিলোত্তমা নায়িকা বটে, লেখকের প্রতিশ্রুতি হিসেবে, কিন্তু চরিত্রটি সাবলীল মানুষী বা কিছু পায় নি। আর, এরই সঙ্গে, একথাও স্মরণযোগ্য যে, 'এই তরুণী ভারতীয় পাঠকদের কাছে অপরিচিত নয়। সীতা-শকুন্তলায় এরই কিছু রকমফের আমরা দেখেছি। .... নতুন যুগের নতুন সাহিত্যাদর্শের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি যে উপন্যাসে তার নায়িকার আসনে কিন্তু নতুন মানবীকে পাওয়া গেল না।'[৮০]

বঙ্কিম উপন্যাসের ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ আলোচনা করে আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করতে পারি। গড় মান্দারন শৈলেশ্বর মন্দির ও কতলু খাঁর প্রাসাদ - এই স্থবির চতুঃপার্শ্বের যে বিস্তৃত জনমানব বসতি ও সাধারণ মানুষ, যে সব মানুষের শ্রমের ফলভোগী হিসেবেই এইসব রাজাবাদশার জীবন যাপন, তাদের কাউকেই ঐ উপন্যাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে কৈবর্তের চলা ও উঁকিঝুঁকি দিতে দেখলাম না। কতলু খাঁর সেনার অত্যাচারের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু যাদের উপরে অত্যাচার তাদের জীবনযাত্রায়

এই অত্যাচার কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো, অত্যাচার বন্ধ করায় জগৎসিংহের প্রতিই বা তাদের কোন্ মনোভাব গড়ে উঠলো, পরন্তু তার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারতো, ইত্যাদি কোন কিছুরই হদিস আমরা পাই না। বস্তুত পটভূমি থেকে যেন মনে হয় এই সব রাজপুরী যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, জনারণ্য থেকে দূরে একক ও একাকী, বাইরের পৃথিবীর সংগে তার কোন সংযোগ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসেই প্রায়ই সাধারণ মানুষ অনুপস্থিত; ঘটনাক্রমে যদিও বা কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় তাও সে উল্লেখ সম্ভ্রমপূর্ণ নয়; বরঞ্চ প্রায়ই অপ্রয়োজনীয়ভাবে এইসব সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের চরিত্রে কর্তব্য নিষ্ঠা লোভ ইত্যাদি সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক কটাক্ষ করেছেন। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, সীতারাম এবং অন্যান্য প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই ঝি চাকরদের 'বাস্তবচিত্র' আঁকতে গিয়ে উপন্যাসের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঐসব চরিত্রে মানসিক দুর্বলতাগুলোই প্রদর্শিত করেছেন। আর্যসভ্যতার আলোকে আলোকিত 'বঙ্কিম আর্য' - এর এ মনোভাব বোধহয় অস্বাভাবিক নয়। আসমানী বা বিদ্যাদিগ্গজকে যদি আমরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে দেখি তাহলেও দেখবো এই দুটো চরিত্রকে দিয়ে উপন্যাসের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়ভাবে [illegible] ভাঁড়ামী করা হয়েছে। উপন্যাসের পক্ষে এই অংশ অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিস্তৃত এবং তারফলে উপন্যাসের গতিকেই ব্যাহত করেছে। বিদ্যাদিগ্গজের আহার, তার 'পালো' খেয়ে শেখদিগ্গজ হওয়া, দ্বিতীয় খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে জগৎসিংহের সম্মুখে দিগ্গজের মূর্চ্ছা গিয়ে ক্রন্দন ইত্যাদি স্পষ্টতই বঙ্কিমের সংবৃত্ত আভিজাত্যের প্রমাণ। যে মনোভাব থেকে বুচিরাম গুড় বা Brownsonism - এ জড়চাকবাদকের ছেলে 'জানডিকসন'-কে এঁকেছেন সেই একই মনোভাবের প্রকাশ দিগ্গজ চরিত্রে। অবশ্য দিগ্গজ চরিত্র সংস্কৃত সাহিত্যের একটি টাইপ চরিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের হাত দিয়ে

তার বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ, বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট মানস-প্রবণতার প্রমাণ হিসেবে। ইতিমধ্যে অনিবার্য পরিবর্তিত বাঙালী সমাজে ক্রমশ প্রাপ্ত বর্ণভেদের সংগে সংগে বিদ্যা-অর্থের বর্ণভেদ শুরু হয়েছিল, বলা বাহুল্য বিদ্যা-অর্থে অর্থকরী বিদ্যা; বিদ্যাদিগ্গজ এই অর্থকরী বিদ্যা থেকে বঞ্চিত ছিল। 'মুচিরাম গুড়'ও 'আনডিকমন' ও তাই। তারা অবশ্যই ব্যঙ্গের পাত্র।

২০

দুর্গেশনন্দিনীর মতো কপালকুণ্ডলা গল্পের পটভূমিকেও বঙ্কিমচন্দ্র অতীতকালে স্থাপন করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশে তিনি তাঁর কাহিনী বিস্তার করেছেন। গল্প শুরু থেকেই বোঝা যায় এ কাহিনী দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনী থেকে ভিন্ন প্রকৃতির, কাহিনী শুরুর পাত্রপাত্রীরা আমাদের একান্তই পরিচিত, বর্তমানকালের বাংলাদেশেও এরূপ চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। গল্পের শুরু শুরু এভাবে :

> প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। ... রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিক্ নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্দিকে কোথায় যাইতেছে তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। .... একজন প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্তা স্থগিত রাখিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মাঝি আজ কতদূর

যেতে পারবি ?' ব্যক্তি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল 'বলিতে পারিলাম না।' বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, 'মহাশয়, ... আপনি ব্যস্ত হইবেন না।'

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, 'ব্যস্ত হব না ? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘা ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কি ?'[১৪]

বোঝা যায়, প্রাত্যহিক পরিবেশ, সবই দুর্গেশনন্দিনী থেকে ভিন্ন। এমন কি, বৃদ্ধের উগ্র উত্তর ও উৎকণ্ঠার মধ্যে গত দেড়শো বছরের ভূমিস্বার্থকেন্দ্রিক বাঙালী মধ্যবিত্তের কণ্ঠস্বর যেন শোনা যায়। কিন্তু যে মুহূর্তের জন্য, একটি
মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র এই চিত্র তথা চরিত্রকে ব্যবহার করলেন; প্রথমখণ্ডের
পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনেই মাত্র ^ আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই তারা শুধু নবকুমারকে বিজন নদীতীরে ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হলেন তাই নয়, উপন্যাস থেকেই অন্তর্ধান করলো। বঙ্কিমচন্দ্র এক কুয়াশাপূর্ণ রাত্রি ও পরে আকস্মিক জোয়ারের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে নবকুমারকে কাপালিক কপালকুণ্ডলার সম্মুখীন করলেন।

প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের সাক্ষাৎ ঘটেছে। যে পরিবেশে ও অবস্থায় কপালকুণ্ডলা নবকুমার সাক্ষাৎ ঘটেছে তা থেকেই বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস শুরুর প্রাত্যহিকতা থেকে অনেকটা সরে এসেছেন, সমুদ্র-অরণ্যের রহস্যময়তার সঙ্গে নায়িকার রহস্যময়তাকে মিলিয়ে দিয়ে এক রহস্যময় বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসে কপালকুণ্ডলার প্রবেশ মাত্রই পাঠক শুরুর প্রাত্যহিক বাস্তবতা থেকে এক রহস্যময়তার দিকে সরে আসেন,

সমুদ্র-তরঙ্গের [redacted] রহস্যময়তার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার রহস্যময় আবির্ভাব সমুদ্র-তরঙ্গের রহস্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, সমুদ্র তরঙ্গের পটভূমি উপন্যাসে পটভূমিমাত্র - না থেকে চরিত্রের সঙ্গে মিলিত হয়। লেখক কপালকুণ্ডলাকে উপস্থিত করেছেন এভাবে:

> সেই গম্ভীরনাদি বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি! কেশভার - অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না - তথাপি মেঘাড়ম্বরমধ্যস্থ চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; .... কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ ...নবকুমার এর অপূর্ব কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'
>
> এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। ... সাগর রমণী পৃথিবী সুন্দরী, রমণী সুন্দরী, ধ্বনিও সুন্দর, হৃদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।[১৫]

তারপর অনিবার্যভাবে আমরা একটি প্রেমের কাহিনীর সম্মুখীন হলাম। কিন্তু প্রেমের কাহিনী বটে, তবে একটু ভিন্ন ধরনের, জগৎসিংহ - তিলোত্তমা - আয়েষার প্রেম কাহিনী থেকে আলাদা। শুধুমাত্র পরিবেশের ভিন্নতা কারণেই মাত্র নয়, এই

ভিন্নতার কারণ নায়িকা চরিত্রের বিশিষ্টতা, যা বঙ্কিমের অন্যান্য অনেক নায়িকা থেকেও চরিত্রে ভিন্ন ।

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিম উপন্যাসের একমাত্র নায়িকা যে মনুষ্য সমাজ বহির্ভূতভাবে বেড়ে উঠেছে এবং সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অজ্ঞ, সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র সেভাবেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন । পরিণাম স্বরূপে যদিও তাকে নবকুমারের বধূ হিসেবে সপ্তগ্রামে নবকুমারের বাড়ীতে আসতে হলো তবুও শেষ পর্যন্ত সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলো না, বিবাহ পূর্ববর্তী জীবনের সাহচর্যের প্রতীকরূপের অন্তরালে নারীই শেষ পর্যন্ত অপরাজিত নিয়তিশক্তি পরিসমাপ্তি ঘটে । যেমন, জনৈক সমালোচক বলেছেন : 'আজন্ম সাগরের বেলাভূমিতে নায়িকার প্রাকৃতিক বর্ণনা উপন্যাসটির বিষয়বস্তু ।'[১৩] প্রাসঙ্গিকভাবে এমন একটি ধারণা আমাদের হতে পারে । কিন্তু এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসবার আগে নায়িকা চরিত্রটির যথাযথ বিশ্লেষণ দরকার, তাই সামগ্রিক উপন্যাসের মূল বিষয় ও তার পরিণতি সম্পর্কে আমরা একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারবো । অতএব কপালকুণ্ডলা সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক প্রশ্নটি হলো : কপালকুণ্ডলা কি সামাজিক বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ ছিল যাকে 'বিবাহ কি' এমন প্রশ্ন এই ষোড়শী মেয়েটির করতে হয়েছিল, অথবা বুনোহাঁসের মতোই মেয়ে বিশুদ্ধ প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে বড় হওয়া মৃন্ময়ী? উপন্যাসের ১ম খণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ে অধিকারী নবকুমারকে কপালকুণ্ডলার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : 'শুনুন । ইনি ব্রাহ্মণ কন্যা । ইঁহার বৃত্তান্ত আমি কি বিশেষ অবগত আছি । ইনি বাল্যকালে পর্তুগীজ খ্রীষ্টিয়ান তস্কর দ্বারা অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন । ... কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধি মানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন ।'[১৭] সুতরাং পরিচয়হীন বালিকা ব্রাহ্মণকন্যা এ সময়ে অধিকারীর মুখ থেকেই জানা

জানা সম্ভব, আর তাহলে কপালকুণ্ডলা আত্মপরিচয় দেবার মতো বয়েসেই গ্রাম ও পুর থেকে অপসৃত হয়েছে এটা আমরা নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি। তাই [illegible] ষোড়শ শতাব্দীর এক ব্রাহ্মণ বাঙালী কন্যার পক্ষে এই বয়েসে বিবাহ সম্পর্কে সামান্যতম পূর্ব ধারণা নেই এটা কিভাবে স্বীকার করে নেওয়া যায়? বিশেষতঃ নিজের পিতামাতা ছাড়াও অন্যান্য বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের বৈবাহিক দেখা ও বিভিন্ন সম্পর্কে অবহিত থাকাটাই তো স্বাভাবিক। তারপর, দ্বিতীয় খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে শ্যামাসুন্দরীর সাথে আলাপনে যখন সে 'যদা নিযুক্ত যদি এতো জানতাম' বলে আপন মনোভাব ব্যক্ত করছে তখন অনুমান করা অনুচিত হবে না যে সে স্ত্রীস্বাধীনতার শিক্ষা পেয়েছে। অন্যান্য সম্পর্কে নারী পুরুষের সম্পর্ক সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে কি এভাবে আলোচনা সম্ভব? তাছাড়া, অধিকারীর কথা থেকে মনে হয়, তাঁর কাছে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষের সমাগম হতো, বিশেষ [illegible] তাঁর মন্দিরে নিত্য [illegible] ঠিক [illegible] সময় দেখাবার। তাই কপালকুণ্ডলার বিবাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য বলে হয় না, যেহেতু সে তার [illegible] ভুলিয়ে দিতে পারেনি। কিশোরের অনুভূতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ ঠিক এই কারণে বিশ্বাসযোগ্য নয়। অধিকারীর বিশ্লেষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন : কপালকুণ্ডলা কি তান্ত্রিক সাধনা ও তান্ত্রিক মতে বিশ্বাসী ও অনুরাগী ছিল? নবকুমারকে মুক্ত করার আকাঙ্খা পুরুষমাত্র অনুকম্পাজাত এমন মনে করার কারণ নেই। কেননা তান্ত্রিক সাধনায় বিশ্বাসী হলেও তান্ত্রিকজীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে তার পক্ষে দেবীর বলি বন্ধ করার কোন প্রশ্নই উঠতো না, ততক্ষণে আশংকায় সে নয় ছিল, কিন্তু তান্ত্রিক সাধনা ও জীবনে এই দীর্ঘ সংসর্গ সত্ত্বেও অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী না হবার জন্যই তার পক্ষে এই প্রাণীহত্যা নিরর্থক মনে হয়েছে, নবকুমারকে

যুক্ত করেছে সেজন্যই। অন্য ও, নবকুমারকে উদ্ধার করে অধিকারীর গৃহে আসার পর, এর প্রমাণ আছে :

অধি - আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না।

কপা - কেন ?

অধি - গেলে আর তোমার রক্ষা নাই।

কপা - তা ত জানি।

অধি - তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন ?

কপা - না গিয়া কোথায় যাইব ?[১৮]

'না গিয়া কোথায় যাইব' ঐ প্রশ্নের তেজরেই কাপালিক সম্বন্ধে নিরুপায়তা ফুটে উঠেছে, কোন আকর্ষণ এখানে ফোটে নি ; কাপালিক সম্পর্কে নেতিবাচক নিরুপায় অনিবার্যতা। নবকুমারের সঙ্গে যাত্রাকালে, অধিকারীর বিদায় গ্রহণের সময় 'পৃথিবীতে যে অত্র তাহার একমাত্র সুহৃদ, সে বিদায় হইতেছে' কপালকুণ্ডলার এই ভাবনা থেকেও কাপালিক সম্পর্কে তার ভাবনা বোঝা যায়। সুতরাং সমুদ্র পরিবেশ কাপালিক তান্ত্রিক ভাবনা ইত্যাদি কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর একটি গভীর, অনপনেয় প্রভাব অঙ্কিত[১৯] করেছে এই মন্তব্য সমর্থনযোগ্য মনে হয় না। কাজেই 'বোধ করি, সমুদ্রতীরে বনে বনে বেড়াইতে পারিলে সুখ জন্মে' শ্যামসুন্দরীকে কথিত কপালকুণ্ডলার এই বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণের কোন অনিবার্য কারন নেই, এর দ্বারা হয়তো সংসার জীবনের আকর্ষণহীনতা বোঝা যেতে পারে, হয়তো; আর তা যদি হয় তবে সেই আকর্ষণহীনতার কারন আমাদের অন্যত্র খুঁজতে হবে। বিশেষত 'বোধ হয়' শব্দ থেকে বোঝা যায় যে এ ব্যাপারে সেও ঠিক নিশ্চিত নয়।

কপালকুণ্ডলার জীবনের অনিবার্য ট্র্যাজেডি বর্ণনা উপন্যাসের মূল বিষয় হিসেবে ধরে নিলে, কপালকুণ্ডলা নামকরণ দিক থেকে লেখকের অভিপ্রায় ও তাই বলেই

মনে হয়, কাহিনিটির উপাখ্যানের প্রয়োজনীয়তার একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা আমাদের দেওয়া দরকার; কেননা উপন্যাসের কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন হিসেবে থাকে না বা থাকতে পারে না, সমস্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনাই অবশেষে একটি পরিপূর্ণ প্যাটার্নে রূপায়িত হয়ে ওঠে। কাহিনিটির উপাখ্যানে উপস্থিত দ্বিতীয় খন্ড [illegible]ভাবে, [illegible] যাবার পথে [illegible] যোগাযোগে [illegible] পাঠকের পুরো তৃতীয় খন্ড [illegible] কাহিনিটির উপাখ্যান বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং দেখা গেছে, [illegible] উপাখ্যান দীর্ঘকাল [illegible] একটি [illegible] উপন্যাসে একটি [illegible]কে [illegible] [illegible] পুরো সমস্ত অসামঞ্জস্যতাই [illegible] কাহিনিটির উপাখ্যান [illegible] ও [illegible] উপন্যাসের [illegible] কিন্তু এই [illegible] উপন্যাসে [illegible] পথ ও [illegible] নাম [illegible] পুরুষোত্তম [illegible] এবং [illegible] পুরে এসে কিন্তু [illegible] স্বামীকে [illegible] কাহিনিটির [illegible] জীবন [illegible]

হিন্দু কন্যার প্রচলিত জীবনের ছকের মধ্যেই ছিল, পরবর্তী সাবিবিবির অন্তর্জীবনার কোন রকম ইঙ্গিত লেখক তার তের বছরের জীবনে কোথাও দেন নি । হিন্দু নারীর নীতি ও সুনীতিবোধ সুখী মেয়ের প্যাটার্নের বাইরে একবার মাত্রই সে গিয়েছিল তার তের বছরে, নরকুমারের সাক্ষ্য জানা যায় : 'একদিন নরকুমার তাহার প্রণয়ী পত্নী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে পদাঘাতে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন । চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমনই তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়াছিল, এমনই ললাটে রেখা বিকাশ হইয়াছিল, এমনই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল' [২১] ইত্যাদি । দুশ্চর প্রাপ্তি চিত্তবর্ণনেও তাঙ্গ হয়ে নিজের মর্যাদা ঢাকা ও আত্ম রক্ষার করে ব্যক্তিত্ব পদ্মাবতী বর্তমান সাবিবিবির স্বাতন্ত্র্যবোধ রয়েছে এমন লেখক দেন নি । হিন্দু নারীর স্বাতন্ত্র্য নারীকে সাবিবিবির তাহলা সেভাবে ছিল যে এক মানবাধিকার বিশেষ । সেক্ষেত্রে তাদের কাছে তার পুরাণ প্রভাব ও পরস্তুতিপরা, দুপয়েক সেতিম তেমন বংশ্যপ, বিদ্রোহ বিজোয়ার অন্যটি সমাজের ব্যক্তিত্বে যে প্রধান উপাদান; এমন কি তার চারিত্রহীনতা তথা উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য সে নিজেই তাকে ডেকেছিল । ঔপন্যাসিক অবশ্য তার বাল্যের হিসাবে একটি বাক্য উল্লেখ করেছেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে বিদ্যা সম্বন্ধে তাহার মধুর শিক্ষা হইয়াছিল, ধর্ম সম্বন্ধে তাহার কিছুই হয় নাই ।' [২২] তবে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত অতি সাধারণ জীবন যাপন করার পর, এবং এই যুগের তৎকালীন এক বিবাহিত হিন্দু নারীর হিন্দু বিবাহের যাবতীয় সংস্কার মনে গেঁথে যাওয়াই স্বাভাবিক যেখানে, এ হঠাৎ ও দ্রুত এই পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ জাগা অসম্ভব নয় । কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরবর্তীকালের শিক্ষিত হিন্দু মানসিকতায় তাদেরকে ইসলামধর্মের আগমনের পরবর্তীকালে ভারতসংস্কৃতির প্রসঙ্গে ধারণা এতো অসম্ভব ন

হয়ে গিয়েছিল যে এই পরিবর্তন তাদের কাছে নিজ ধর্ম ধ্বংস করার বিষয়, মুক্ত-চিন্তের মতো, ব্যক্তিত্বচ্যুত। মুসলিম শাসনকালে হিন্দু ধর্মের নিপীড়ন অবস্থায় থাকা থেকেই নারীর উপরে প্রত্যক্ষই হিন্দুদের চাপ পড়ে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয় থাক এবং তার মুসলমান শাসন সংস্কৃতির চাপে হিন্দু সংস্কৃতির অবলুপ্ত এবং বিলুপ্তের আশঙ্কা ছিল; এই বিলুপ্ত থেকেই নারী সম্বন্ধে পশ্চাদমুখী মুসলমান নারীর অবরোধের অনুকরণে, আরো কঠোরভাবে হিন্দু জীবনে পরিবেশে পরিণত 'অবরোধ' প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের বস্তু। তাই বলতে বিষয়, রক্ষণশীলতা ও প্রতিষ্ঠিত বা পশ্চাদমুখী কোনটাই নয় হিন্দু নারীর জীবনের মুক্তির কথা ভেবেছে নাই, হিন্দু নারীর যে জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত তাঁরা প্রচার করেছেন তাকে বহন করেছে এই দুটি মতবাদের কোনটাই নয়, দুটি পক্ষেই প্রচলিত হিন্দু আদর্শের অনুমোদিত নারী জীবনের অনুকরণে প্রচার করেছেন, তবে দুইভাবে। রক্ষণশীলরা সনাতন জীবন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে নতুন যুগে [illegible] পশ্চাদমুখী সম্পর্কে দেখেছেন, আর প্রতিষ্ঠিত [illegible], তার আদর্শ [illegible] নারীর আদর্শে, বিদ্যাশিক্ষা [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible]। এ নারীর এই দুই জীবনই প্রচলিত হিন্দুসমাজের নারী জীবনের আদর্শে বিরোধী, ব্যক্তিত্বচ্যুত। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙালী হিন্দুর জাতীয়তায় ব্যক্তিত্বচ্যুত হিন্দুনারীর সনাতন জীবন ও বিবাহিত জীবনে সর্বপ্রকারে স্বাধীনতায় স্বাধীন সুখী করার 'সংসার' নামীয় ধর্ম নির্দেশ করেছিলেন, তবে তাঁরা পাতিব্রত্যের নারীকে সংসারে আবদ্ধ রেখে তিনি নবীন ভেবেছেন এবং দেখিয়েছেন যে এই জীবনের পাতিব্রত্যের বাইরে এক জানা সুখী হতে পারে না, সমাজের মূল্য হতে পারে না। দুঃখ, দুর্গ, কোকিলী, শৈবলিনী প্রভৃতি এরা সবাই এই পরীক্ষাতেই [illegible] এবং

এরা কেউই জীবনে সুখী হতে পারে নি, অন্যদেরও সুখী করতে পারে নি; বরঞ্চ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মানুষের জীবনে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা ডেকে এনেছে, সর্বনাশ করেছে নিজেদেরও। এইদিক থেকে দেখলেই আমরা মতিবিবির প্রসঙ্গের বিস্তারিত বিবরণের বিশেষত্ব প্রয়োজন খুঁজে পাবো। লেখক কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির জীবনের মধ্য দিয়ে প্রচলিত নারী জীবন প্যাটার্নের বাইরে অন্য, দু'রকম আদর্শ ও ভাবে, দুটি নারী জীবনকে রূপায়িত করে তার অসার্থকতা দেখাতে চেয়েছেন, তাঁর গল্পের থীম এটাই; আর তাহলেই মতিবিবি প্রসঙ্গের দীর্ঘ ও প্রলম্বিত বিবরণের বিশেষত্ব সার্থকতা পাওয়া যায়।

কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি দুজনেই প্রচলিত নারী জীবনের প্যাটার্নের বাইরে এসে নিজেদের জীবনকেও ব্যর্থ করেছে, নবকুমারের জীবনও। নবকুমারও অবশ্য এ উপন্যাসের এক অদ্ভুত নায়ক, পরিস্থিতির সে স্রোতে ভেসে চলেছে এবং অবশেষে নিরুদ্দেশ হয়েছে। নবকুমার যেমন বলেছেন 'বাঙালী প্রকৃতির নবকুমার, অবশ্য বাঙালীর নবকুমার নয়' ৩৩ নবকুমার সম্পর্কে আমাদের আপত্তিও শুধু এ, নবকুমার খাঁটি বাঙালী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভোগবাদী বাঙালী মধ্যবিত্তের সঙ্গে নবকুমারের প্রকৃতিগত মিল আছে। ইংরেজ শাসন শোষণে অস্তিত্ব বাঙালী মধ্যবিত্ত যেমন নিজস্ব সুখ শান্তির বাইরে বাকী দেশ, দেশবাসী সম্পর্কে মুখ ফিরিয়েছিল, তার উত্থান আন্দোলন নিজস্ব সুখের বাগানেই যাও, নবকুমারও তেমনি প্রকৃতি ও প্রিয় নারীর সহবাসের সুখে চতুঃপার্শ্বের সমস্ত কিছু থেকেই মুখ ফিরিয়ে ছিল, সে সুখে যখন বিঘ্ন বিচ্ছেদ ঘটিতে যাচ্ছে তখনই যাও সেও হাহাকার করে উঠেছে। অবশ্য নবকুমার এখানে মূলতঃ ট্রাজেডির কারণ নয়, ট্রাজেডির কারণ বিধিনিষিদ্ধ, 'বিধি-নিষিদ্ধ' জীবনের প্যাটার্ন থেকে সরে আসায় বিধির কোপে যে জীবন নষ্ট হবে এটাই তো স্বাভাবিক, বঙ্কিমচন্দ্রও সে পথই অবলম্বন করেছেন। তাই,

'নায়িকার জীবনে বিধিলিপি লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্তের চিত্র অঙ্কনই বঙ্কিমের কাছে প্রধান ছিল।'[১৪] আলোচকের এই মন্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয়। শ্যামাসুন্দরীর সংগে কথাবার্তায় কপালকুণ্ডলা বলছে :

> যেদিন স্ত্রীর সহিত যাত্রা করি, সেই প্রাতঃকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম করিতাম না। যদি কর্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল; ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না – অতএব কপালে কি আছে জানি না।[১৫]

মতিবিবির মনোভাবেও এই বিধিলিপির প্রভাবপড়েছে। পঞ্চদশবর্ষীকে যেমন বিনাপ্রশ্নে গৃহস্থকন্যা মতিবিবি ত্যাগ করেছেন কি একইভাবে দীর্ঘ যৌবন বছর ক পর মুহূর্তের অনাবিল রাত্রিতে নবকুমার রমণী হবার আকাঙ্ক্ষা, এমন কি শুধুমাত্র দাসী হিসেবে পায়ে স্থান পাবার কামনার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দিতে পারেন নি; পরিবর্তে তার এই আকস্মিক মনোভাবের পরিবর্তনকেও 'কপাল লিখন' হিসেবে দেখলেন। আগ্রার সম্রাজ্ঞী হওয়ার ঐশ্বর্য ছেড়ে যে হঠাৎ সপ্তগ্রামে নবকুমারের রমণী হবার আকাঙ্ক্ষায় পাড়ি দিচ্ছে এই সংবাদে পাঠকের মত বেগমের সেবিকা পেশমনও অবাক হয়েছিল :

> পে। ... আগ্রায় কি মানুষ নাই যে চুম্বকের দেশে যাইবে? এমন যিনি তোমাকে ভালোবাসেন, তাহাকেই কেন ভালোবাসো না? রূপে বল, ধনে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, সাহসে বল, দিল্লীর বাদশাহের বড় পৃথিবীতে কে আছে?

সু । আকাশে চন্দ্রসূর্য থাকিতে তুল জোনাকী কেন ?

শে । কেন ?

নু । ললাট লিখন । [২৬]

মানুষের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা সর্বপ্রকার সংগ্রামের সমস্ত ক্ষমতা সুযোগের পরেও যখন ঘটনার ~~[illegible]~~ নিশ্চিন্ত অনিবার্য পরম্পরায় মানুষ সর্বনাশের সম্মুখীন হয় তখন তার পরাজয়ের মধ্যেও সংগ্রামশীল শক্তিমান মানুষ সম্পর্কে আমরা সশ্রদ্ধ থাকি এবং এই বিরাট ও বিপুল বিশ্বের অজানা [illegible] নিয়মের সম্মুখে আমরা বিপুল বিস্ময়ে স্তব্ধ দাঁড়াই ; কিন্তু একই সঙ্গে এই বোধও আমাদের এসে যায় যে এই অজানাকে জানতে হবে, জয় করতে হবে ; এবং এভাবেই সাহিত্যে মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্ময় জাগে, মানুষকে মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করতে পারি । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এই 'নিয়তিবাদ' অনেক জায়গা জুড়েছে, তার থেকে পালিয়ে যেতেও নেই ; লেখকের মত অনুযায়ী ঐ নিয়তি প্রবল হয়, লেখক [illegible] কোন একটি বিষয়ের প্রমাণের মত । যেন বঙ্কিমের নিয়তি [illegible] চরিত্রগুলি ঘটনায় নিশ্চিন্ত অনিবার্যতায় দুঃখের মুখোমুখি হয় না, লেখক যেন তাদের ঠেলে দুঃখের মুখে পাঠান, তারাও দুঃখের মুখোমুখি হয়ে কোন সংগ্রাম করে না, দুঃখের মুখ থেকে বেরিয়ে আসার কোন প্রচেষ্টা নেই ; যেন এরেই হেতু এই জানের পূর্বনির্দিষ্ট পরিণতি ; তাদের 'ললাট লিপি' । এই প্রতিক্রিয়া প্রবল বিশ্বাসী লেখক উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন করে অদৃষ্টবাদ ও ভগবানের ঐতিহাসিক বাহক ছিল । আমাদের জাগতিক সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট অবিচারকে যদি আমরা বিধিলিপি বা ললাটলিপি হিসেবে মেনে নিয়ে অদৃষ্ট ঈশ্বরের দান হিসেবে দেখি তাহলে জাগতিক দুঃখের জাগতিক কারণ অনুসন্ধানের দায় থেকে মুক্তি, আর - যারা দুঃখভোগী তারাও যদি ~~[illegible]~~

সেভাবেই সেটাকে মেনে নেয় তবে আশঙ্কিত দুঃখের আশঙ্কিত বাধা সম্পর্কে তারা সচেতন থাকবে, বাধা সরাবার তাগাদাও থাকবে না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের বর্ণশাসিত সমাজের সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার, চরম দারিদ্র্য ইত্যাদিকে 'ললাট লিখন' হিসেবে দুঃখভোগীরা মেনে নিক, এ আকাঙ্ক্ষা উনবিংশ শতাব্দীর 'সমাজ বিপ্লবের অনুমোদক নহি' এই পৌরবাণীটি প্রত্যাশী বাঙালী মধ্যবিত্ত আত্মতুষ্টির প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল ইংরেজ শাসকেরও। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেকটি উপন্যাসেই পাপিষ্ঠা ও পাপিষ্ঠের শাস্তি থাকে, তারা উপন্যাসের চরিত্রদের পূর্ব নির্দিষ্ট ভাগ্যলিপি পড়ে ফেলেন, আর তারপর লেখক যেমনভাবে প্রত্যেক চরিত্রকে তাদের নির্দিষ্ট অনুগামী করেন। তাই তাঁর মতেই কাহিনীতে অনেক দোষ থাকে, চরিত্রের ট্র্যাজিক পরিণতি অনিবার্য বলে মনে হয় না, মনে হয় লেখক কিছু প্রমাণ করতে চাইছেন। কপালকুণ্ডলাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়।

বাল্যজীবনের আবাল্য, কাপালিকের দুষ্ট পরিবেশ থেকে এক সপ্তগ্রামের পুরবাসের নতুন পরিবেশে কপালকুণ্ডলার অস্বস্তি তা খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের কুমুদিনীও এমন অবস্থায় বধূজীবন ও পরিবেশকে অস্বীকার করেছিল। কপালকুণ্ডলাও যে ক্রমশঃ নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছিল তারও পরিচয় উপন্যাসে পাওয়া যায়। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে সমস্যা এলে তার ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা দু'জনের জীবনেই আসতো। কিন্তু এক বছরের বিবাহিত জীবনে কোন সমস্যা যে ঘটেনি তার প্রমাণ আমরা নবকুমারের প্রতিক্রিয়া থেকে পেতে পারি ✱:

> তাহার প্রকৃতি পর্যন্ত পরিবর্তিত হইতে লাগিল। যেখানে চপলতা ছিল, সেখানে গাম্ভীর্য জন্মিল, যেখানে অপ্রমাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল,

নরকে যাবেন খুব সর্বদাই প্রস্তুত । হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অন্য মানুষের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল; বিজাতের প্রতি বিদ্বেষের লাঘব হইল; মনুষ্য মাত্র প্রেমের পাত্র হইল; পৃথিবী সংসারটা তখন সুখী বোধ হইতে লাগিল; সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল ।[২৭]

অন্যদিকে, কলকাতাও ক্রমশঃ নতুন পরিবেশের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিলেন । এক সময় এক লেখক কলকাতার এই ছবি এঁকেছেন :

কলকাতা এক ইংরেজের অধিকারে নরকযাদের পৃথিবী । ... পশ্চিম দেশীয় সভ্যতার আনুষঙ্গিক কুৎসিত কুরুচিপূর্ণা যে কলিকাতা দেখিয়াছেন, এ সে কলকাতা নহে । আধুনিক সভ্যতার ... হইয়াছে; পাশ্চাত্যের স্পর্শে যোগিনী পৃথিবী হইয়াছেন, ... অথবা ... কুরুচিপূর্ণ ... অনুমোদিত কেবলমাত্র পরীপুরাণ সুদর্শনী ... হইয়াছে । ... এখন ... স্বর্গ হেন কর্ম দুর্গা মুনিরেছে, যে ... স্বর্গপুরীর পারাণ কলরে ... শত্রু ভেকের ন্যায় খেলা পাইতেছে ।[২৮]

এ ছবি সত্যিই আমাদের জানিয়ে দেয় কলকাতা ক্রমশঃ নতুন পরিবেশের মধ্যে মানিয়ে নিচ্ছে । এমন কি নবীন দ্বিজও প্রথম যা করার তেমনি আপনার পর্যন্ত কে ভুলেছে, মনে আছে এখন কোন প্রধান ঔপন্যাসিক দেন নি । আর এরকম অবস্থায় এসে আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি আরো একটা বছরে কলকাতা সাহেব-সুবোধ বাবাদিককে প্রলোভনে তুলে যাবে, আর সমস্ত বাঙালী মেয়েরা যেমনই

নতুন সংসারে মগ্ন হয়ে পুরোণো পরিবেশ মনে করার সময়ই পায় না। ঠিক এরকম অবস্থায় লেখক দুটি মানুষকে হাজির করলেন, কাপালিক ও আচিবিবি। উপন্যাসের প্রথমে দেখা কাপালিককে দেখে আমাদের একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগে হয়তো, একটা শক্তির প্রতীক মনে হয়। কিন্তু কাপালিকের বর্তমান অবস্থা আমাদের করুণাই উদ্রেক করে, দুর্বল, অসহায়, পঙ্গু, অন্ধ। আর লেখকের আচিবিবিকে একদা যে মেরিয়াকে পুষ্য করার জন্য উদ্যোগিনী ছিল, এখন নবকুমারকে। নবকুমারের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার ধারণা হয়েছে কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের জীবন থেকে বিতাড়িত করতে পারলেই সে নবকুমারকে পেতে পারে। কিন্তু কাপালিক ও ছদ্মবেশী আচিবিবি যখন একমত হতে পারলেন না তখন লেখক মঞ্চে আনলেন নবকুমারকে, কিন্তু সেখানে আনলেন না ব্রাহ্মণ। ছদ্মবেশী আচিবিবিকে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে দেখে কপালকুণ্ডলা সম্পর্কে যে সন্দেহ জাগে কপালকুণ্ডলাকে হত্যার প্রতিক্রিয়ার সাথে সাথী অনুভূতি সম্পর্কে প্রতিটিতে জাগা স্বাভাবিক ছিল পুরুষ হিসেবে, কিন্তু লেখক সে পথে গেলেন না। গেলেন না, তার কারণ, তাহলে আচিবিবির ছদ্মবেশ ধরা পড়বে এবং লেখকের প্রার্থিত সমাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটবে। লেখক তাই কৌশল প্রয়োগ করলেন এবং এখানেই না থেমে নবকুমারকে আবার মদিরা পান করিয়ে উত্তেজিত করতে হলো। এইভাবে লেখক চতুর্থখণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আকস্মিকভাবে কপালকুণ্ডলার মানসিক পরিবর্তন, আত্মজীবন বিসর্জনের আকাঙ্খা, ভৈরবী কালীমূর্তির আহ্বান। - এই পরিবর্তন এতো আকস্মিক এতো চমকপ্রদ যে উপন্যাসের পূর্বাপর সূত্রের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায়, চরিত্রের ক্রমবিবর্তনের যুক্তির

সব সিঁড়ি একসঙ্গে ভেঙে পড়ে ; দর্শকরা বুঝি যে কপালকুণ্ডলার স্রষ্টার হাত থেকে কপালকুণ্ডলার বাঁচা আর সম্ভব নয় । সমালোচকের ভাষায় : 'উপন্যাসের যৌন ঐশ্বর্য সৌন্দর্য শেষ দুই পরিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন ও অতিনাটকীয়তায় পর্যবসিত ।'[২৯] তাই 'নিয়তির দুর্জ্ঞেয় লীলা'[৩০] বা নবকুমার - কপালকুণ্ডলার পরিণতি থেকে 'যুগে যুগে মানব জন্ম সইতে শুধু আসিয়াছে, কেন এ নির্মম খেলা ?'[৩১] এমন যন্ত্রণার বেদনা - বিস্ময় বোধ ও শুধু পাঠকের মনে জাগে না । আর এভাবেই বঙ্কিম প্রচলিত - সমাজদর্শনের অনুমোদিত জীবনের প্যাটার্ন ভেঙে ফেলা দুই নারীর জীবনের ব্যর্থতা দেখিয়ে তাঁর অঙ্কুরেই প্রবণতার প্রমাণ করেন । স্টেবিলিটি প্রয়াসী বাঙালী মধ্যবিত্ত, সামাজিক স্টেবিলিটির জন্যই পুরোপুরি স্টেবিলিটির প্রত্যাশী ছিল । তাই, 'সম্পূর্ণভাবে দেখিতে গেলে মনে হয়, কপালকুণ্ডলা ঊনবিংশ শতকের নতুন সমাজ মানুষের এক সার্থক প্রতীক ।'[৩২] ড. অরবিন্দ পোদ্দারের এই মন্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয়, একটু সংকীর্ণ অর্থে অবশ্য ; ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন মানুষ বলতে এখানে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বুঝতে হবে, যে হিন্দু মধ্যবিত্ত দেশের বিপর্যস্ত পটভূমিকায় দেশপ্রেম ও পরগাছা শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠেছে ।

৩.

যে দেশপ্রেম বঙ্কিম উপন্যাসে ও অন্যান্য রচনায় বহু কথিত, পর্যালোচিত, দেশপ্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রকার মানবিক প্রেমের উপরে স্থান দিয়েছেন, সেই দেশপ্রেম মৃণালিনী উপন্যাসে প্রথম স্পষ্টভাবে স্থান করে নিল । তবে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুর বাহুবল প্রকাশে চন্দ্রগুপ্তকে গ্রহণ করে নি বা মুসলিম পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের

বহু খ্যাতনামা যোদ্ধাকে গ্রহণ করে নি, পরিবর্তে রাজাদিগের মত একজন ছোট জায়গীরদারকে গ্রহণ করেছে আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রাখা হয়েছে ঔরংজেবকে, বিকৃত [redacted] ভারত ইতিহাসে যাকে ভয়ানক হিন্দুবিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে একথা ভুলে গিয়ে যে শাসকে রাজনৈতিক স্বার্থে বরাবর সাম্প্রদায়িক লাগালাগির জন্যই, সর্বকালেই, শাসক তার শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখার প্রয়োজনে যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ব্যবহার করে, করবেও, বিশেষতঃ মধ্যযুগে, যখন ধর্ম মানুষের জীবনকে সর্বদিক থেকে নিয়ন্ত্রিত করতো। ঐতিহাসিকের জন্য ব্যাপক বিশ্লেষণে লাগে না। ধর্ম তখনও কখনও তার শাসন পাঁচিলের দ্বিধান মাত্র হতে পারে, স্বয়ং। হিন্দু পাঠকের কাছেই স্বাভাবিক যে, ঊনিশ শতকীয় হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী, ইংরেজের প্রলোভনা ও প্রশ্রয়ে গড়া এবং নিজ শ্রেণী স্বার্থেই মুসলমান বিরোধী হয়ে উঠেছিল। মুর্শিদাবাদ দরবারী হিন্দু অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ইংরেজের মুৎসুদ্দি মুসলিম যুগকে হিন্দুর নির্যাতন যুগ, পতিত অবস্থা হিন্দুত্বকালীন দুর্দশাকে মহানন্দের মুসলমান শাসনের হিন্দুর দুর্দশা — এভাবে চিত্রিত মুসলিম বিরোধী বাতাবরণ থেকে প্রসূত হয়েছিল। প্রাচ্যবাদী ইংরেজ লেখকরা পুরানো সংস্কৃত সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি থেকে প্রাচীন ভারতের এক গৌরবোজ্জ্বল চিত্রকে তুলে ধরেছিলেন এবং ঊনিশ শতকীয় হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর কাছে এই চিত্র সহজেই মনোরম লেগেছিল। এরই পরিণতি হিসেবে এই মধ্যবিত্তশ্রেণী বুদ্ধিজীবীর মধ্যে একটিও অনুমান করে নিলেন যে যে মুসলিম শাসন শুরু হবার পরে থেকেই ভারতবর্ষের এই গৌরবোজ্জ্বল দিন অস্তমিত হয়েছে। অতএব সিদ্ধান্ত এলেন যে মুসলিম শাসনের অবসান হলেই আর হিন্দু ভারতবর্ষ তার পূর্বগৌরব ফিরে পেতে পারে। এজন্যই আনন্দমঠ রচনার জন্য কোন বাঙালী এল না, এলো পশ্চিমের ব্রাহ্মণ মহেন্দ্র, আর তাকে নিয়ে এলেন এক ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী। যে দেখেছে ধর্মীয় দেশী লোক মুসলমান যে দেশ থেকে

'দেবতার শত্রু' মুসলমান বিতাড়নের এই আকাঙ্ক্ষার পরিণতি কি ভয়ঙ্কর হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরপুরুষ আজকের বাঙালীরা তা দেখেছি ও বুঝেছি; গোটা ভারতবর্ষই বুঝেছে। তাই মৃণালিনীকে 'সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন'[৩৩] কাহিনী বলা মানে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে গড়ে তোলা জীবনের বিশিষ্ট প্যাটার্নকেই অস্বীকার করার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যায়। কেননা মৃণালিনীতে গড়ে তোলা কাহিনী আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশভাবনা ও সমাজ-ভাবনারই স্বচ্ছ প্রকাশ মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোভাব অবশ্য তাঁর একক ব্যক্তির মনোভাব নয়, এ মনোভাব বঙ্কিম সমকালীন বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের মনোভাব। এজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র শুধু তাঁর শিক্ষিত আর্যহিন্দুদের মধ্যযুগীয় গৌরবে পুলকিত হয়েছেন, অর্থাৎ হিন্দু বাঙালী বা বাঙালী মুসলমানদের জাতি গঠন সম্পর্কে তাঁর যে পুরো একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, তার প্রকাশ থেকে এটা আমরা দেখিয়েছি। তাই আধুনিক অর্থে সুস্পষ্টভাবে বলতে যা বোঝায় তা যে বঙ্কিমচন্দ্র ভাবেন নি এটা আমাদের মনে রাখা দরকার। তাঁর সুস্পষ্টভাবে মুসলমান বর্জিত, হিন্দু বর্জিত। তার হিন্দু বর্ণ ব্রাহ্মণ ছাড়া কে হতে পারবে? সুশিক্ষিত হিন্দু মনীষীদের কাছে নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের, হিন্দুদের আবার বিশিষ্ট অংশ, যে শিক্ষিত সম্প্রদায় মুসলমানী বিশিষ্ট তারা এই বর্ণকেন্দ্র তাদের দিকে আরো একটু বেশী উৎসাহ পাবার কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'নবীন আর্য'-র উন্নতির কথাই ভেবেছিলেন তাই মৃণালিনীতে মাধবাচার্য দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়ান হিন্দু রাজাদের একত্রিত করার জন্য, 'দেবতার শত্রু' মুসলমানকে পরাজিত ও বিতাড়িত করার জন্য। হেমচন্দ্র - [illegible] মাধবাচার্যের সংলাপ থেকে এই সাম্প্রদায়িকতার রূপ পাওয়া যাবে:

(১) ব্রাহ্মণ কহিলেন, দিল্লীর সংবাদ আমি সকলই শুনিয়াছি। বখতিয়ার খিলজিকে হাতীতে বধিত, তবেই হইত, দেবতার শত্রু পশু সমস্ত নিপাত হইত। ৩৪

(২) মাধবাচার্য কহিলেন, ... তুমি সেকার্য না সাধিলে কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবন নিপাত তোমার একমাত্র ধ্যান, প্রাণ হওয়া উচিত। ৩৫

মুসলমানের অত্যাচার বর্ণনায় তো বটেই লেখকের মনোভাবের আভাস পাওয়া যাবে। বখতিয়ার খিলজি নবদ্বীপ জয় করল, কিন্তু রাতে নগরে মুসলমানরা বেরিয়ে পড়লো। লেখক অত্যাচার বর্ণনা দিয়েছেন:

> মুসলমান বিশৃঙ্খল হইয়া ব্রাহ্মণের মুণ্ডচ্ছেদন ভীষণ ভাব ধারণ করিতে লাগিল; ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরিকার অঙ্গের অলঙ্কার সমুদায় খুলিতে লাগিল। কি ব্যবহার শালগ্রামশিলা সকল যবন-পদাঘাতে গড়াইতে লাগিল। ৩৬

এই অবস্থা যে কোন ব্রাহ্মণের পক্ষে উদ্বিগ্ন, 'ধর্মপ্রাণ' হিন্দুর ক্রোধ ও ঘৃণা উদ্রেক করার পক্ষে যথেষ্ট। এই ক্রোধ ও ঘৃণা থেকেই আর্য ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য 'যবন নিপাতের' ব্রতে এগিয়ে এলেন। বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়ের কাহিনীকে 'বঙ্গীয় আর্যের' পক্ষে গ্লানিকর বিবেচনা করেছিলেন, সান্ত্বনা পেয়েছিলেন একথা প্রচার করে যে বাঙলায় তখন ব্রাহ্মণ বেশী ছিল না; লিখেছিলেন: 'সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে।'৩৭ দৃশ্যে নিয়ে এলেন আর এক আর্য হিন্দু হেমচন্দ্রকে, মগধের রাজপুত্র। উদ্দেশ্য যে মাধবাচার্য প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হিসেবেই

মাত্র উপস্থিত তবুও যে বৃদ্ধ হিন্দু রাজা তাকে পুত্র হিসেবে মানেন তার জন্য তর কোন বিশেষ কারণ লেখক উপন্যাসে দেন নি। 'দ্বাদশবর্ষ দেবারাধনা ত্যাগ করিয়া' তিনি হেমচন্দ্রকে 'সকল বিদ্যা শিক্ষা' করান যবন নিপাতের জন্য ; একমাত্র ধর্মবিদ্বেষ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে তিনি একাজ করেছেন এমন কোন প্রমাণ লেখক উপন্যাসে দেন নি। বরঞ্চ বখতিয়ার খিলজি সম্পর্কে হেমচন্দ্রের ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণ রয়েছে উপন্যাসে, বখতিয়ার খিলজি হেমচন্দ্রের পিতৃরাজ্য মগধ অধিকার করেছে। কিন্তু ঔপন্যাসিক তার উপন্যাসে এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে যথাযথভাবে চিত্রিত করতে পারেন নি, অথচ কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট একটা আলগা পর্দার মতোই লেগে আছে ; বিশেষতঃ হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর যে প্রেমকাহিনী তা অন্য কোন পটভূমিতেও গড়ে উঠতে পারতো। সেজন্য ঐ 'প্রসঙ্গে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট প্রথম দর্শনে প্রকাশিত নয়, আর ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব মূল বা গৌণ উভয় কাহিনীতে প্রায় শূন্য।'[১৩৮] অথবা 'হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর কাহিনীর সহিত ঐতিহাসিকের সংযোগসূত্র ক্ষীণ ও আকস্মিক।'[১৩৯] এই মন্তব্যকে যথার্থ বলেই মেনে নিতে হয়। হেমচন্দ্রকে লেখক যে যুদ্ধে নিয়োগ করলেন সে তার কতোটা যোগ্য হিসেবে গড়ে উঠেছে তা ভেবে দেখবার বিষয়। বখতিয়ার খিলজির মগধজয়ের সময়েও হেম তো মৃণালিনীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল আবার উপন্যাসের শেষ পর্বেও যখন বখতিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করেছে, নবদ্বীপবাসীর মৃতদেহে রাজপথ ভরা, একটু পিছনে, তখনও সে শুধুমাত্র মৃণালিনী-ভাবনাতেই আকুল। সুন্দরী নারী পুরুষের কর্মোদ্যোগে বাধাস্বরূপ এ ভাবনা মাধবাচার্যের, এবং এই ভাবনা থেকেই তিনি যবন বিজয় না হওয়া পর্যন্ত মৃণালিনীকে হেমচন্দ্রের চোখের বাইরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন আর মাধবাচার্যের এই ভাবনার

অংশীদার সম্ভবতঃ তার প্রণয়ীও, কেননা বঙ্কিমের বঙ্কিম-উপন্যাসের সুন্দরী নারীরা পুরুষের জীবনের যুক্তই শুধু ধ্বংস করেছে, তাদের জীবনে দুঃখ ডেকে এনেছে। সুদর্শনেশ্বর ভাবনায় তাই বোধহয় পরবর্তীকালে নারীকে দূরে রাখতে চেয়েছেন; আনন্দমঠের সন্তানদের সন্তানধর্মের একটি প্রধান শর্তই ছিল সম্পর্কিত নারী ত্যাগ, যতদিন পর্যন্ত না যুদ্ধ উদ্যাপিত হয়।

অন্যদিকে বিচারে এই উপন্যাসের মূল কাহিনী হেমচন্দ্র মৃণালিনীর প্রেম। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে যদিও বিবাহ পূর্ববর্তী প্রেমের চিত্র আছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ বালাশিক্ষার জন্য আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রেম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই হেমচন্দ্র মৃণালিনীর বিবাহ পর্ব সেরে রেখেছেন এবং আরও আশ্চর্যজনক, সর্বাধীক্ষিত পাত্রী নির্দিষ্ট হয়েছে। মাধবাচার্যের বিশেষ শাস্ত্রশিক্ষার জন্যই এদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলো; মাধবাচার্য মৃণালিনীকে পিতৃগৃহ থেকে হরণ করে মথুরাবাসী বিরাগী মাধবাচার্যের শিষ্য হৃষীকেশের বাড়িতে রেখে এলেন। হেমচন্দ্রের নবদ্বীপ যাত্রা এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা ও ভুল বোঝাবুঝির ফলে মৃণালিনীরও নবদ্বীপ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে হেমচন্দ্র ও মাধবাচার্যের নবদ্বীপে উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসের দ্বিতীয় কাহিনীর সঙ্গে আমরা পরিচিত হই - পশুপতি - মনোরমা সম্পর্ক। কিন্তু দুটির যে অনিবার্যভাবে মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী যুক্ত হয়ে ওঠে এখানে তা হয়নি; দুটিকাহিনীই দুটি বিচ্ছিন্ন ~~সহকারী অপ্রধান~~ কাহিনী হিসেবে উপন্যাসের ভেতরে থেকে গেছে। সমালোচকও বলেছেন: 'আখ্যায়িকা দুইটি পরস্পর পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত নহে। উহারা পাশাপাশি সন্নিবদ্ধ হইলেও সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত।'[৪০] কিন্তু এই উপকাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র দুটো কারণে ব্যবহার করেছেন। প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট

অশ্বারোহীর নবদ্বীপ জয়ের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য তিনি পশুপতির ষড়যন্ত্র দেখিয়েছেন এবং দুটি সূত্র, মনোরমাকে দিয়ে তিনি নিয়তির অনিবার্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতার কারণ হিসেবে তিনি বিধবা মনোরমার প্রতি তার প্রেম ও তাকে বিবাহ করার আকাঙ্ক্ষাকে উপস্থিত করেছেন। বখতিয়ার খিলজির সাহায্যে লক্ষ্মণসেনকে অপসারণ করে রাজা হতে পারলে বিধবা বিবাহে জনসাধারণ আপত্তি করার সাহস পাবে না - এজন্যই তার বিশ্বাসঘাতকতা। উপন্যাসে তাকে যে স্বার্থপ্র-প্রাণ হিসেবে দেখানো হয়েছে তাতে সে নিজেই লক্ষ্মণসেনকে সরাতে পারতো বলে মনে হয়। বখতিয়ারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র-এর কোন প্রয়োজন ছিল না। এ প্রশ্ন মিলতি-প্রতিবিধি অবলম্বন ব্রাহ্মণীর মনেও জেগেছিল :

> আপনি যদি প্রকৃত বৈষ্ণব, রাজা যদি এরূপ আপনার করতলগত তবে আমাদিগের সহিত আপনার কথাবার্তার আবশ্যক কি ? আমাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন কি ? আমাদিগকে ভয় দিতেছ কেন ?[৭১]

পশুপতির উত্তরও লক্ষ্য করার মতো :

> ......সেনরাজা আমার প্রভু ; বয়সে বৃদ্ধ, আমাকে স্নেহ করেন। যবনে আসিয়া যদি আমি তাঁহাকে রাজচ্যুত করি - তবে আমার লোকনিন্দা। আপনারা কিছুমাত্র যুদ্ধোদ্যম না করিয়া, আমার আনুকূল্যে বিনাযুদ্ধেই রাজধানী প্রবেশ পূর্বক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আমাকে তদুপরি স্থাপিত করিলে সে নিন্দা হইবে না।[৭২]

শুধুমাত্র লোকলজ্জার জন্য নিজে বলপ্রয়োগ না করে বাইরের শত্রুকে ডেকে এনে বল প্রয়োগ করানো, যেখানে রাজার বৃদ্ধত্ব এতই স্বাভাবিক, এই যুক্তির দুর্বলতা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে আসে নি। বিশেষতঃ রাজদ্রোহ প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে

রাজার বিরোধিতা বা নিন্দা সাধারণ্যাপবিত্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না । আর তার পরে চতুর্থ খণ্ডে যখন মনোরমার পরিচয় জানা গেল, পশুপতি জানলো যে মনোরমা তার পূর্ববিবাহিত পত্নী তার পতিত্বের অধিকারে মনোরমাকে সুখসঙ্গী করলো, তারপরে বিশ্বাসঘাতকতার কোন প্রয়োজন ছিল না । শুধু হতে পারে যে ইতিপূর্বে বখতিয়ার খিলজির সঙ্গে গোপন চুক্তি হয়ে গেছে, সে কথা পশুপতিও বলেছে ; কিন্তু যুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে প্রতারণা তো অতি সাধারণ রণনীতি, হিন্দু পুরাণেও তার সমর্থন আছে ; সে শত্রু কবলিত করার চেয়ে শত্রুবিরোধিতাই তো স্বাভাবিক ছিল । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তা করেন নি । বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় যখন ঐতিহাসিক ঘটনা, তিনি সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে পরিবর্তন করতে পারেন না ; অথচ যদি পশুপতি ও হেমচন্দ্র সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিদেশী যবনের সৈন্য দমন করতে পারেও দেশ পরাধীন হলো তাহলে পরাজিতই থাকতে হয় তবে 'বঙ্গীয় জাতীর দুর্ভাগ্য' সম্পূর্ণ হয়ে উঠে না । তাই বঙ্কিমচন্দ্র পশুপতিকে ষড়যন্ত্রকারে একটি চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং তার পরিণতির মধ্য দিয়ে মনোরমার পরিকল্পিত অনিবার্যতাও প্রদান করতে পেরেছেন ।

মনোরমা মৃণালিনী উপন্যাসের পক্ষে একটি অদ্ভুত চরিত্র । তার বয়স অনির্দিষ্ট, কখনো তাকে নিতান্ত একটি বালিকা মাত্র মনে হয় যে সংসারের কিছুই জানে না ('আমি কখনো তাই দেখি নাই ; তাইকে কি লজ্জা করিতে হয় ?' পৃ. ২০৮), আবার কখনো তাকে প্রৌঢ়বয়স্কা সংসারাভিজ্ঞা রমণী মনে হয় ('যে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে পারে, সেও প্রণয়কে সম্মুখে ধারণ করে' অথবা 'প্রণয় সুখাকাঙ্ক্ষী হইলে, সব পারে না শত্রু হয় - পতিগণের সাধ্য সর্বদা সহ প্রাণের সঙ্গ হয় - সংসারাশ্রম করিবে তীব্র দণ্ড' ইত্যাদি) ; পশুপতির সংসর্গে বা রাজনীতিতে বুদ্ধিতে বালিকা

মুমূর্ষু জ্ঞানী প্রৌঢ়া - এই চরিত্র উপন্যাসের পরে একটি স্বাভাবিক চরিত্র হয়ে উঠেনি । মনোরমার অতীতও রহস্যময় । তাঁর বাবা কেশব কাশীতে বসবাস কালে 'অর্থাভাবের জন্য' মনোরমার (তখনকার নাম হৈমবতী) আট বছর বয়সে পশুপতির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন এবং মেয়ে 'অল্প বয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে' জনৈক জ্যোতির্বিদের এই ভাগ্য গণনা ব্যর্থ করার জন্য বিবাহ রাত্রেই প্রয়াগে পলায়ন করেন কন্যাসহ । এর কিছুকাল পরে কেশবের মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুকালে তিনি কন্যা হৈমবতীকে তাঁর আত্মীয় জনার্দন শর্মার হাতে সমর্পণ করেন এই কথা বলে :

> 'ইহার স্বামী পশুপতি - কিন্তু জ্যোতির্বিদেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইনি অল্প বয়সে স্বামীর অনুমৃতা হইবেন । অতএব আপনি স্বীকার করুন যে এই মেয়েকে কখনো বলিবেন না যে, পশুপতি ইহার স্বামী । অথবা পশুপতিকে জানাইবেন না যে, ইনি তাঁহার স্ত্রী।'[৪৩]

কিন্তু মনোরমার এই ভাগ্য লিপির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করতে গিয়ে লেখক অনেকগুলো জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, পাঠকের মনে প্রশ্ন জিইয়ে রাখলেন; আর তারই সঙ্গে ঘটনার অনিবার্য পরম্পরায় মনোরমার পরিণতি আসে নি, তার পরিণতি ঘটিয়ে দেওয়া, লেখকের নিয়তি ধারণার প্রমাণ দেখাবার জন্য, কেন তিনি এমন করেন সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি । প্রথম প্রশ্ন, প্রয়াগ থেকে কেন ও কখন জনার্দন শর্মা নবদ্বীপে এলেন লেখক এ সম্পর্কে নীরব । দ্বিতীয় প্রশ্ন, তৎকালীন হিন্দু বিধান নিয়ে মনোরমার পক্ষে বিধবার পোশাকে থাকা বিধানযোগ্য কিনা ? তৃতীয় প্রশ্ন, হৈমবতী কখন ও কেন নাম পরিবর্তন করে মনোরমা হলো ? চতুর্থ প্রশ্ন, হৈমবতীর স্বামী পশুপতি ও ধর্মাধিকারিক পশুপতি একই ব্যক্তি, এ ধারণা জনার্দন ও

মনোরমার কিভাবে হলো ? পঞ্চম প্রশ্ন, পশুপতির সংগে কখন ও কিভাবে মনোরমার পরিচয় হলো, কেননা এই পরিচয় থেকেই পশুপতির হৈমবতী সম্পর্কে আকর্ষণ ও সেই আকর্ষণ থেকেই তার পরবর্তী জীবনধারা নির্ধারিত - বিশ্বাসঘাতকতা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। হৈমবতীকে বিধবা ও মনোরমা নামে পরিবর্তিত করার কৌশল অবলম্বন করে লেখক পাঠক ও পশুপতি দু-জনকেই প্রতারণা করেন এবং এই প্রতারণার ফলেই 'বিধবা' মনোরমাকে লাভ করার জন্য এ বাসনায় পশুপতি বখতিয়ার খিলজির সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ও তারই ফলে উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনাসমূহ ঘটিত থাকে এবং অবশেষে পশুপতিকে মৃত্যুবরণ করে জ্যোতির্বিদ কথিত মনোরমার অনুমৃতা হবার ঘটনা ঘটে। প্রকৃত মনোরমা যদি বিধবা বেশে না থাকতো তবে বিবাহিত নারীকে বিবাহের আকাঙ্ক্ষা পশুপতির চিন্তাই স্থান পেত না অথবা নারীকে মনোরমার নাম পরিবর্তন না করলে হয়তো অনেক আগেই পশুপতি তাকে চিনতে পারতো। কিন্তু সে রকম হলে লেখকের প্রার্থিত পরিণতি ঘটে না তাই লেখক এই নতুন কৌশল গ্রহণ করে মনোরমার জীবনে জ্যোতির্বিদের গণনাকে সফল করে তোলেন। ঘটনার অনিবার্যতায় সংগ্রথিত মানুষের ট্রাজিক পরিণতি এটা নয়, এটা পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের এক সরল ও সহজ রেখাচিত্র মাত্র। ট্রাজেডিবোধের অপপ্রতিষ্ঠা হেতু বঙ্কিম এই 'বিধিলিপি' শাসিত বাঙালী সমাজে নতুন করে বিধিলিপি প্রাধান্য আমদানী করলেন। আমাদের ভাগ্যলিপি যেহেতু পূর্বনির্ধারিত, অপরিবর্তনীয়, তাই পরিবর্তন প্রচেষ্টার প্রয়োজন কেন - এমন ভাবনা আমাদের মনে আশা অস্বাভাবিক নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্টেবিলিটি প্রয়াসী বাঙালী মধ্যবিত্তের স্টেবিলিটির জন্য এ ভাবনার প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজন ছিল - একথা আমরা পূর্বেই বলেছি, বঙ্কিম উপন্যাসে বারবার এই ভাবনা তথা ট্রাজেডির

রূপ ধরে দেখা দিয়েছে। মনোরমার অনুমৃতা হবার ঘটনা যে ভাষায় লেখক বর্ণনা করেছেন তা থেকে বিধবা বিবাহ বহু বিবাহের মতো সতীদাহ প্রথা সম্পর্কেও লেখকের পক্ষপাতিত্ব প্রাচীন প্রথার দিকে কিনা, এমন একটা প্রশ্ন ও সন্দেহ আমাদের মনে জাগতে পারে :

> শান্তিপূর্ণ আননে, মনোরমা প্রাতঃস্নান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন। নববস্ত্র পরিধান করিয়া, দিব্য পুষ্পমালা কণ্ঠে পরিয়া, পশুপতির প্রজ্বলিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক, তদুপরি আরোহণ করিলেন। এবং সহাস্য আননে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া, নিদাঘ সন্তপ্ত কুসুম কলিকার ন্যায় জ্বলনতাপে প্রাণত্যাগ করিলেন।[৪৪]

তার যাই হোক, এই বর্ণনা লেখকের মুক্ত অভিজ্ঞতার অনুভূতি নয়, এ বর্ণনা সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার, লেখকের বিশিষ্ট ধার্মিকতা ও প্রবণতার দ্যোতক। অন্য দিকে, ঘটনার বিপরীত সম্ভাবনা ও কাকতালীয়কে স্বীকার করেও লেখক পশুপতিকে বিদ্রোহী মুসলিম শাসকদের সংস্পৃষ্ট করে তার জন্য একটি প্রিয় প্রসঙ্গকে তুলে ধরেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের যে সাধারণ ধারণা গড়ে উঠেছিল, এ ধারণার বঙ্কিমচন্দ্রও অংশীদার, যে মুসলিম শাসকরা ছলেবলে কৌশলে হিন্দু জনসাধারণকে ধর্মান্তরিত করতো এবং এজন্য মুসলিম শাসনকালে হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি বিপন্ন হয়েছিল; ধর্মান্তর করনের ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা উপন্যাসদ্বয়ে উপন্যাসে দুদিকে ব্যবহার করেছেন। কৌশলে একই ঘটনা তৃতীয় উপন্যাস মৃণালিনীতেও ব্যবহার করা হয়েছে। বিদ্রোহী মুসলিম শাসক পশুপতিকে পূর্বে অনুরোধিত নতুন পর্ব হিসেবে রাজা হবার আগে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেনো। শৈজাসের

দিক থেকে পশুপতির প্রকল্পনায় থাকা মানুষকে এ ধরণের প্রস্তাব দেওয়া অসম্ভব নয় হয়ত, কেননা ক্ষমতাবান ও যোগ্য হিন্দুদের ধর্মত্যাগী বিদ্রোহহীন আনুগত্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় মুসলিম শাসকরা এমন প্রস্তাব করেছেন, যদিও শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারের জন্য ধর্মান্তরের ঘটনাও প্রচুর। বিশ্বাসঘাতক পশুপতিকে ধর্মান্তরিত করলে পুত্রের সমাজবন্ধন ও আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিই তার নির্ভরশীলতা বাড়বে, এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধর্মান্তর করা হয়েছে এবং পশুপতির ধর্মান্তর গ্রহণের প্রস্তাবও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপস্থিত করেন :

> ধর্ম - ...... আজ হইতে আপনি বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি হইলেন। কিন্তু যবন সম্রাটের সংকল্প এই যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী না হইলে কেহ তাঁহার রাজকার্যে সংলিপ্ত হইতে পারিবে না। ... কেননা, এমন কখনও হইবে না যে, মুসলমানেরা বাঙ্গলা হস্তচ্যুত করিয়াই আবার হিন্দুকে রাজ্য দিবে।
>
> পশু - (সদর্পে) আমি স্থির সংকল্প করিয়াছি যে, যবন সম্রাটের সাম্রাজ্যের জন্যও সনাতন ধর্ম ত্যাগ করিয়া নরকগামী হইব না।
>
> ধর্ম - ইহা আপনার ভ্রম। আমাকে সনাতন ধর্ম বলিতেছেন, সে ভূতের পূজা মাত্র। কোরাণ উক্ত ধর্মই সত্য ধর্ম। অতএব ত্যজিয়া ইহকাল পরকালের মঙ্গল সাধন করুন।[৪০]

বখতিয়ার খিলজির উপরোক্ত সংলাপ কোন রাজনীতিজ্ঞ বা সেনাপতির নয়, ধর্ম প্রচারকের। কিন্তু ইতিহাসে হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী বলে কথিত ঔরঙ্গজেবও ধর্মকে, ইসলাম ধর্ম প্রচার বিস্তারকে, সিংহাসন লাভের জন্যই ব্যবহার করেছে আমরা জানি, ধর্ম

প্রচারের জন্য নয়; আর ভারত ইতিহাসের দীর্ঘপর্ব জুড়ে মুসলমান শাসকেরা নিজেরাও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। ধর্মরক্ষা বা প্রচারই মুসলিম শাসনের লক্ষ্য হলে মুসলিম শাসকরা পরস্পরের সঙ্গে তিক্ত এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতো না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি পর্বে হিন্দু ও মুসলিম শাসকের সংঘর্ষের ধর্মীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে, মুসলিম শাসকদের পারস্পরিক সংঘর্ষকে এই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে বিচার ও ব্যাখ্যা সম্ভব? উভয় সংঘর্ষই রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিকোণেই একইভাবে দুটি সংঘর্ষেরই ব্যাখ্যা করতে সক্ষম বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীজাত; যেন মুসলিম ধর্মের প্রচারই এই বিগ্রহের মূল কারণ। পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাসে বিনা প্রতিবাদে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ইতিহাস থাকলেও এখানে পশুপতিই ধর্মান্তর গ্রহণে আপত্তি করলো। পশুপতির স্বভাবের ধর্মান্ধতা শক্তিভক্ত ব্রাহ্মণ অনেকবার লোভে বখতিয়ারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেও কাজের লোকে 'সনাতন হিন্দুধর্ম' ত্যাগ করে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য ও আকর্ষণ খেটো করবে, এটা হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র চান নি; কেননা তিনি জানেন যে ইসলাম ধর্ম 'বহুকটা অনার্য'-কে মাত্র প্রলোভিত করেছে, আর্য হিন্দুদের প্রলোভিত করতে পারে নি। পশুপতি তাই শেষ পর্যন্ত বলেছে: 'আমি এক্ষণে মৃত্যু স্থির করিয়াছি। প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি — কিন্তু যবন ধর্ম অবলম্বন করিব না।'[৪৬] ঊনবিংশ শতাব্দীর 'বঙ্গীয় আর্য'-র পূর্ব পুরুষ পশুপতি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট এই একটা ব্যাপারে নিশ্চয়ই সাধুবাদ লাভ করেছে।

মৃণালিনীর রূপে ঠিক গিরিজায়ার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই ধরণের নারীরা বঙ্কিমের সামাজিক আদর্শে নারীজীবনের পরিধির বাইরে কখনোই যায় না। এজন্য

পরিণামে এই ধরণের চরিত্র লেখকের আশীর্বাদ লাভ করে। কেননা, 'এই চরিত্রটিতে বঙ্কিম সর্ব অবস্থাতেই স্বামীর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা - হিন্দু নারীর এই আদর্শকে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন।'[৪৭] মৃণালিনী চরিত্রপরিচয়ের প্রথম পর্বেই হেমচন্দ্রকে বিয়ে করে ফেলে আর তাই তাদের পরবর্তী মেলামেশায় সামাজিক আপত্তির কোন কারণ ঘটে না। মাধবাচার্যের কৌশলে সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় বটে কিন্তু তা-ও হেমচন্দ্রের আকুতি মেনে নয় এবং প্রথম খণ্ডের শেষদিকে সে মথুরাবাসী থেকে নবদ্বীপে আশ্রয় করে স্বামী-দর্শনে এবং তৃতীয় খণ্ডে স্বামী কর্তৃক সন্দেহবশে পরিত্যক্ত হয়েও সে কোন রকম ক্ষোভ, দুঃখ বা [illegible] অভিযোগ করে না, বরঞ্চ সখী গিরিজায়া হেমচন্দ্রের সমালোচনা করলে সে তাকে তীব্রভাবে তিরস্কারই করে। আবার চতুর্থখণ্ডে যখন হেমচন্দ্র তাকে পুনরায় গ্রহণ করে, তখনও সে বিনা প্রতিবাদে তাকে গ্রহণ করে সুখী হয়। ঔপন্যাসিক তাই বলেছেন: 'বিরহবিধুরা, নির্দোষা মৃণালিনী আবার তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইয়া স্বর্গসুখ লাভ করিলেন।'[৪৮] গিরিজায়া ও দিগ্বিজয় [illegible] এই দুটি চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক প্যাটার্নে সংশ্লিষ্ট যারা পরবর্তীকালে রাজসিংহে, নির্মলকুমারী ও মানিকলাল এ মূর্ত রূপায়িত হবে এবং [illegible] [illegible] আধুনিক সংস্করণ হিসেবে চিত্রিত হবে। ধর্মতত্ত্বে যে প্রবৃত্তির অনুশীলন করেছেন এই চরিত্ররা সেই প্রবৃত্তির সার্থক সচল উদাহরণ।

কিন্তু মূল ও শাখা কাহিনীকে একটি অখণ্ড যোগসূত্রে লেখক গ্রন্থিত করতে পারেন নি। হেমচন্দ্র-মৃণালিনী ও পশুপতি-মনোরমা কাহিনী পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে গড়ে ও স্বতন্ত্র বেড়ে উঠেছে, ঘটনা পারম্পর্যে পরস্পরকে কোনভাবেই প্রভাবিত করতে পারে নি; কাহিনী দুটিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি আলাদা কাহিনী হিসেবে

মুখ্য অংশ বিবেচনা করা চলে। তাছাড়া, উপন্যাসের প্রথমে মৃণালিনীকে জনা ও সরিয়ে দিয়ে যে যবন প্রতিরোধের বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, উপন্যাসের অগ্রগতির সংগে সংগে সে বিষয় পেছনে সরে গিয়ে হেমচন্দ্র মৃণালিনীর কাহিনীই প্রধান হয়ে ওঠে এবং এমনকি পশুপতি মনোরমা উপাখ্যানে ও পশুপতির রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হলেও সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-উত্তর আভাস মাত্র দিয়ে মনোরমা কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করেছে। অনেক সময়ের পাঠক উপন্যাসের গুরুত্বে বিষয় সম্পর্কে যে ধারণা করেন উপন্যাসের অন্তর্নিহিত দুটি বিচ্ছিন্ন প্রেমকাহিনী ও তার পরিণামে এক বার যেভাবে নবদ্বীপের রাজ-শক্তির পটভূমিকায় হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে, ঐ পশুপতি ও মাধবাচার্যের কোন প্রতিক্রিয়া তাদের চরিত্রে পড়েনি তখন উপন্যাসের গুরুত্বে নবদ্বীপ অধিকারের আয়োজনের অনৈতিহাসিক নিষ্ফলতা তাকা প্রশ্নবিদ্ধ। পাঠকের এটুকু বোধ জাগে যে লেখক যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কথা শুরু করে-ছিলেন সে পটকে যথাযথভাবে কাহিনীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, ঐ পটভূমি শুধুই আলগাভাবে কাহিনীর সঙ্গে যোগ রয়েছে মাত্র। কিন্তু মোহিতলাল 'বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক নিজস্ব কল্পনার রসে নতুনভাবে সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ঔপন্যাসিক জনজীবন চেতনা গোপনে তাঁহার সুপ্ত জাতীয়তা জাগিয়ে দিবার সুযোগও করিয়াছিল।'[৬১] কাহিনীর পরিণতি সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত যথার্থ সত্যকে প্রকাশ করে না। বরঞ্চ, ইংরেজ শাসনকে মাথার উপরে রেখে যে স্বাতন্ত্র্য ব্রাহ্মণ্য জীবনের পারিপাট্যকে তিনি ধর্মতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রবন্ধে সমর্থন করেছেন সেই জীবনের পারিপাট্যকে তুলে ধরতে গিয়েই তাঁর কাহিনীর ঐ রকম পরিণতি ঘটেছে। কিন্তু সেখানেও, স্বাতন্ত্র্য ব্রাহ্মণ্য জীবনের পারিপাট্য গড়ে তোলার সংগে সংগেই মাধবাচার্য-হেমচন্দ্র-পশুপতির বা তাঁদের কাহিনীর মধ্য দিয়েই মুসলিম শাসনের অস্থিরতা প্রদর্শন করে ইংরেজ

শাসনের প্রত্যশোপা তাও প্রমাণ করতে চেয়েছেন তিনি এবং এদিক থেকে দেখলে উপন্যাসের পরিণতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার 'বিপর্যস্ত' বা 'আশাবাদকে তুচ্ছ এবং সংকল্পকে ক্ষীণ করিতে বাধ্য হইয়াছে'[৫০] বলার কোন কারন নেই। এই সংবৃত্ত প্রতিজ্ঞা তথা পূর্বনির্দিষ্ট মূল্যবোধ থেকে তিনি কখনো সরে আসতে পারেন নি বলেই অবশ্য প্লটের বিচ্ছিন্নতা তথা অসংবৃত সংহতির অভাব ঘটেছে।

৪.

বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসেই রূপবতী নারী ও রূপমুগ্ধ আবেগপ্রবণ পুরুষের রূপমুগ্ধতার প্রচলিত সামাজিক প্যাটার্নকে ভেঙে ফেলা ও তার পরিণতিতে নারী ও পুরুষ উভয়েরই দুঃখ ভোগ তথা প্রবৃত্তি তত্ত্বের পালাই পরস্পর পরিচিত প্যাটার্ন; বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল এই দুটি উপন্যাসেও এই পরিচিত প্যাটার্নকেই তিনি উপস্থিত করেছেন। কিন্তু অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে এই দুটি উপন্যাসের পার্থক্য এখানেই যে, অন্যত্র তিনি প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীনকালের পটভূমিকাই কাহিনীকে স্থাপন করেছেন, আর 'বিষবৃক্ষেই প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র সমকালের, সমসাময়িক সমাজকে স্পর্শ করলেন।' এবং 'বিষবৃক্ষ পর্যায়ের দ্বিতীয় সৃষ্টি কৃষ্ণকান্তের উইল।'[৫১] দুটি উপন্যাসের নায়কই উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যাসাগরের সমকালীন মানুষ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে নবোদ্ভূত ভূস্বামী শ্রেণীর প্রতিনিধি। বিষবৃক্ষের শুরুতে নায়ক নগেন্দ্রনাথের বাংলাদেশের গ্রামপথ ছুঁয়ে ছুঁয়ে নৌকাযাত্রার রূপে সঙ্গে লেখক পাঠককে গ্রামবাংলার মাঝে নিয়ে এলেন:

জলের ধারে তীরে তীরে থাকে থাকে রাখালেরা ধেনু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুট্টা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের গৃহিণীরা কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাক ছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। .... কোন কোন পুকুরের ঘাটে রূপসী রমণীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বকুনি করিতেছেন - মধ্যবয়স্কা শিবপূজা করিতেছেন - যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন .. .. ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালো মানুষের মত আসনে বসে শিব গড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকাশনিরীক্ষণচ্ছলে কোন যুবতীর প্রতি অনর্থক চাহিয়া লইতেছেন। ৩২

অন্য দিকে কৃষ্ণকান্তের উইলেও তিনি শুরু করলেন উনবিংশ শতাব্দীর মুৎসুদ্দিভুক্ত বাঙালী উচ্চবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠার ইতিহাস দিয়ে, শেষ শুরু করলেন উনবিংশ শতাব্দীর নতুন গড়ে ওঠা শ্রেণীর ইতিহাস দিয়ে, ইংরেজ শাসন ও শোষণ যাদের ভিত্তি ও বিস্তার:

হরিদ্রা গ্রামে একঘর বড় জমিদার ছিলেন। জমিদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়, কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী; তাঁহার জমিদারির মুনাফা প্রায় দুইলক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া ধনোপার্জন

> করেন। ... জমিদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। ... রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল - তাহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি, রামকান্ত রায়ের মনে মনে সংকল্প হইল যে, উভয়ের উপার্জিত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের অর্থাধিকার জন্য বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়া কর্তব্য। কেননা, যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে, কৃষ্ণকান্ত কখনও প্রবঞ্চনা অথবা তাহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার সম্ভাবনা নাই, তথাপি কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে তাহার নিশ্চয়তা কি? [৩৩]

দুটি উপন্যাসের শুরু পাঠকের মনে এ আশা জাগাতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্র অতীত থেকে বর্তমানে এসে দাঁড়ালেন। বিষবৃক্ষের আরম্ভের কৃষকের গরু খোয়ানো, কৃষক বাড়ীর [illegible] বর্ণনা [illegible] বাদুড় [illegible], দুই [illegible] মধুমতী পৌঁছিবার পথ এবং শেষ দিকে নদুপাড়ার ঘাটে ঘাটে আলো করা পুরসুন্দরীর শিবপূজার সংগে নিরীহ ব্রাহ্মণের প্রসাদে নিমগ্ন যুবতী দর্শনের চিত্রের মধ্যে জমিদার নগেন্দ্র দত্তকে স্থাপন করবেন, বিরোধী চিত্র ও চরিত্রের বাস্তব টানাপোড়েনে নায়ক নগেন্দ্র নাথ দত্তের চরিত্র গড়ে উঠবে এবং তার সংগে সংগেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশও সচল ও সজীব হয়ে বিশ্বস্ত পটভূমিতে একটি সার্থক সামাজিক উপন্যাস গড়ে উঠবে। অন্য দিকে, কৃষ্ণকান্তের উইলের শুরু থেকেও পাঠকের এ আশা অস্বাভাবিক নয় যে কৃষ্ণকান্ত ও রামকান্তের স্বোপার্জিত প্রায় দুলক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী পত্তনের ইতিহাসের ইতিহাস ও উইল বিভ্রাটের কথা দিয়ে একভাবে উনবিংশ শতাব্দীর ভূ-স্বামী শ্রেণীর উত্থান ও পতন তথা একান্নবর্তী পরিবারের কুল-ভাঙনের

মধ্য দিয়ে উপন্যাসের চরিত্রসমূহ রূপায়িত হবে এবং বাংলা ও বাঙালী সমাজের একটি বৃহত্তর রূপের সংগে আমাদের পরিচয় ঘটবে। কিন্তু কপালকুণ্ডলার শুরুর বাস্তবতা যেমন চিত্রপট মাত্র, মুহূর্তের মধ্যেই লেখক নিজস্ব শিল্প বিশ্বাসকে রূপায়িত করার জন্য পশ্চাৎকে অন্যত্র সরিয়ে নেন, এদুটি উপন্যাসের শুরুর বাস্তবতা চরিত্রের জন্য পাঠকের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করেই লেখকের প্রার্থিত জগতে প্রবেশ করে; আমরা বুঝি যে কপালকুণ্ডলার মতো এদুটি উপন্যাসের শুরুর-বাস্তবতা ও পটচিত্র মাত্র, স্বপ্নের আবরণ; তার বেশী কিছু নয়। লেখকের দুটি মন্তব্য থেকেও এ কথা প্রমাণিত হবে।

(১) যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে।[৫৪]

(২) সুমতি নামে দেবকন্যা, এবং কুমতি নামে রাক্ষসী, এই দুইজন সর্বদা মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে, এবং সর্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। ... আজি এই বিজন পথপার্শ্বে রোহিণীকে লইয়া সেই দুইজনে সেইরূপ ঘোর বিবাদ অতি ভীষণ উপস্থিত করিয়াছিল।[৫৫]

বিষবৃক্ষে তিনি রিপুর প্রাবল্যে যে বিষবৃক্ষের বীজ সৃষ্টি হয় তা 'ঘটনাধীনে' কিভাবে মানুষের জীবনে বিষময় ফলাফল নিয়ে আসে তারই 'ব্যাখ্যানে' প্রবৃত্ত, কৃষ্ণকান্তের উইলও তাই, রিপুর প্রাবল্যের [illegible] ফলাফল; সুমতি কুমতির লড়াইয়ে সুমতি হেরে গেলে তার বিষময় ফলাফল। মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রার পাটাতনই যে নৈতিক ভাবনার মূলভিত্তি এবং বাস্তব জীবন ভিত্তি ও পরিবেশ পরিবর্তনের সংগে সংগে যে

মানুষের জীবনের পারিপার্শ্বিক পালটায় ও তার সঙ্গে নৈতিকবোধও, নৈতিক বোধ যেন কোন শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় বিধি নিয়ম নয়, এই ধারণার প্রভাবের ফলেই বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদাই উপন্যাসকে তার নিজস্ব নিয়মে, বাস্তব কার্যকারণ সাপেক্ষ ঘটনা পরম্পরায়, গড়ে উঠতে দেন না ; পরিবর্তে তাঁর সংস্কৃত অভিজ্ঞতায় জীবন ও মানুষকে দেখার জন্য ঘটনাপ্রবাহ সর্বদাই ঘটনার নিয়মে বিকশিত না হয়ে লেখকের ইচ্ছার অনুগত হয়, কেননা তা না হলে লেখকের প্রার্থিত পরিণতি সম্ভব নয়। ড. অরবিন্দ পোদ্দারের ভাষায় : 'বঙ্কিমচন্দ্র অনুভূতিকে তাহার নিজস্ব নিয়মে বিস্তার না করিয়া আদর্শের সূত্রানুযায়ী তাহা নির্ধারণ করিতে চাহিয়াছেন।'[36] এই প্রার্থিত পরিণতির প্রয়োজনেই চরিত্রকে সামাজিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়, ঘটনার পরম্পরায় অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে চরিত্রের নতুনতর অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন সম্পর্কে পূর্বকৃত মূল্য থেকে সরে আসা রূপান্তর হয়ে ওঠে যা বঙ্কিমের চরিত্রে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ; সামাজিক পটভূমি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন চরিত্র পূর্বকৃত জীবন আদর্শের আবরণে মুখোশ থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত লেখকের প্রার্থিত পরিণতিকে মেনে নেন। অজস্র জনপ্রিয় কৌতুকের নৈতিকতার এ দুর্বল সংস্করণের একটি উদাহরণ কমলাকান্তের চিঠি থেকে দেওয়া যাক :

গো - বিধবাকে মাছ খাইতে আছে ?

কু - না।

গো - বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু ভামিনীর মা মাছ খায় কেন ?

কু - তার পোড়ার মুখ, যা করতে নাই তাই করে।[37]

এখানে কুমুর যেমন প্রচলিত নিয়ম বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা দিয়ে ভামিনীর মা-এর মাছ খাওয়া বিচারধর্ম ও নীতি বিগর্হিত মনে করে, তার পক্ষে সামাজিক বিভিন্ন স্তরের মানুষের, ভিন্ন সময় ও ভিন্ন পরিবেশের বা দেশের

মানুষের, নৈতিকতার মানদণ্ড আলাদা ভাবা সম্ভব নয়, তার বিশেষ সামাজিক স্তরের মূল্যবোধ ও প্রতিক্রিয়া দিয়েই কাহিনীর ভাল মন্দ যাচাই বিচার করে, ঠিক তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত বাঙালীর, হিন্দু, বলা বাহুল্য, নৈতিকতা ও জীবনদৃষ্টি দিয়ে দিয়েই জীবনকে দেখেন বলে বাস্তব সামাজিক পটভূমিকে সংকুচিত করতে হয়, কেননা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের বাস্তবতাকে মধ্যবিত্তের এই সংকীর্ণ জীবনদৃষ্টিতে যথাযথভাবে ধরা সম্ভব নয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। কেননা, ভূমিসম্পদ পুরুষহীন [illegible] অনর্জিত অর্থে জীবিকানির্ভর ভূস্বামী শ্রেণীর প্রতিনিধি নগেন্দ্র দত্ত বা গোবিন্দলালকে প্রাচীন পৃথিবী সমাজের মধ্যে স্থাপন করে এই দুটি ভিন্ন অর্থের টানাপোড়েনে যে নগেন্দ্র দত্ত বা [illegible] গোবিন্দলাল বেরিয়ে আসবে তা বঙ্কিমচন্দ্রের কাম্য ছিল না, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ঐতিহাসিক ভাবেই সেটা প্রার্থিত নয় বা ছিল না। কেননা তাহলে নগেন্দ্র বা গোবিন্দলালের সামাজিক অবস্থানের সার্বিকতাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। সেজন্যই 'বঙ্কিম নগেন্দ্রর জীবনকে সকল দিক দিয়ে উদ্‌ঘাটিত' করেন নি,[৫৮] তেমনি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে কৃষ্ণকান্তের পরিবারাশ্রিত ভিন্ন বর্ণ বা জাতির প্রজাদের জমিদারী সম্পর্কযুক্ত জীবন কোথাও জায়গা পায় করে নি।[৫৯] বিষবৃক্ষের মূলের বাস্তব পটভূমি থেকে লেখক মুহূর্তের [illegible] তার জন্য ঐ একটি ঝড়ের আকস্মিক সুযোগ নিয়ে নগেন্দ্রদত্ত প্রায় পূর্বনির্ধারিত ভাবে, যেন পরিচিত প্রাণতায়, কুন্দনন্দিনীর সম্মুখীন হন এবং তারপরেই আমরা দেখি যে গল্প তার প্রাথমিক বিস্তীর্ণ পটভূমি ত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথের মনের পটভূমিকেই মাত্র গ্রহণ করে এবং এর পর নগেন্দ্রনাথের পূর্বনির্দিষ্ট নৈতিকতার মানদণ্ডেরই সংশয় ও আশঙ্কা চলে। কৃষ্ণকান্তের উইলেও কৃষ্ণকান্ত রায় ও তার

উইল দৃশ্য পটে আসার সিঁড়িমাত্র এবং উইলের সুযোগে রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের পরিচয়ের পরে এই উইলের আর দৃশ্য পটে বিশেষ কোন ভূমিকা থাকে না, গোবিন্দলালের পরিবর্তে তার অংশ ভ্রমরকে দিয়ে এই দুজনের সম্পর্ক পরিবর্তনের একটা কৌশল লেখক গ্রহণ করলেও এটা না হলেও তাদের সম্পর্ক অনাবৃত হতো না; অতঃপর গোবিন্দলালের সঙ্গে সুমতি কুমতির লড়াই ও তার পরিণতি দেখানোই লেখকের প্রধান অভিপ্রেত হয়ে পড়ে এবং তাও স্থিরীকৃত নৈতিকতার দৃষ্টিকোন থেকেই । তাই বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের নায়িকারা বিধবা যদিও, কিন্তু এই দুটি উপন্যাসের দুটি নায়কের সমস্যা নায়িকারা বিধবা না হলেও সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল, কেননা, নগেন্দ্র সূর্যমুখীর জীবনে কুন্দ যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, কুন্দের বৈধব্য সেখানে কোন বাধাই নয় । কুন্দ অবিবাহিতা, কুমারী মেয়ে হলেও একই সমস্যা দেখা দিতে পারতো, ... ।[৬০] বিষবৃক্ষের পরিণামের কারণ নগেন্দ্র দত্তের স্ত্রী সূর্যমুখীর কুন্দকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণের অক্ষমতা, নগেন্দ্র দত্ত কুমারী বিয়ে করলেও এ সমস্যা ঘটতো । অথচ সূর্যমুখীর কুন্দকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণের অক্ষমতার মধ্যে নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার যে প্রকাশ, তাকে ব্যবহার করলে পরিবারের অর্থে একটি আধুনিক উপন্যাসের সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারতো, তাকে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শেই ব্যবহার করলেন না । অন্যদিকে, ভ্রমরের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকলে রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্ত্রী হিসেবেও গ্রহণ করতে পারতো, কিন্তু ভ্রমরের দিক থেকে বাধা এসেছিল এবং সে বাধার পরিণতিই গল্পের পরিণতি । নারীর আত্মচেতনা তথা আত্মসম্মান বোধের এই প্রকাশকেও বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করেন নি । তবুও যে লেখক নায়িকা দুজনকেই বিধবা হিসেবে পটে আনলেন, এবং এমনকি কুন্দকে বিধবা করার জন্য লেখককে অপেক্ষা করতে হলো, যদিও নগেন্দ্র দত্ত কুমারী

কুন্দ সম্পর্কে প্রথমেই প্রবলভাবে আকর্ষিত তার প্রধান কোন্নগর থেকে বন্ধুকে লেখা চিঠি, তার কারন নারী ও নারীজীবনের প্যাটার্ন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট ধারনা। হিন্দু আদর্শের নারী জীবনের প্যাটার্নকেই বঙ্কিমচন্দ্র যথাযথ মনে করতেন এবং এই প্যাটার্নের বাইরে নারী জীবনের প্রসার যে পুরুষের জীবনে দুঃখ ডেকে আনার সঙ্গে সঙ্গে নারী জীবনেরও সর্বনাশ ঘটায় এই তত্ত্ব সক্রিয়ভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের নারী চরিত্র নির্ণয়ে ক্রিয়াশীল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যার যার নারীচরিত্রকে এই প্যাটার্নের বাইরে এনেছেন ও তাদের দুঃখজনক পরিণতি এঁকেছেন, এবং এই 'দুঃখজনক পরিণতি প্রায়শই গল্পের অনিবার্য অবস্থায় ও নয়িকে আসেনি। এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তার বিরূপতা ছিল এবং সেই বিরূপতার প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক রূপায়ণ হিসেবেই এই দুই নারীচরিত্র এসেছে। এমন কি, এই দু দুটি উপন্যাসের চারটি প্রধান নারী চরিত্রই হিন্দু নারী জীবনের প্যাটার্নের বাইরে চলে গিয়েছিল বলে তাদের প্রত্যেকেই প্রচণ্ড দুঃখ ভোগ করেছে, কেবলমাত্র বেঁচেছে এবং অন্যান্যরাও প্রচুর কষ্ট পেয়েছে। এমনকি কমলমণিই এই দু'টি উপন্যাসের সুখী নারী চরিত্র এবং আমাদের লক্ষ করার বিষয় যে সে কখনোই স্বীকৃত প্যাটার্নের বাইরে এক পাও বাড়ায় নি। লক্ষ করার বিষয়, নারী মুক্তির কথা বলিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র অস্থির ও দুর্বল তারাচরণকে দিয়ে এবং যাকে লম্পট হিসেবে চিত্রিত করেছেন সেই দেবেন্দ্রকে দিয়ে, এবং বিষয়টিকে হাস্যকর পর্যায়ে টেনেছেন। এই প্রসঙ্গে সর্বদেবই নারীর মুক্তি স্বাধীনতায় সমাজ ধ্বংসের সম্ভাবনা - পুরুষের এই আশঙ্কা স্মরণযোগ্য নিশ্চয়ই। নারীর [illegible] সম্বন্ধে মুক্তির কথা বলা তারাচরণের যা কুল - ত্যাগিনী, এ ধরনও বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের দিক নির্দেশ করে। পিতৃহীনা তারাচরণ সূর্যমুখীর পিতৃগৃহে পালিত, তার মাতার পুত্রত্যাগের পরেও সে সূর্যমুখীর পিতৃগৃহে থেকে পড়াশোনা করে মোটামোটি ইংরেজী শিখেছিল কিন্তু কর্মহীন হয়ে থাকে এবং সূর্যমুখীর উদ্যোগে নগেন্দ্র দত্ত তার জমিদারীতে স্কুল স্থাপন করে তারাচরণকে

[illegible]

সেখানে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এই তারাচরণকে বিধবা বিবাহ স্ত্রী-শিক্ষা নারীমুক্তি ইত্যাদির উৎসাহী সমর্থক ও প্রচারক হিসেবে লেখক দেখিয়েছেন :

> এক্ষণে প্রোটেস্টান্ট-এডের প্রভাবে গ্রামে গ্রামে টেড়িকাটা, টপ্পাবাজ নিরীহ ভালোমানুষ মাস্টার বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর 'মাস্টারবাবু' দেখা যাইত না। সুতরাং তারাচরণ একজন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তিনি Citizen of the world এবং Spectator পড়িয়াছিলেন, এবং তিন বুক জিওমেট্রি তাঁহার পড়িয়া থাকার কথাও বাজারে রাষ্ট্র ছিল। এই সকল গুণে তিনি দেবীপুর নিবাসী জমিদার দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদ মধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে তারাচরণ বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা এবং পৌত্তলিক বিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন ...... মুখে সর্বদা বলিতেন, 'তোমরা ইট-পাটকেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জেঠাইমার বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।' স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবারালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোক শূন্য। [৫১]

উদ্ধৃত লেখাগুলি উপস্থাপনা, ভাষার টোন ও পাত্রটির পরিচয় সবকিছু মিলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতা [illegible] এবং আমরা তখনই বুঝি বঙ্গ-দর্শনে কেন তিনি তাঁর সময়ের দুই শ্রেষ্ঠ লেখক মাইকেল ও বিদ্যাসাগরকে আহ্বান করেন নি। তখনই বুঝি, বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহ নিয়ে কেন তিনি বিদ্যাসাগরকে

তৎকালীন আন্দোলনে প্ররোচিত হয়েছিলেন। এর সংগে নারী মুক্তি-র সমর্থক 'ইয়ং বেঙ্গলের' দুটি ধারা[৬২] দেবেন্দ্রকে যোগ করলে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই কুন্দনন্দিনীকে দেখামাত্রই নগেন্দ্রনাথের মোহ জাগলেও লেখক তারাচরণের সংগে কুন্দের বিয়ে দিয়ে তার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন এবং 'পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু এই সূত্রে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। অঙ্কুরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।'[৬৩]

বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের পুরুষ চরিত্রগুলোর সংগে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার হিন্দু মধ্যবিত্তের উদ্ভবের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকান্তের উইলের কৃষ্ণকান্ত রায় ও নায়ক গোবিন্দলাল জমিদার, যে জমিদার ও জমিদারী ব্যবস্থা বাঙলার সমাজ ইতিহাসকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছে; বঙ্গদেশের কৃষকে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তার আলোচনা করেছেন। বিষবৃক্ষের শ্রীশচন্দ্র মিত্র, নগেন্দ্রর ভগিনী কমলমণির স্বামী, কেশিয়ারীর গদির মুৎসুদ্দি, নগেন্দ্রর শ্বশুর সূর্যমুখীর পিতা কোলকাতায় 'সৌদাগরী করিতেন।' এই জমিদার মুৎসুদ্দি কেশিয়ারগোষ্ঠী উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার সামাজিক ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং বাঙালী ইংরেজ শাসন শোষণের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষক ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে এই শ্রেণীই বিকশিত হয়ে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে তুলেছে আর নিজস্বার্থের প্রয়োজনে দেশের অধিকাংশ কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিপরীত প্রান্তে এসে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের গতিকে এমন একটি বিন্দুর দিকে পরিচালিত করেছে যার ফলাফল আমাদের আজ পর্যন্ত ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এইসব চরিত্রকে সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে আনেন বলে এইসব চরিত্র তার নিজস্ব সামাজিক চরিত্র ও ভূমিকা

ভাষায় ; এইসব চরিত্র জমিদার মুৎসুদ্দি কেশিয়ারের ভূমিকায় উপস্থিত উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তোলে না বা ঐসব ঐতিহাসিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও ফোটে না ; অবস্থাভোগী ধনবান যে কোন চরিত্রকে দিয়েই এইসব চরিত্রের ভূমিকা পালন অসম্ভব ছিল না । অবশ্য দুটি উপন্যাসের নায়ক দুয়ের চরিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর সম্পত্তিবান ভূস্বামীশ্রেণীর অধিকার বোধের মানসিকতা ফুটেছে । মধ্যযুগের সামন্ত ধারণায় এই শ্রেণীর চরিত্ররা অন্যান্য ভোগবিষয়ের মতো নারীকেও ভোগ্যবস্তু হিসেবেই দেখে থাকে এবং এ ব্যাপারে সম্পত্তির অধিকারের মতো মনুষ্য নারীর প্রতি অধিকার বোধও তাদের প্রবল । অথচ ভূসম্পত্তি বা নতুন প্রভুত্ব কর্তৃত্বযোগ্য ভূমির দখলের ব্যাপারে তারা যেমন প্রবলভাবে তৎপর, ঠিক একইভাবে ইচ্ছাধীন নারী সম্পর্কেও তাদের মনোভাব ভিন্নমুখ নয় । দশা পিতৃবিয়োগ কাতর তের বছরের নিরাশ্রয় কুন্দের দুর্দশায়, নগেন্দ্রের তোমাকে দেখা পড়ে, কুন্দের নিরাশ্রয় মুখমণ্ডলে দুঃখ দুঃখ জ্বালা আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলে গিয়ে, এই মনোভাব প্রকাশিত ; আবার তারাচরণের অভিভাবকত্বকালেও এই চিত্তবিকৃতি আসে নি, সেক্ষেত্রে তারাচরণের মৃত্যুর পর যখন কুন্দ আবার অভিভাবকহীন ও নিরাশ্রয় এবং নগেন্দ্রনাথের আশ্রয়ে এসেছে । রোহিণী গোবিন্দলালের ব্যাপারেও ব্যাপারটা সে রকমই । আবাল্য পাশাপাশি বাস করে গোবিন্দলাল রোহিণীকে দেখে মুগ্ধ হয় নি, কেননা তখন তার অভিভাবক ছিল ও আশ্রয় ছিল । কিন্তু ঘটনাক্রমে চুরি করা উইল যথাস্থানে রাখতে গিয়ে যে মুহূর্তে রোহিণী কৃষ্ণকান্ত রায় কর্তৃক ধৃত হলো এবং স্বভাবতঃ পারিবারিক সম্মানচ্যুত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তেই গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হলো ও তাকে অধিকার করার বাসনা জাগল । রোহিণীর হত্যার ঘটনাও এই সম্পত্তিবান মানুষের অধিকার বোধের পরিণতি । সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় : 'গোবিন্দলালের মধ্যে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্পত্তিবান মানুষও আছে। যে রোহিণীকে দেখে বিনিময়লব্ধ সম্পত্তির দৃষ্টিতে।[৬৪] অর্থের বিনিময়ে বিষয় যেমন নিজস্ব অধিকারে থাকে রোহিণীও তদ্রূপ, অর্থের বিনিময়ে রোহিণীকে ক্রয় করা হয়েছে, অতএব রোহিণী গোবিন্দলালের সম্পত্তি; সম্পত্তি হারানোর সম্ভাবনার মুহূর্তেই অতএব তাকে হত্যা। অথচ গোবিন্দলাল একথা ভুলে গেল যে সুখস্বপ্ন বাসনায় সংসার পাতবার আকুতি, হরলাল সম্পর্কিত ঘটনায় যেটাই প্রমাণিত, বুকে লালন করা একটি ছেলেকে নানা ঘটনার সুযোগে ঘরের বাইরে টেনে এনেছে, তাকে কোনরকম সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তে সামাজিক শূন্য অবস্থায় এনেছে এবং পর নারীর জীবন বাঁধনে বাঁধা করেছে, তার কাছে তথাকথিত সতীর সতীত্ব আশা করা কোন যুক্তিতেই প্রার্থিত হতে পারে না, তথাকথিত সতীত্বের ধারণায় আক্রান্ত হলে গোবিন্দলালের হৃদয়ে হারিয়ে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। 'তুমি আমার কে?' গোবিন্দলালের এই প্রশ্নের উত্তরে রোহিণীর উত্তর, 'যতদিন পায়ে রাখেন ততদিন দাসী। অধিক কেহ নহি', তাদের সম্পর্কের যাথার্থ; কিন্তু সম্পত্তিবোধ রোহিণী হত্যায় গোবিন্দলালকে প্ররোচিত করেছে।

বিষবৃক্ষের শুরুতেই কুন্দের স্বপ্নদর্শনে নগেন্দ্র ও হীরাকে দর্শনের মধ্যে কুন্দের ভবিষ্যৎ জীবনের কুটিল সম্ভাবনা আভাসিত, এবং এ কৌশল বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রিয় কৌশল; ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তিনি বহুক্ষেত্রেই গল্পের শুরুতেই পাঠকের গোচর করেন এবং তারপর ঘটনা পরম্পরায় সেই আভাসিত পরিণতিকে বাস্তব করে তোলেন। বিষবৃক্ষের স্বপ্নদর্শনে অবশ্য লেখক কুন্দর অদেখা নগেন্দ্র ও হীরাকে দেখিয়ে অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন বটে কিন্তু এক্ষেত্রে উপন্যাসের লৌকিক পরিবেশ নষ্ট হয়, লেখক ভুল করেন যে আমাদের না দেখা মানুষকে আগে থেকে স্বপ্নে দেখা বাস্তবের দিক থেকে সম্ভব নয়। পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত সম্পূর্ণ

উপন্যাসটির প্রথম আটটি পরিচ্ছেদ লেখক মূল কাহিনীর পটভূমি হিসেবেই ব্যবহার করেন এবং এই আটটি পরিচ্ছেদ কুন্দর স্বপ্নদর্শন, হরদেব ঘোষালকে লেখা পত্রে কুন্দ সম্পর্কে নগেন্দ্রর মনোভাব, সুপ্রবৃত্তি হীরার সাজ এবং তারাচরণের সংগে বিবাহ ও বৈধব্য ; আর অবশেষে নগেন্দ্রর গৃহে কুন্দর আগমন । এখান থেকেই মূল গল্পের শুরু, 'অঙ্কুরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল', এবং এখানেই কুন্দর জীবনে লেখক হীরা ও অভিসারী বৈষ্ণবী তথা দেবেন্দ্রর কাহিনীকে যুক্ত করলেন, যদিও দেবেন্দ্র সম্পর্কে সন্দেহের ফলেই কুন্দকে কয়েকদিনের জন্য গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল, কিন্তু কুন্দর জীবনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে কুন্দ-নগেন্দ্রর বিবাহঘটনাকে সূর্যমুখীর অভিমানের ফলেই । কেননা 'যেদিন বিবাহ হইল, কুন্দনন্দিনী মনে করিলেন, এ সুখের সীমা নাই, পরিমাণ নাই,' আর পূর্ববর্তী দুঃখ দুঃস্বপ্নদর্শন সব কিছুকেই সে ভুলে ছিল । কিন্তু বিবাহের দুদিন পরেই সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ ও তার ফলে নগেন্দ্রর কুন্দ সম্পর্কে ঔদাসীন্য । লেখক তার [illegible] যেন ই বিবাহের মাত্র দুদিন পরেই সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করে এবং এই কারণেই নগেন্দ্র কুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠবার কোন সুযোগই ঘটে ওঠে না এবং সেজন্যই নগেন্দ্র নিরুদ্দিষ্ট সূর্যমুখী সম্পর্কে ভাবে 'বানরের গলায় মুক্তার মালা সাজিবে কেন ?' এবং কুন্দ সম্পর্কে : 'লোহার শিকলই ভালো ।' লেখক যদি স্বামী স্ত্রী হিসেবে সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য কিছুদিন সময় দিতেন তবে কুন্দকে 'লোহার শিকল' মনে না-ও হতে পারতো নগেন্দ্রর । আর কুন্দর মৃত্যুর কারণও নগেন্দ্রনাথের অবহেলা, হীরা বা দেবেন্দ্র নয় ; লেখক অবশ্য কুন্দর মৃত্যুর ব্যাপারে হীরাকে ব্যবহার করেছেন অদ্ভুত যুক্তিতে, 'যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সেই বিষ খাইবে, নহিলে তাঁহার প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী বিষ ভক্ষণ করিবে'

যদিও আমরা জানি যে দেবেন্দ্রর দুর্বলতা থাকলেও কুন্দর প্রতি তার কোন সম্পর্ক ছিল না ; হীরার সঙ্গে সে দুর্ব্যবহারও করে নি, প্রেমে তার প্রতিদ্বন্দ্বীও নয় । কিন্তু কুন্দর এই মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা দেবেন্দ্রর অবহেলার পরেই, বহুদিন পর বাড়ী ফিরে সবার সংগে দেখা ও কথা বললেও একমাত্র কুন্দকেই সে অস্বীকার করেছে এবং হীরাপ্রদত্ত বিষ না পেলেও সে জন্য কিছু করতে পারতো । সূর্যমুখীকে ফিরে পাবার পরে, কুন্দর বিষ পাবার খবর পেয়ে নগেন্দ্র কুন্দকে দেখতে এলে তাদের যে কথোপকথন হয়েছে তা থেকে আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত হতে পারে :

> নগেন্দ্র গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, একি কুন্দ ! তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ ?
>
> কুন্দ কখনও স্বামীর কথার উত্তর করিত না — আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল — বলিল, 'তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ ?' নগেন্দ্র তখন নিরুত্তর হইয়া অধোবদনে কুন্দনন্দিনীর নিকটে বসিলেন । কুন্দ তখন আবার কহিল, 'কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে — কাল যদি একবার এমনি করিয়া আমার নিকটে আসিয়া বসিতে — তবে আমি মরিতাম না ।[৬৫]

সূর্যমুখীর প্রত্যাগমনের পরে নগেন্দ্রর কুন্দর সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও প্রত্যাগমনের কথা মনে রেখে সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তন আর নগেন্দ্রর মানসিক পরিবর্তন এবং কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে উপযুক্ত কথোপকথন আমাদের বক্তব্যকে প্রমাণ করবে । তাই দেবেন্দ্র হীরা উপকাহিনীর বিভিন্ন অবিন্যস্ত ঘটনা একটি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসকে রোমান্স কাহিনীর নিকৃষ্ট পর্যায়ে নিয়ে গেছে । সেজন্যই, 'আখ্যায়িকাদ্বয় শুধু পরস্পরের সন্নিহিত

নিবিড়ভাবে জড়িত নয়, যাঁরা শুধু গল্পের উপর আলোকপাত করে।[৬৬] এই মন্তব্য যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কিন্তু দেবেন্দ্রর ব্রাহ্ম সমাজ নারীমুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের উৎসাহগুলিকে যদি স্মরণ করি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট মানসিকতা, তাহলে বোধহয় দেবেন্দ্র হীরার উপকাহিনীর গল্পের দিক থেকে প্রয়োজন না থাকলেও লেখকের দিক থেকে ছিল এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। বঙ্কিম তাঁর সমসাময়িককালের সমাজসংস্কার সম্পর্কে খুব বেশী শ্রদ্ধা সম্পন্ন ছিলেন না, বরঞ্চ প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতির রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কেই তার বেশী আগ্রহ ছিল। তাই সমসাময়িক যুগের একটি বিশিষ্ট প্রবণতাকেই, যে প্রবণতায় বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ যুক্ত ছিলেন, তিনি দেবেন্দ্রর মতো মানুষকে দিয়ে, যাকে তিনি নিজেই 'ম পাপী' বলেছেন, প্রতিনিধিত্ব করালেন। এবং 'ইয়ং বেঙ্গলের দুষ্ট ছায়া' হিসেবে দেবেন্দ্রর গড়ে ওঠার কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোভাবেই নিহিত। নতুবা দেবেন্দ্র শিক্ষিত প্রতিভা ও লম্পট এই চরিত্রটি এই উপকাহিনীর পক্ষে অবান্তর ছিল, ব্রাহ্ম সমাজ বা নারীমুক্তির বিষয়ে উৎসাহী ইত্যাদি প্রসঙ্গের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, সে প্রয়োজন গল্পের নয়, লেখকের, সমসাময়িক এইসব আন্দোলনের অসারতা প্রমাণের চেষ্টামাত্র।

অন্য দিকে, কৃষ্ণকান্তের উইলে কোন উপকাহিনী নেই। পূর্বখণ্ডের একত্রিশটি পরিচ্ছেদে লেখক গোবিন্দলাল ভ্রমর রোহিণীর মানসিক টানাপোড়েন ও তার পরিণতিতে রোহিণী ও গোবিন্দলালের গৃহত্যাগ বর্ণনা করেছেন। এখানে রোহিণীও কুন্দর মতো বিধবা কিন্তু লেখক কখনো বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ পুনর্বার আনেন নি; কেন আনেন নি এ প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগতেই পারে। গল্পের প্রয়োজনে

[illegible] উইলবদল পুরস্কার হরলালকে সাহায্যের ইচ্ছা রোহিণীর সুস্থ জীবন কামনা থেকে, সংসার বাঁধবার ইচ্ছায়; আর যে মুহূর্তে তার সে ইচ্ছার সম্ভাবনা নষ্ট হলো সেই মুহূর্তেই সে হরলালকে সাহায্য করতে অস্বীকৃত হলো। এই স্বাভাবিক জীবন তৃষ্ণার পরে পরে গোবিন্দলালের প্রতি তার দুরাশা এবং প্রসাদপুরে জীবনযাপন, যেখানে তার কিছু পাবার নেই (মনে রাখা দরকার, রোহিণী হরলালকে বলেছিল: 'টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্তার সমস্ত বিষয় দিলেও [illegible] পারিব না।' পৃ ৩৪৪) একমাত্র প্রাণধারণ ছাড়া এবং নেই কোন ভবিষ্যৎ। যেখানে তার দুরাশা চরিত্রের স্বাভাবিক মূল্যকে লঙ্ঘন করেছে মনে হয়। অন্য দিকে, গোবিন্দলাল চরিত্র প্রথমদিকে যেভাবে চিত্রিত, তার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও গুণপণা [আন্তরিক] প্রশংসনীয়, যেখানে বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্রর কুন্দনন্দিনীকে বের করার চক্রান্তের মতো রোহিণীকে বের করা ও প্রসাদপুরের জীবনযাপন, এবং ভ্রমরের 'ধর্ম নাই কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে, 'বুঝি আমার তাও নাই।' মাত্র এ উত্তরে, কেমন যেন চরিত্রের বিকাশের স্বাভাবিক মাত্রা লঙ্ঘিত হয়েছে মনে হয়। রূপতৃষ্ণা যতো প্রবলই হোক, দুর্বলচিত্তের চরম বিশ্বাসঘাতকের আগে অন্য সম্ভাবনাগুলো, বিশেষতঃ বিধবাবিবাহ যা সম্ভব ছিল তখন, কেন চরিত্রটি ভেবে দেখলো না বা চেষ্টা করলো না? এটা প্রশ্নের শুরু থেকেই যায়; বিশেষতঃ বিধবাবিবাহে তাকে কিছুই হারাতে হতো না, বরঞ্চ রোহিণীকে সামাজিকভাবে লাভ সম্ভব ছিল। লেখক অবশ্য পাঠকদের কৌতূহলকে এ ব্যাপারে প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর লক্ষ টাকা আয়ের এক জমিদারকে প্রাচীন কুৎসা একেবারে কাবু করবে এটা সম্ভব মনে হয় না এবং তৎকালীন প্রাচীন সমাজের ইতিহাসে অর্থবান ও ক্ষমতাবান মানুষেরা এরকম অসামাজিক সম্পর্ক নিয়েও যথেষ্ট সম্মান ও দাপটের সঙ্গে বাস করেছে - এটাই সামাজিক ইতিহাস। অন্য দিকে, রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের মিথ্যা দাক্ষিণ্যের

প্রধান হাজির করে নিজের কলঙ্ককে ছড়িয়ে দেবে, বিশেষতঃ সে যখন জানে না গোবিন্দলালের প্রতিক্রিয়া কি হবে, এটা মানতে অসুবিধে হয়। মিথ্যা রটনা শুনে তা ভ্রমরের কাছে এই ধারণা যুক্তিসহ নয় এজন্য যে এর ফলে ভ্রমরের লাভ নেই, ক্ষতিই। লেখক অবশ্য গোবিন্দলালের দিক থেকে আরও একটি বিষয় ব্যবহার করেছেন। রোহিণীর কথা প্রকাশে উত্তেজিত ভ্রমর যখন থেকে গোবিন্দলালের রেজার খবর পেয়ে পিত্রালয়ে চলে গেল এই ঘটনায় এবং কৃষ্ণকান্ত রায় তার 'উইলপ্রদোষ' অনুসার করে তার অংশের সম্পত্তি ভ্রমরকে দিয়ে দেওয়ায় 'স্ত্রীর অনুদান'-এর অবহিতা - এই দুটি বিষয়কে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে বিচ্ছেদ হিসেবে লেখক ব্যবহার করেছেন এবং তার জন্যই গোবিন্দলাল আরও বেশী রোহিণীমুখো হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন থেকে যায় যে, সেকালে বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ যখন সমাজ এখনও রয়েছে তখন এই ক্ষেত্রে দুর্বল ভ্রমরের পরিবর্তে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে রোহিণীকে গ্রহণের ইচ্ছাই তো স্বাভাবিক ছিল, অন্ততঃ গোবিন্দলালের প্রকৃতিঅনুসারে চিত্রিত চরিত্র ও তৈলেকর গ্রহণ সেটাই তো স্বাভাবিক হতো, চরিত্রের ক্রমবিবর্তনের ন্যায় সূত্র রক্ষিত হতো। তার পরিবর্তে প্রসাদপুরের জীবন যেন চরিত্রের ন্যায়সূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দ্বিতীয় খণ্ডের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা রোহিণী হত্যার ব্যাপারেও বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী চরিত্রের অসঙ্গতি ভাবায়ে তোলেন। হরলালকে উইল চুরিতে সাহায্য পুরুষ জীবন [illegible] বাসনা থেকে, কৃষ্ণকান্ত রায়ের বাড়ীতে উইল রাখতে গিয়ে ধরা পড়ার ঘটনা ও গোবিন্দলালকে জানিয়েছে এবং গোবিন্দলালের সঙ্গে প্রসাদপুরের ঘটনায় যতো কম্পমতিই থাক তাও গোবিন্দলালকে ভালোবেসেই। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদ জুড়ে যে রোহিণীকে তিনি চিত্রিত করলেন, নিশাকর সম্পর্কে তার ভাবনা, 'অনবধান ভুল পাইলে কোন ব্যাধ ব্যাঘ্র-ব্যবসায়ী ধরিয়া খাবাতে না পরাক্রম করিবে?' ইত্যাদি, - লেখকের ইঙ্গিত পরিণতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করলেও, চরিত্রের ন্যায় সম্ভাবনা লঙ্ঘন করেছে। বিশেষতঃ সে পুরুষাত্মের সংবাদ জানতে

গিয়ে সে মৃত্যুকে বরণ করলো সেই মুহূর্ত সম্পর্কে তার একটা ঔৎসুক্য উৎকণ্ঠার কোন পরিচয় আগে উপন্যাসের কোথাও দেন নি। আসলে 'রোহিনীর' আত্মোপলব্ধির অর্থ অন্য জীবনের যে নতুন প্যাটার্ন তাকে সে প্যাটার্ন .... বঙ্কিমচন্দ্রের জানা নেই; তাই রোহিনীকে তিনি শুধু অস্বীকারই করতে পারেন।[৩৫৭] নিশাকর-বিজয়ের ঈর্ষা আরও অস্বাভাবিক লাগে এজন্যই যে প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিনীর জীবনে শান্তি স্বচ্ছন্দ বা প্রেম তখন প্রবেশ করে নি। প্রসাদপুরের জীবন :

> সেই অশোক বকুল কুটজ কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমর গুঞ্জন, কোকিল কূজন, সেই স্ফুরদধরা তরঙ্গতাড়িত রাজহংসের কলনাদ ... সেই পুষ্পমধ্যে নীলকান্ত প্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব মাধুরী, সেই স্ফটিক স্তম্ভপার্শ্বোপবিষ্টা বিনামিকা পুষ্পাধারে সুবিন্যস্ত কুসুমগুচ্ছের শোভা, সেই পুষ্পশোভাকারী প্রবালতলের ঈষৎ মিলিত চঞ্চল বর্ণ আর সেই পালঙ্কের বিশুদ্ধ রত্নালঙ্কের স্ফুরিত দীপ্তি, এই সকলের প্রতি উপেক্ষা করিলাম। কেননা, যে যুবক দ্বারিকাস্তম্ভমূলে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিয়াছে, তাহার হৃদয়ে এ কটাক্ষের মাধুর্যে ঐ সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্তি হইয়াছে।
>
> এই যুবা গোবিন্দলাল – ঐ যুবতী রোহিণী।[৩৫৮]

এই ছবির পাশরই যখন লেখক রোহিনীকে নিশাকর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা বলতে দেখান বা এই ছবির পর যখন নিশাকরের সংগে গোপনে দেখা করতে যাওয়ার জন্য গোবিন্দলাল বিনা প্রশ্নে বিনা জিজ্ঞাসায় রোহিনীকে হত্যা করে তখন দুটো ঘটনাই চরিত্রের স্বাভাবিক পরম্পরার চরম লঙ্ঘন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিটি উপন্যাসেই শেষ পর্যন্ত 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'সীতারাম' পর্যন্তই উপন্যাসিক প্রভাব এসে পড়ে আর তাতেই ঘটে চরিত্রের পূর্বাপর ন্যায্য পরম্পরা লঙ্ঘিত

হয়ে থাকে । কৃষ্ণকান্তের উইলেও, 'কুমতি নামে রাক্ষসী'র প্রভাবে প্রথমখণ্ডে পতন ঘটে ওঠে ও দ্বিতীয় খণ্ডে স্থিরীকৃত জীবনের প্যাটার্ন থেকে সরে আসার জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় । ভ্রমর রোহিণী দুজনেই স্থিরীকৃত জীবনের প্যাটার্ন থেকে সরে এসেছিল জন্য পুরো দ্বিতীয় খণ্ড জুড়ে তারা প্রায়শ্চিত্ত করেছে, নতুবা রোহিণীর মৃত্যুর পর ভ্রমরের দুঃখের বিলাপিত বর্ণনার গল্পের দিক থেকে প্রয়োজন ছিল না । আসলে, 'কুন্দ-নগেন্দ্র সম্পর্কের মত, এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী গোবিন্দলাল সম্পর্কে মানবিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে পারেন নাই, ধর্ম সম্পর্কের অনুশাসন দ্বারা বিচার করিয়াছেন'[৪৩] এবং এই ধর্ম সম্পর্কের অনুশাসন বলতে সাম্প্রদায়গত জীবনের প্যাটার্নকেই বুঝতে হবে । তবে গোবিন্দলালও স্থিরীকৃত জীবনের প্যাটার্ন ভেঙেছে, দুঃখও সহ্য করেছে । কিন্তু কোথাও একবারও তাকে 'প্রায়শ্চিত্ত করুক' নামে কোন পুণ্যে, অথবা গল্পের কোন স্তর থেকে উঠে এসেছে । ও নারী, তাছাড়া গোবিন্দলাল পুরুষ জন্য, স্থিরীকৃত জীবনের প্যাটার্নে সে নারীর থেকে অনেকটা স্বাধীন, এইজন্য ।

নারীর জীবনের একটি স্থিরীকৃত প্যাটার্নে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল একথা আমরা পূর্বেই বলেছি । এই প্যাটার্ন পৌরাণিক হিন্দু ধর্মাদর্শের অনুমোদিত প্যাটার্ন, ধর্মতত্ত্বে যার আলোচনা ও সমর্থন আছে । বঙ্কিমচন্দ্র বার বার তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসে এই স্থিরীকৃত আদর্শের জীবনের প্যাটার্নের বাইরে এনে তাঁর নারী চরিত্রগুলোকে পরীক্ষা করেছেন এবং পাঠককে দেখিয়েছেন যে এই প্যাটার্নের বাইরে এসে নারীরা কিভাবে তাদের নিজেদের ও সম্পর্কিত পুরুষের জীবনে সংকট ডেকে আনে । কুন্দ ও রোহিণী হিন্দু বিধবার জীবনের প্যাটার্নের বাইরে এসে যথাক্রমে নগেন্দ্র ও গোবিন্দলালের জীবনে সংকট আনার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবনেও সংকট ডেকে আনলো এবং তাদের দু'জনকেই শেষে মৃত্যুবরণ করে তার

প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো। রোহিণীর শাস্তি বেশী ও মর্মান্তিক, তার কারণ নির্দিষ্ট জীবনের প্যাটার্নের বাইরে সে বহুদূরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী ও কৃষ্ণকান্তের উইলের ভ্রমরও স্থিরীকৃত প্যাটার্নে থাকতে পারে নি, স্বামীর সর্বৈব সুখের জন্য নারীর আত্মবিলোপের আদর্শ থেকে তারা উত্তীর্ণই হতে পেরেছিল এবং শাস্তিও ভোগ করেছে। নগেন্দ্রনাথের জীবনে সংকটের কারণ সূর্যমুখী কুন্দকে স্বীকার না করায়, কিন্তু সেখানেও স্বামীকে কোন ভাবেই দোষ দিতে পারে নি, দিয়েছে ভাগ্যকে; পরবর্তী কয় পর্যায়ে স্বামীর সুখের জন্য কুন্দকে স্বীকার করে নেওয়ায় তার প্রায়শ্চিত্তের শেষ। কিন্তু গোবিন্দলালের রোহিণী-পর্ব ভ্রমরের পক্ষে কোন ভাবেই [illegible] স্বীকার করা সম্ভব ছিল না, সে স্বীকার করেও নি; তারই ফলে তার মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়ে উঠেছে। নারীর এই স্থিরীকৃত জীবনের প্যাটার্নের কথা মনে রাখলেই দেবেন্দ্রকে বিধবা বিবাহ ও নারী শিক্ষার সমর্থক করার কারণ আমরা পেয়ে যাই, এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সংগে বিরোধের কারণও। বঙ্কিমচন্দ্রে, দেশের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে দরিদ্র মানুষ সম্পর্কে বঙ্কিম-চন্দ্রের একটি স্থির বিশ্বাস ছিল এবং এই বিশ্বাস থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র যখনই সাধারণ মানুষের উল্লেখের প্রয়োজন হয়েছে উপন্যাসে তখনই তার সেই স্থিরবিশ্বাসের আলোকেই তাদের উল্লেখ করেছেন, স্থানকাল ঘটনা পরিবেশে যে সমস্ত চরিত্রই পরিবর্তিত হয় ও একথা এ ধারণা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না তাই, প্রত্যেকটি উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রে সাধারণমানুষের উল্লেখ প্রসঙ্গে; তাদের স্বভাব আচার কোন কিছুর মধ্যেই তিনি সম্ভাবনাময় কিছু খুঁজে পান নি। বিষবৃক্ষের প্রথমে নদীর ঘাটে কৃষকবধূদের ও ভদ্রঘাটে ভদ্রকুলবধূদের উল্লেখ থেকে এবং দুটি উপন্যাসের অন্যত্রও এই মনোভাব জড়িয়ে আছে। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের আশ্রিতদের চরিত্রচিত্রণ বা

কৃষ্ণকান্তের উইলে প্রাণদরিদ্র মানুষদের উল্লেখে তাঁর এ মনোভাব কাজ করেছে। এমন কি হীরার মতো যুবতী বিধবা যে 'চরিত্রটি' ভাল রাখতে পারে না এটাও এই মনোভাব থেকেই এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসের যুবতী বিধবা কোন সময়ই চরিত্র ভাল রাখতে পারে না। 'বঙ্গীয় আর্যের অভ্যুদয়ের' [illegible] পক্ষে সম্ভবতঃ ভিন্নরূপ ভাবা সম্ভব ছিল না।

৩.

মৃণালিনীর মাধবাচার্য জ্যোতিষচর্চায় জেনেছিলেন যে 'পশ্চিমদেশীয় বণিক যখন বঙ্গরাজ্যে ছত্র ধারণ করবে তখনই 'যবন রাজ্য উৎসন্ন' হবে। হেমচন্দ্রকে পশ্চিমদেশীয় বণিক ধরে নিয়ে তিনি একবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন ও ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁর পশ্চিমদেশীয় বণিকের গোঁজামিল ধোপে টেকেনি। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে 'পশ্চিমদেশীয় বণিকের' ধারণা সংশোধিত হয়েছে, ইংরেজ কোম্পানীর সংগে মীরকাশিমের সংঘর্ষের পটভূমিকায় তিনি গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসের মূলকাহিনী যদিও শৈবলিনীর পাপ ও তার প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা এবং এই মূল কাহিনীর তিনটি চরিত্র চন্দ্রশেখর, প্রতাপ ও শৈবলিনী, যারা সবাই লেখকের কল্পিত চরিত্র, অনৈতিহাসিক; তবুও এই মূলকাহিনীর পটভূমিকা হিসেবে মীরকাশিম-কোম্পানীর সংঘর্ষের যুগসন্ধিকে লেখক গ্রহণ করেছেন অন্য এক উদ্দেশ্য সামনে রেখে। নতুবা বিবাহিত নারী শৈবলিনীর স্বামীকে অস্বীকার করে অন্য পুরুষে আসক্তি ও তার পরিণামের মূল কাহিনীর বর্ণনার জন্য যে কোন পটভূমিই তিনি গ্রহণ করতে পারতেন, নারী-পুরুষের সম্পর্কের এই সমস্যা যে কোন যুগ ও পরিবেশেরই

সমস্যা হতে পারে। উক্ত কাহিনীর তিনটি পর্যায়ে পরিচ্ছেদে প্রতাপ শৈবলিনীর সম্পর্ক, তাদের আত্মহত্যা প্রচেষ্টা ও চন্দ্রশেখর কর্তৃক প্রতাপকে উদ্ধার ও শৈবলিনীকে বিবাহের বিবরণ থেকে উপন্যাসের মূল কাহিনী ও সমস্যার সংকেত লেখক আমাদের দিয়েছেন। দলনীবেগম-মীরকাসিমের উপকাহিনীকে গ্রহণ করে বঙ্কিম ইতিহাসকে মূল কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করেছেন। দলনীর কাহিনী শৈবলিনীর চরিত্রকে লেখকের অভিপ্রায় প্রার্থিত রূপারোপে সহায়তা করেছে সত্য, কিন্তু এই কাহিনী সূত্রে ইতিহাসকে যুক্ত করে লেখক তাঁর অন্য এক গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেন যুগসন্ধিক্ষণকে, সে যুগসন্ধি হিন্দু মুসলিম শাসকদের বিরোধ, মুসলিম ইংরেজ শাসকদের বিরোধ এবং এই বিরোধকে অবলম্বন করে তিনি সর্বদাই মুসলিম শাসকদের অপদার্থতা, তাদের বিলাস কুৎসিত জীবন, তাদের পারস্পরিক সন্দেহ বিশ্বাসঘাতকতা, ধর্মের প্রচণ্ড গোঁড়ামি ও হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার ইত্যাদির বর্ণনা করেন, কালাপাহাড় থেকেই যার সূত্রপাত; আর এভাবেই মুসলিম শাসন থেকে বৃটিশ শাসনের অনিবার্যতা ও যাথার্থ প্রমাণ করেন। সেজন্যই তাঁর উপন্যাসে মুসলিম শাসকদের সঙ্গে তাদের বিরোধ সর্বত্র প্রায় ধর্মীয় বিরোধ হিসেবে উপস্থিত হয়। একই সংগে তিনি ইংরেজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদের অপরিসীম বীরত্ব, তাদের ন্যায় পরায়ণতা শাসক হিসাবে তাদের শ্রেষ্ঠতা, প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন। আর এভাবেই, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর ভাষায় 'তখন বর্তে .... ইংরেজ বণিকগণ অর্থ উপার্জনের লোভে মত্ত হইয়া সাম্রাজ্য স্থাপন অপেক্ষা প্রজাশোষণের দিকেই অধিকতর মনোযোগী ছিল।'[৭০] এমন একটি পরিবেশ-পটভূমি সৃষ্টির সংগে সংগেই ইংরেজের সাম্রাজ্য সংস্থাপন স্থাপনেই 'প্রজা শোষণ' তথা 'অরাজকতা' বন্ধ হবে এমন

মনোভাব প্রকাশ করেন, যেন সাম্রাজ্য স্থাপন শোষণের জন্য নয়, প্রজার হিতের জন্যই; এবং এভাবেই তাঁর উপন্যাসে ইংরেজ শাসনকে অনিবার্য ও অপরিহার্য করে তোলেন। আনন্দমঠ উপন্যাসে একারণেই সন্তানরা রাজত্ব দেশকে ইংরেজের হাতে তুলে দেবার জন্যই লড়াই করলো, কেননা তাদের আশা এই যে, ইংরেজরা শাসনভার গ্রহণ করলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে, সাধারণ মানুষ সুখী ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে পারবে। কিন্তু সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ; যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমি প্রসঙ্গে এটাও একটি অত্যন্ত উল্লেখ্য এবং লেখক তাঁর সুকৌশলে পটভূমিকাকে তাঁর এই বিশেষ মানসিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার কাজে ব্যবহার করেছেন। তবে আমরা একথা আগেই বলেছি যে, এই মনোভাব উনিশ শতকীয় বাঙালী মধ্যবিত্তের সাধারণ মনোভাব, আর বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যবিত্তের এই সাধারণ মনোভাবকেই তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত করেছেন। ইংরেজ শাসনের প্রশ্নে শুধু বাঙালী মধ্যবিত্তের ইংরেজপ্রীতি ঐতিহাসিক সত্য আর এই ইংরেজ প্রীতির কারণটিই হলো সুবিধাবাদ। সাধারণত, সুদীর্ঘ কাল সামন্ততান্ত্রিক নৈরাজ্যের মধ্যে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিপন্ন ও স্থিতি নষ্ট হয় বলে সামাজিক স্থিতির জন্য রাজনৈতিক স্থিতিও মানুষের কাম্য হয়। আর তার একারণেই সীতারামে ইংরেজের পূর্বের কালের নৈরাজ্যের অবস্থার চিত্রণের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ শাসনের অনিবার্যতাকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরেন এবং যে সময়ে প্রায় লাঞ্ছিত মানুষ ইংরেজ শাসন শোষণের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নিরুপায় ক্ষোভে আক্রোশে ক্রমশ ফুঁসিয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময়েই ইংরেজ শাসনের অনিবার্যতার কথা বলেন; এমনকি, সীতারামও, যিনি ইংরেজের সঙ্গে স্বাধীন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনিও জানেন তাঁর পরাজয় অনিবার্য;

'আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্য ভ্রষ্ট হইব, হয়তো প্রাণে নষ্ট হইব।'[৭১] সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী বাঙালী মধ্যবিত্তের মন নিয়ে বঙ্কিম মীরকাসিমকে এভাবে শুরুতেই পরাজিতের মনোভাবে চিত্রিত করেছেন, কিন্তু ইংরেজ বিতাড়নে এই সম্ভাবনা সম্পর্কে স্বয়ং ইংরেজরাও সেকালে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল না। [illegible] লেখকের লিখিত পুস্তকে এই ইংরেজ জাতির অজেয়তা সম্পর্কে ছিল সিদ্ধান্ত ঘোষণা, 'আমার মনে হইতেছে যে, কোনোকালেই আমরা ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইব না।'[৭২] অথবা, 'ইংরেজের হাতে রক্ষা নাই। বুঝি নবাব সিরাজদ্দৌলার দশা আমার ঘটে।'[৭৩] এবং মীরকাসিমের জীবনে সিরাজদ্দৌলার সম্ভাবনা নষ্ট হলেও সত্যিই তার বাস্তবের [illegible] ঘটে। অবশেষে প্রতীক মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :

> এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান্ - ক্ষমতাবান্ - এবং কৌশলময় [illegible] - লোভময় ইহারা একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে।[৭৪]

এইভাবে, সিপাহী বিদ্রোহে পরাজয়োন্মুখ ইংরেজকে দেখার পরেও, প্রায় বাংলার প্রত্যাশিত কৃষকের সমস্ত প্রতিরোধের সম্ভাবনা সত্ত্বেও দৌর্বল্যের প্রকাশ

বাঙালী মধ্যবিত্তের ইংরেজের জন্যেই শিশু তৈরীর প্রয়োজন ছিল; ইংরেজের প্রয়োজনে ও করুণায় সৃষ্ট বাঙালী মধ্যবিত্ত দেশের অধিকাংশ মানুষের স্বার্থের বিপরীত প্রান্তে এসে শেষ পর্যন্ত ইংরেজের বাহুবলকেই একমাত্র আশ্রয় ভেবেছিল; বঙ্গদেশের কৃষকে 'মহাশয় কৃষক বৈশিনে তুমি [illegible] আমি কোথায় থাকিব?' এই সম্ভাবনার জন্যই ইংরেজ জাতের এই শিশু তৈরীর প্রয়োজন ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-উত্তর-পর্বে। সেই মনোভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাশিম-কোম্পানীর যুদ্ধে ইংরেজ-বিমুখ পাঠানদের গড়েন; যা ছিল একমাত্র মীরকাশিমের সেনাশক্তি গুরগণ খাঁ, যে অবশ্য মীরকাশিমের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে, 'বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব' একথা সেই বলে, কিন্তু সেও পুরোপুরি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় জনা আমিয়টকে সাহায্য করে, এই আশা যে বিপদের সময় 'তাহার দ্বারা উপকার ঘটিতে পারে।'[৭৫] কিন্তু লেখক শুধুমাত্র ইংরেজের বিরুদ্ধেই অনিবার্য করে তোলেন নি, বিদ্রোহীদের [illegible] নীতিবাদী চিত্রিত করেছেন। অথচ আমরা জানি যে ইংরেজরা এদেশে প্রবেশ করেছিলেন এবং এই লুণ্ঠন বজায় রাখার জন্য তারা যে কোন রকম অমানবিক কাজেই পরাঙ্মুখ ছিল না; মীরকাশিমের সংগে বিরোধের [illegible] কারণও এই দায়িত্বহীন লুণ্ঠন। কিন্তু লেখক এই ঐতিহাসিক লুণ্ঠনের পটভূমিকায় মীরকাশিমের সংগে ইংরেজের বিরোধকে চিত্রিত না করে দলনীবেগম হরণকেই প্রাধান্য দিলেন, কেননা তা না করলে ইংরেজ লুঠেরাদের অধিকাংশ ভারতীয়দের কাছে প্রশংসা করা সম্ভব নয়। এই প্রয়োজনেই ওয়ারেন হেস্টিংস্ কন্টাবকে [illegible] পদচ্যুত করে, কুলসুমকে কোলকাতা থেকে ফেরৎ পাঠায় এই লিখে 'আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সংগে বিবাদ করে না। এইজন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম।'[৭৬] কিন্তু এখানেও সন্তুষ্ট না থেকে লেখক [illegible] হেস্টিংসের [illegible] প্রশংসায় এগিয়ে বলেন:

ইতিহাসে ওয়ারেণ হেস্টিংস পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কংখ্য লোক কর্তব্যানুরোধে অনেক সময় পরপীড়ক হইয়া ওঠে। যাঁহার উপর রাজ্য রক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু ও ন্যায়পর হইলেও রাজ্য রক্ষাকার্যে পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই একজনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাহারা মনে করেন যে, সে অত্যাচার কর্তব্য। বস্তুতঃ যাঁহারা ওয়ারেণ হেস্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ হবেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরায়ণতা নাই - তাহার দ্বারা রাজ্য শাসনাদি মহৎকার্য হইতে পারে না - কেননা তাহার প্রকৃতি ঐ উদ্দেশ্য নহে - ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে।[৭৭]

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র হেস্টিংস সত্তেই প্রশংসা করলেন তাই নয়, ইংরেজের সমগ্র সাম্রাজ্য শাসন প্রক্রিয়াটিরই প্রশংসা করলেন এবং এইভাবে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্য শাসনের সমগ্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার নৃশংসতা ও বর্বরতাকে ঢেকে দিতে চাইলেন। বাঙালী মধ্যবিত্তের নিজস্ব শ্রেণী অবস্থানের জন্যই ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যার এরূপ প্রয়োজন হয়েছিল। বৃটিশ আনুকূল্যে উদ্ভূত এই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী আপন শ্রেণী স্বার্থেই বৃটিশ শাসনকে অনিবার্য ও শুধু জরুরী মনে করেছিল এবং 'বঙ্গীয় আর্য'র অভ্যুদয়ের [illegible] পক্ষে দেশের অধিকাংশ 'অনার্য' জনসাধারণের উত্থান ও অধিকার ধ্বংসের উপর গড়ে ওঠা বৃটিশ শাসনকে নিন্দা সম্ভব ছিল না, যেহেতু এই ধ্বংসের ফলেই তাঁদের জন্ম ও বিকাশ। সেজন্যই এই উপন্যাসের

ইহা ইংরেজ চরিত্রটা যথেষ্ট মর্যাদাজনক চরিত্র হিসেবে উপন্যাসে চিত্রিত, এমন কি যে গৌরবে প্রাধান্যভাবে ছিলেন জাতীয় চরিত্র মনে হয় সেও কিন্তু শৈবলিনীকে তার জন্মগতিতে হরণ করে নি, শৈবলিনীর 'কটাক্ষ জাল পাতিয়া প্রাণ মাছ'কে ধরার অপরাধের জন্য প্রমান; ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : 'শৈবলিনীর মনে পূর্ব পাপের অঙ্কুর না থাকিলে শুধু ফস্টারের লাল মুখ ও রূপ আকর্ষণ তাহাকে গৃহসুখ হইতে আকর্ষণ করিতে পারিত না, ... শৈবলিনী ও ফস্টারের মধ্যে কে যে শিকারী ও কে যে প্রলোভিত তাহা বলা কঠিন।'[৩৮] এবং শেষ পর্যন্ত নবাবের সম্মুখে বিচারের জন্য পাঠিয়ে তখন ফস্টার তালে : 'একবার ইংরেজের নামে কালি দিয়াছি – আর ইংরেজের নাম ডুবাইব না।'[৩৯] হুমায়ুন কবির বলেছেন : 'চন্দ্রশেখর বা প্রতাপের চেয়ে ফস্টার পুরুষত্ব ও অনেক বেশী সাবলীল চরিত্র ছিলেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'[৪০] এছাড়াও, মুর্শিদাবাদের নবাবসেনা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আমিয়ট কাপ্তেন ও জনসন 'জাতীয় মর্যাদা রক্ষার' জন্য প্রাণত্যাগ করিল। তখন গুরগণ খাঁর সেনার উপরে গুলিবর্ষণ শুরু হয়, লেখক বলি এঁকেছেন :

> হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই উপর তাহারা নিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ যবনগুলির উপর যবনগুলি পড়িতে লাগিল। .... ক্রিমার ইংরেজ এক হইয়া একবারে আক্রমণ করিলেন। ছিন্ন বিচ্ছিন্নের ন্যায় নৌকায় যবন-গুলি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া নৌকা হইতে জলে পড়িল।
>
> আবার মুসলমান নৌকার উপর উঠিল। তাহার কতকগুলো মুসলমান কুড়ালি লইয়া নৌকার তলে আঘাত করিতে লাগিল। নৌকার তলদেশ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায়, হুড় হুড় শব্দে তরণী জলপূর্ণ হইতে লাগিল।
>
> আমিয়ট সঙ্গীদিগকে বলিলেন, 'শৃগালদিগের ন্যায় জলে ডুবিয়া

থাকিব কেন ? নামিয়ে আইস, দাঁড়ের ন্যায় অস্ত্র হস্তে ধরি ।'

তখন তলবারি হস্তে তিনজন ইংরেজ অকুতোভয়ে সেই অগণিত যবনগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল । একজন যবন, আমিয়টকে সেলাম করিয়া বলিল, 'কেন মরিবেন ? আমাদিগের সঙ্গে আসুন ।'

আমিয়ট বলিলেন : 'মরিব । যেমন আমি এখানে মরিব, তোমরা আজি যে আগুন জ্বালিলে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে । আমাদিগের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জের রাজপতাকা তাহাতে রোপিত হইবে ।'[৬১]

এ [illegible] ছবির পাশাপাশি মুসলিম সেনার পলায়ন ও বিশ্বাসঘাতকতার ছবিই তিনি এঁকেছেন । এমনকি, যখন তকি খাঁ, ইতিহাসে যিনি মীরকাসিম-এর জন্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছেন, তাঁকেও, সেই তকিকে উপন্যাসে লেখক এখানে কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে এঁকেছেন । ইংরেজের সঙ্গে সমান সাহসে যুদ্ধ নয়, শুধুমাত্র পলায়ন ও বিশ্বাসঘাতকতা, তকি খাঁ, গুর্গন খাঁ সবাই বিশ্বাসঘাতক, এ উপন্যাসে মীরকাসিমের সেনারা কেউই যুদ্ধ করে না, উপন্যাসের শেষপর্বে বর্ণিত হয়েছে পলায়নের চিত্র :

সত্যানন্দ স্বামী বলিলেন : 'চিন্তা নাই — দেখিতেছ না, কোন্ দিকে যবন সেনাগণ পলায়ন করিতেছে ? যেখানে মুসলমানেরই পলায়ন, সেখানে আর পরাজয়ের সম্ভাবনা কি ?'[৬২]

এই পলায়ন চিত্র ও ইংরেজের তুলনায় সাহস ও শক্তিমত্তায় নায়কের চিত্র আঁকার সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলকভাবে মুসলিম চরিত্রগুলোকেও হীন ও অযোগ্য করেছেন । বাংলা, বিহার উড়িষ্যার নবাব আলী বর্দীকে যুদ্ধের মুহূর্তে সমস্ত কিছুই ভুলে গিয়ে যেভাবে 'জননী জননী বলে ক্রন্দন করেন না যুদ্ধের মুহূর্তে যে দরবার প্রদর্শন করেন

সেটা তার দেশশাসক হিসেবে চরম অযোগ্যতার প্রমাণ; যেভাবে তিনি দলনীকে বিষ প্রয়োগের আদেশ দেন বিনাপ্রশ্নে প্রমাণে জিজ্ঞাসায়, তা মাত্র সাধারণে প্রচলিত মুসলিম শাসনে কাজীর বিচারের বিভীষিকার প্রমাণ মাত্র নবাবের যোগ্যতার কোন প্রমাণ নয়। অন্যদিকে, প্রধান সেনাপতি গুরগণ খাঁ নবাবের কাছে বিশ্বাসঘাতক শুধু মাত্র নয়, সাধারণ মানবিক সম্পর্ক অস্বীকার করে আপন ভগ্নীকে পর্যন্ত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে মুহূর্তের জন্য কুণ্ঠিত নয়। তকি খাঁ অন্য দিকে অবশ্য, নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। এইভাবে পাশাপাশি ইংরেজ ও মুসলিম চরিত্রগুলোকে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র বৃটিশ বিজয়ের অনিবার্যতাই প্রমাণ করেন, মুসলিম শাসকদের পতনের অনিবার্যতাও। আর এভাবেই 'বঙ্গীয় আর্য'-এর হিন্দু জাতকের কল্পনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, উন্নত হিন্দু জাতকের পত্তনের কারন মুসলিম শাসন এই বিশৃঙ্খলা এবং চরিত্র মধ্যযুগে লাভ করে। এইপ্রসঙ্গে দলনী বেগম অন্য একজন, বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ বিশ্বাসের আদর্শ নারী জীবনের প্যাটার্নের ক্ষেত্রেই থাকে, বঙ্কিমচন্দ্রের বরণীয় স্বপ্নরূপ নারীচরিত্র যে; কিন্তু দলনীকে এ রকম করার লেখকের ভিন্ন প্রয়োজন ছিল, আর সে প্রয়োজন শৈবলিনী চরিত্রের তুলনা, শৈবলিনীর পাপকে গাঢ়তর ভাবে চিত্রিত করা। সেটি যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে প্রধান হয়ে শৈবলিনী — চন্দ্রশেখরকে ঘিরেই মূল কাহিনী আবর্তিত এবং এই উপন্যাসেই মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র বিবাহিত নারীর অন্য পুরুষে আসক্তির তাৎপর্যকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এ কথা মানতেই হবে যে বিষয়টা বঙ্কিমচন্দ্রের কালের পক্ষে যথেষ্ট আধুনিক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে প্রচণ্ড রকম আধুনিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চিন্তায় যে সর্বদাই গভীর পরিবর্তনশীল মানসিক সম্পর্ককে পরিহার করেন এবং তাঁর স্থির নির্দিষ্ট জীবনের প্যাটার্নের বাইরে চরিত্র স্থাপন করেন মাত্র পূর্বনির্দিষ্ট জীবনের প্যাটার্নের যাথার্থ্য প্রমাণের জন্যই; শৈবলিনীও

তার ব্যক্তিত্ব নয়। উপন্যাসের শুরুতে উপক্রমণিকায় প্রতাপ শৈবলিনীর আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ও তার ব্যর্থতা দিয়ে উপন্যাসের শুরু, যদিও আট বছর বয়সের একটি মেয়ের পক্ষে এরকম একটা ঘটনা সম্ভব কিনা সেকালেও, এ প্রশ্ন আমাদের অমীমাংসিত থাকে; তবে লেখক ঐ ঘটনার পরে পরবর্তী আট বছরে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সম্পর্কের ফাঁক ও ফাঁকি বর্ণনা করেন মনোবৃত্তির অংশে, দু'একটি সংকেতে সেটা পাঠকের গোচর করেন। [illegible] পুষ্করিণী থেকে অনেক দেরী করে শৈবলিনী যখন ঘরে ফিরলো চন্দ্রশেখর 'তখন তিনি ব্রহ্মসূত্রের সূত্রবিশেষের অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন।'[৬৩] অন্য দিকে চন্দ্রশেখরও তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন তাও বোঝা যায়, [illegible] 'আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব — অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ আমি তো সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখের উপায় কখন দেখি? আমার গ্রন্থগুলি পুড়িয়া গিয়াছে। এমন নবযুবতীর কি দুঃখ?'[৬৪]

এইভাবে উপন্যাসের প্রস্তাবনায় ঐ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাকে বঙ্কিম সাংকেতিক সংকেতে ও কখনো সচেতে চিত্রিত করেও শেষপর্যন্ত উপন্যাসের ঐ চরিত্রকে পরিবর্তন করেন; চন্দ্রশেখরের বুদ্ধিবাদ আত্মার সুযোগে ঘটিত সংঘাতে শৈবলিনী 'কণ্টকজাল পাড়িয়া প্রতাপশশী'কে ধরার আকাঙ্ক্ষায় লরেন্স ফস্টারের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে এবং এইভাবে লেখক ঐ মানবিক সম্পর্কের সংকটকে ঘটনায় বহুল ইতিহাসের পটভূমিতে স্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করেন। শৈবলিনীর এই গৃহত্যাগকে লেখকের একটি সুযোগ গ্রহণ বলে মনে হয় এই জন্যই যে, 'বিংশতিবর্ষীয়া' শৈবলিনীর পক্ষে লরেন্স ফস্টারের সঙ্গে গৃহত্যাগের মধ্যে পুরন্দরপুরের কুঠিতে এসে প্রতাপকে 'কণ্টকজাল' পেতে ধরার আকাঙ্ক্ষার চেয়েও যে অসম্ভাব্যতা তা না বোঝার জন্য, বিশেষতঃ যে প্রতাপ শৈবলিনীর

মনোভাব বোঝার পরে বেশ্যাকে প্রাণ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে, শচীনের সঙ্গে বসবাস করা সেই শৈবলিনীকে গ্রহণ করার প্রসঙ্গানুসারে কথা তার মনে পড়ে নি এবং ফেলেছেন, এটা বিশ্বাস করতে আমাদের কষ্ট হয়। এ সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> '..... শৈবলিনীর মুক্তি-ব্যাপারটি ঠিক আমাদের মনঃপূত হয় না। চন্দ্রশেখরের সহিত পুনর্মিলন ঘটিলে দেশে ফিরিয়া প্রণয়রাজ্য যে কি প্রকারে মুক্ত হইবে, তাহা দুর্বোধ্য রহিয়া যায়।[৬৭]

অনুরূপভাবে, প্রতাপের নৌকা থেকে শৈবলিনী পলায়ন, শৈবলিনী কর্তৃক প্রতাপ দর্শন, প্রতাপের কারাগার থেকে উদ্ধার প্রসঙ্গে, মুক্তাবস্থায় আশ্রয়হীন নৌকা ভ্রমণ ইত্যাদি অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক ঘটনার মধ্যে আশ্রয় নেন এবং শৈবলিনীকে তাঁর প্রতিটি পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। ঠিকমত কাহিনী দেখলে একটি বিশেষ মনে হয় ঐতিহাসিক বাধা নয় শুধু এটা বিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক জীবন প্রবাহে স্থান দেবে নয় না এবং এজন্যই তিনি শৈবলিনীকে বিবাহিত নারীর জীবনের আদর্শ পরিণতি থেকে দূরে নিয়ে যাননি এবং ~~এতক্ষণ পর্যন্ত শৈবলিনীর নারীজীবনের আদর্শ পরিণতি থেকে দূরে নিয়ে আসেন~~ এবং এতদূর যে শেষপর্যন্ত এতক্ষণেও যোগানন্দ স্বামীর যোগবলকে প্রযুক্ত করতে হয়, যোগানন্দ স্বামীর যোগবলকে কাজে লাগিয়েই শেষ পর্যন্ত শৈবলিনীকে নারীজীবনের আদর্শ পরিণতির দিকে ফিরিয়ে আনতে হয়। অবশ্য যে শৈবলিনী ফিরে আসে সে যোগানন্দ স্বামীর আদিষ্ট পরিবর্তিত শৈবলিনী, যে নারীর 'মানবকে পুনর্দর্শনের যোগ্য, কিন্তু উপন্যাস মানুষ পুনর্দর্শনের যোগ্য নয়।'[৬৮] কিন্তু এই প্রসঙ্গে লেখকের শৈবলিনীকে মুক্তি প্রদর্শনের আড়ম্বর ও যোগানন্দস্বামীর যোগচক্র অলৌকিকতা নিশ্চয়ই পর্যায়ে

পড়ে এবং এর দ্বারা লেখকের বিশিষ্ট মানসিকতাই প্রকাশিত এবং সে মানসিকতার প্রকাশ রমানন্দ স্বামীর চরিত্রে। এই চরিত্রটি শৈবলিনীর 'পাপ' এর পরিত্রাতা শুধু শৈবলিনীকে হিপনোটাইজ করে ঈশ্বরের করার চেষ্টা করেনি, স্বয়ং চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করে শৈবলিনীর বক্তব্যকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে, এবং এমন কি, মৃত্যুমুখী প্রতাপকে পর্যন্ত জেরা করেছে: 'তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?' বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রটিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে অংকন করেছেন কেননা চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক নীতিবোধের প্রতিভূ; কিন্তু এতো বড় নারী বিদ্বেষী, নারীকে ঈর্ষানুকীর্ণ ভাবা মানসিকতা, চরিত্র বঙ্কিম সাহিত্যে দ্বিতীয় রহিত। তবে জীবন দেবার পরে মৃত্যুপথযাত্রী প্রতাপকে উদ্দেশ্য করে স্বয়ং লেখক যখন বলেন: 'তাহা শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালবাসিতে জানিতে না' তখন বুঝি এই বিদ্বেষ রমানন্দ স্বামীর বক্তব্যে [উদ্যত] দেখেছেন। পুণ্যবতী নারী সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্র এবং নীতির ও সংস্কার বঙ্কিমের উপর চিরদিনই জড়িয়ে আছে। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন: 'শৈবলিনীর আত্মশুদ্ধিকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিমের বুদ্ধির সংকট চরমে পৌঁছায়। বঙ্কিমচন্দ্র সমস্যাটিকে মন দিয়া দেখিয়াছেন, চোখ মেলিয়া দিয়া দেখেন নাই। তাই এখানে তাঁহার বুদ্ধির পরাভব, পূর্ব সংস্কারই বিজয়ী।'[৮৭] তার এই চরিত্রটির প্রভাবেই, প্রথমদিকের রক্তমাংসের চন্দ্রশেখর যে শৈবলিনীর বেদনাকে অনুভব করে, যে শৈবলিনী স্বপ্নের প্রতিক্রিয়ায় তার একদিনের প্রিয় সঞ্চয় পুঁথিগুলি ভস্মীভূত করে, সে পরবর্তীকালে রমানন্দস্বামীর ধারায় ঔদাসীন্য পরোপকার বৃত্তির ~~[illegible]~~ [ধর্ম] অনুশাসনে পর্যবসিত ও বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক নীতিবোধের প্রচারের বাহক হয়ে দাঁড়ায়। কৃষ্ণকান্তের [উইলের] গোবিন্দলালের ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ [ভারতীর] সঙ্গে শৈবলিনীর পরিণতির তুলনা করলেই আমরা দেখবো যে

প্রচলিত সামাজিক প্যাটার্নে পুরুষের [illegible] সঙ্গে [illegible] স্বাধীনতা গোবিন্দলালের প্রাপ্য ও বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সেটা দিয়েছেন ; সেজন্য রোহিণীতে আসক্ত হয়ে পত্নীত্যাগ করলেও, এমন কি রোহিণীকে হত্যা করেও, তার 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর' লাভে কোন বাধা হয়নি । অন্য দিকে, শৈবলিনী মাত্র মানসিকভাবে প্রতাপে আসক্ত, স্বামীতে আসক্ত না থেকে, এইজন্য তাকে রমানন্দ স্বামী বর্ণিত সামাজিক অত্যাচারের ও অসম্মানের সম্মুখীন হতে হয়েছে, আর তার স্রষ্টা প্রথম থেকেই তাকে 'পাপীয়সী' বিশেষণে বিশেষিত করে রেখেছেন । অন্য দিকে, প্রতাপ চরিত্রকে লেখক নিষ্কাম আদর্শের [illegible] আলোকে রূপায়িত করতে গিয়ে — 'পাপচিত্তে আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত নহি - আমার ভালোবাসার নাম জীবন বিসর্জনের [illegible] আকাঙ্ক্ষা'[৬৮] এই চরিত্রে অনেক প্রশংসা পেয়েছেন । এবং এজন্যই [illegible] প্রতাপকে '[illegible]'[৬৯] বলেছেন । এই শেষ পর্যন্ত [illegible] প্রেমের সংযত পরোপকার তার চরিত্রে প্রধান হয়ে উঠলো, বলি প্রদান বোধই শেষপর্যন্ত প্রাধান্য পেল । অথচ শৈবলিনীর যখন প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হলো তখনও প্রতাপের চিত্তশুদ্ধ পরোপকার বা বলি প্রদানের প্রশ্ন ছিল না :

> চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন - চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে কেন বিবাহ করিয়াছিলেন ? রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়া, রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল ? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন - সুন্দরী তাহাকে না পাঠাইলে প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর পুনর্দর্শন ঘটিত না ; শৈবলিনীও মরিত না । কিন্তু সর্বাপেক্ষা লরেন্স ফস্টারের উপর রাগ হইল - সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে এ সকল কিছুই ঘটিত না।[৭০]

এই ভাবনার পরেই আমরা প্রতাপকে পাচ্ছি যুদ্ধক্ষেত্রে, আর তখনই পাপপুণ্যের ও মঙ্গল অমঙ্গলের প্রশ্ন উঠেছে, প্রতাপ যেন আত্মহত্যার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলো। আকস্মিক এই পরিবর্তন চরিত্রের ন্যায়সূত্রকে অস্বীকার করেছে, লেখকের ইচ্ছাই মাত্র এতে প্রতিফলিত। প্রতাপের চিত্তদ্বন্দ্বে তাঁর পূর্বপ্রীতির সম্ভাবনা, ঘটনার অনিবার্য বিবর্তনে চরিত্রের রূপপরিণতি নয়, আকস্মিক; এই পরিবর্তন লেখকের প্রয়োজনথেকে। জীবনের একটি স্থিরনির্দিষ্ট প্যাটার্নকে রূপায়িত করার প্রয়োজনে বঙ্কিম-উপন্যাসে চরিত্রের এই উল্লম্ফন সাধারণ ঘটনা, প্রতাপ চরিত্রও তাই।

দলনী কাহিনী লেখকের একটি বিশেষ বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করেছে একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। শৈবলিনী যেমন বিবাহিত নারীর নির্দিষ্ট জীবনের প্যাটার্ন ভেঙে ফেলেছিল - 'তিনি যাই ভালবাসুন, তবু তাঁর চরণ সেবা করিয়া কাল কাটাইতে পারিলেই তোমার জীবন সার্থক' অথবা প্রথম খণ্ড 'এ নারী জন্ম আর কাহার জন্য?' কুলসমের এই বক্তব্য-এ সেই স্থিরাদর্শ প্রতিফলিত - তা দলনী তেমনি শেষ পর্যন্ত এই স্থির নির্দিষ্ট প্যাটার্নের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিল। শৈবলিনী নিজের জীবনে বিপর্যয় এনেছে আত্মসুখের আকাঙ্ক্ষায় আর দলনীর বিপর্যয় স্বামীর আত্যন্তিক মঙ্গলকামনায়। মীরকাশিমের হারেমে তার প্রবেশ যদিও গুরগণ খাঁর প্রয়োজনে কিন্তু বিবাহের পরেই সে পূর্বপরিকল্পনাকে অস্বীকার করে, এমন কি স্বামীর মঙ্গলের প্রয়োজনে নিজ ভ্রাতার বিরোধিতায় সে প্রস্তুত। মুসলিম ধর্মে বিবাহবিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণে বাধা নেই একথা গুরগণ খাঁ স্মরণ করানো মাত্র দলনীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার মতো:

> দলনী ক্রোধে কম্পিতা হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। পদদন্ত নিরুদ্ধ করিয়া, লোচনযুগল বিস্ফারিত করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল,-

'তুমি নিশ্চিন্ত যাও। অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম — অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। ...... আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রুসম্বন্ধ।'[11]

শুধু তাই নয়, মীরকাসিম যখন অন্যায় সন্দেহে তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যার আদেশ দিয়েছে তখনও দলনীর প্রতিক্রিয়া পিতৃতন্ত্রনির্দিষ্ট নারীজীবনের প্যাটার্নকেই স্মরণ করায়:

তখন দলনী ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন — 'ও রাজ রাজেশ্বর! শাহানশাহা! [illegible] বাদশাহের বাদশাহ! এ দরিদ্র নারীর উপর কি হুকুম দিয়াছ! বিষ খাইব? তুমি হুকুম দিলে কেন খাইব না? ...... আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব — কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না — এই আমার দুঃখ।'[12]

শৈবলিনীর পিতৃতন্ত্রনির্দিষ্ট নারীজীবনের প্যাটার্ন ভাঙার পাশাপাশি দলনীর এই প্যাটার্নকে যথাযথভাবে অনুসরণ শৈবলিনীর বঙ্কিম-কথিত পাপের চিত্র গাঢ়তর করার জন্যই প্রয়োজন ছিল। এই প্রসঙ্গে অচ্যুত গোস্বামী মন্তব্য করেছেন: 'বঙ্কিমের মনে এরকমের কোন অভিপ্রায় থাকা অসম্ভব কিছু নয়।'[13] অন্য দিকে, শৈবলিনীকে সংকীর্ণ সংসারের সীমানার বাইরে এনে ও দলনীর কাহিনীকে যোগ করে ~~প্রেম কাহিনীকে যোগ করে~~ লেখক কাহিনীকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে পেরেছেন; যে যে উদ্দেশ্যে করেছেন সেটা আগেই আলোচনা করেছি। আকস্মিকভাবে চন্দ্রশেখরকে দলনীর সম্মুখে উপস্থিত করে লেখক কাহিনী দুটিকে জুড়ে দিয়েছেন।

পাঠকের তবু একটি প্রশ্ন থেকে যায়। লেখক কি শৈবলিনীকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করলেন, যার জন্য সে আবার আত্মপ্রকাশ করার পরে স্বামীকেও পুনর্বার গ্রহণ করলো?

সুদীর্ঘ চারটি খণ্ড পরিচ্ছেদ জুড়ে শৈবলিনীর যে মনঃসংযমী অনুতাপী শুদ্ধির আয়োজন, যে শুদ্ধির আয়োজন পড়তে পড়তে পাঠকের রোমাঞ্চ জাগে আর শৈবলিনী নবত্ব পান, তা দেখে শ্রদ্ধার প্রশ্ন বোধহয় আসে না। আর স্থিরনির্দিষ্ট নারী-জীবনের প্যাটার্নের বাইরে চলে যাওয়া নারীকে আমাদের হিন্দু শাস্ত্র ক্ষমা করে না, বঙ্কিমও করেন নি। তবুও যে শৈবলিনী পুনঃ ফিরলো তার কারণ শৈবলিনী নয়, চন্দ্রশেখর; চন্দ্রশেখরের মতো শুদ্ধপবিত্র ধার্মিক মানুষের জীবনকে স্ত্রীর পাপ ও অপুণ্যের লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্যই শৈবলিনীর প্রত্যাবর্তন। তবে যে শৈবলিনী বেরিয়েছিল ঘর থেকে আর যে ঘরে ফিরেছে তারা এক নয়; রমানন্দ স্বামীর কৃচ্ছ্রানুশীলন দ্বারা সে এখন পরিশুদ্ধ, কায়মনে স্বামীর পদসেবায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুতরাং চন্দ্রশেখর উপন্যাস আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে ড. অরবিন্দ পোদ্দার যে কথা বলেছেন, 'তাঁহার প্রাণের কথা: সনাতন নীতি ধর্মের অনুশাসন দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা'[১৬] সেকথা যথার্থ বলেই স্বীকার করতে হয়।

৬.

রাজসিংহ উপন্যাস আলোচনার আগে একটু ভূমিকা প্রয়োজন। ভারত ইতিহাসের যে বিশিষ্ট বোধ ও ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস গঠনে সহায়তা করেছে, প্রথম থেকে, তারই সর্বাত্মক ও বলিষ্ঠ প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসে। এই বোধ অন্য দুটো উপন্যাস আনন্দমঠ ও সীতারামের গঠনে ও ভাবনাতেও প্রতিফলিত। এই বোধকে সংক্ষেপে হিন্দু জাতীয়তাবাদ বলা হয়ে থাকে, আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অনেকে একে 'ক্ষুব্ধ জাতীয়তাবাদ'ও বলে থাকেন।

আমরা বলেছিলাম, এই বোধ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝের দশক থেকে বাঙালী মধ্য বিত্ত মনকে আকৃষ্ট করেছে এবং পরবর্তী আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। ইতিহাস থেকে আমরা এটাও জেনেছি যে, মুসলিম শাসকদের হাত থেকে যে ইংরেজ এক এক ভারতবর্ষকে দখল করেছে সেই ইংরেজের সাহচর্যে ও সহায়তায় এই নতুন মধ্য বিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে, মুসলিম শাসনব্যবস্থায় এই পূর্বপ্রতিষ্ঠিত হীন শ্রেণীটির অধিকাংশ পুরুষই ছিল অপরিচিত ও ইংরেজ শাসন শোষণের কল্যাণেই তাদের নতুন করে গড়ে ওঠা ও নতুন সমাজে বিশিষ্ট অবস্থান; তারা জানতো যে দেশের প্রতিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত নিম্ন শ্রেণী ইংরেজের অবিহনে টিকে থাকতে ও প্রসারিত হতে পারবে না। মুসলিম শাসনব্যবস্থার সময়ের হিন্দু অভিজাত ও বিত্তবান শ্রেণীটি পরিবর্তিত যুগোপযোগিতার সংগে তাল মেলাতে না পেরে ধ্বংস হয়ে গেছে ও যাচ্ছিল। অন্যদিকে এই নতুন নতুন শ্রেণীটির মুসলিম শাসন সম্পর্কে কোন রকম মোহ থাকতে পারে না এবং ছিলও না। বরং একদিন ক্ষমতায় থাকা ও বর্তমানে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত মুসলিম অভিজাত শ্রেণী ইংরেজ আগমনে পূর্বতন সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবার ফলে প্রচণ্ডরকম ইংরেজ বিরোধী ছিল, ওয়াহাবী আন্দোলনের বিস্তার ও ইংরেজের সংগে মুখোমুখি সংঘর্ষের প্রচণ্ডতা তার প্রমাণ। এরকম অবস্থায় ভারতবর্ষের জনসাধারণকে নিজ শাসন ও শোষণের জন্য বিভক্ত করার প্রয়োজনে ইংরেজ শাসক ও তাদের প্রশংবদ বিদ্বৎসমাজ ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা শুরু করে। এর ফলে একদিকে যেমন হিন্দু মুসলিম বিরোধের একটি বাতাবরণ সৃষ্টি হতে থাকে, ঠিক একইভাবে বৃটিশ শাসন শোষণের সহায়ক শ্রেণী হিসেবে হিন্দু উচ্চ ও মধ্য বিত্ত শ্রেণীও বৃটিশ শাসনের সমর্থক হয়ে পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহ বিষয়ে এই শ্রেণীর বিরূপতা ও ইংরেজের বিজয়ের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার সংবাদ থেকে একথা বোঝা যায়।

কিন্তু এই অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৮৫৭ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত হবার অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষিত শ্রেণীর বিস্তার, শিল্প বিকাশের অভাবে শুধুমাত্র প্রশাসনীয় কাজকর্মের স্বল্পতা ও যোগ্যতার অনুরূপ কাজকর্ম না পাওয়া, বৃটিশ শাসকদের ব্যবহারের পরিবর্তন ও সাহিত্যের প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয়দের সংস্পর্শে তাদের জাতি ঘৃণা ইত্যাদি কারণগুলোর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী পূর্বের মতো ইংরেজভক্ত থাকতে পারে না। কিন্তু ভূমিস্বত্বসম্পত্তি ও দেশের পরিশ্রমী জনসাধারণের স্বার্থের বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে সরাসরি ইংরেজ বিরোধিতা সম্ভব ছিল না। তারই ফলে নতুনভাবে অনুভূত ইংরেজবিদ্বেষ থেকে উদ্ভূত আত্মসচেতন মনোভাব মুসলিম বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়। ইতিমধ্যে বৃটিশ শাসকদের বশংবদ বিদ্বৎসমাজ প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ইতিহাস ইত্যাদির আলোচনার ভেতর দিয়ে প্রাচীন ভারতের একটি গৌরবোজ্জ্বল চিত্রকে ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরে। বেদ-উপনিষদ্ সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আর্যসভ্যতার সঙ্গে য়ুরোপীয় উন্নত সভ্যতা সমূহের সংযোগ সূত্র তারা আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালীর সামনে বর্তমানের লজ্জাজনক অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ ও গৌরব করার মত একটি বিষয় হয়ে পড়ে। এরই সঙ্গে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনের তুলনামূলক আলোচনায় মুসলিম শাসনকেই তাদের প্রাচীন ভারতের ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সমাপ্তির কারণ মনে হয় এবং স্বভাবতঃ তারা মুসলিম বিদ্বেষী হয়ে পড়ে। এরই সঙ্গে কেন্দ্রীয় মোগল সাম্রাজ্য শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আঞ্চলিক সামন্ত ও হিন্দু শাসকদের বিরোধের যে সব চিত্রই সামনে তুলে ধরা হয় তা-ও ধর্মবিরোধের আকারে তুলে ধরা হয়। এইসব বিরোধকে শাসক সম্প্রদায় সমূহের অভ্যন্তরীণ বিরোধ হিসেবে না দেখে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধ

হিসেবে চিত্রিত করা হতে থাকলো, অথচ একথা পুরোপুরি ভোলা হলো যে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ একান্তভাবেই ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই ফল, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এই ধরণের জাতীয়তাবাদ সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় মুসলিম সামন্ত শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম ও হিন্দু সামন্ত শাসকদের একই সময়ে বিদ্রোহের ঘটনা ও কেন্দ্রীয় মুসলিম শাসকরা একইভাবে হিন্দু ও মুসলিম সামন্তবিদ্রোহকে দমন করেছে; অথচ এইসব বিদ্রোহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইতিহাসে মুসলিম বিদ্রোহকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও, হিন্দু সামন্তবিদ্রোহকে ধর্মীয় বিদ্রোহ হিসেবেই দেখানো হয়েছে, যেন ধর্মীয় অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের জন্যই এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সামন্ত শাসকের শোষণের তীব্রতায় অসন্তুষ্ট জনসাধারণের অসন্তুষ্টির সুযোগে স্থানীয় সামন্তশাসক নিজেকে কেন্দ্র নিরপেক্ষ স্বাধীন শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, কিন্তু তারও উদ্দেশ্য বাধাহীন সামন্ত শোষণ, ধর্মীয় আবেগ নয়; একইভাবে মুসলিম কেন্দ্রীয় শাসনের বাধা দেওয়ার কারণও শোষণের সুযোগ সৃষ্টির প্রশ্নে, ধর্মীয় বিরোধ থেকে নয়। বৃটিশ শাসনের পূর্ববর্তী মোগল শাসনের দীর্ঘযুগ ধরে মোগল শাসনে গড়ে ওঠা অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধ, বিরোধের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ লক্ষ্য করলেই খুব এটা স্পষ্ট হবে যে, এই বিরোধ ধর্মীয় প্রেম বা বিদ্বেষ থেকে নয়, অর্থনৈতিক এবং শোষণের তারতম্য থেকেই। মারাঠা বা রাজপুত শাসকদের সংগে মোগল শাসকদের বিরোধের কারণও এই অর্থনৈতিক শোষণের ভাগ বাটোয়ারা থেকেই; ধর্মীয় বিরোধ থেকে নয়। মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের ধর্মীয় ব্যাখ্যার উদাহরণ স্যর যদুনাথ সরকারের 'শিবাজী'র ইতিহাস থেকে দেওয়া যেতে পারে। শিবাজীর উত্থান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য:

> শিবাজীর উত্থানে মাবলে জমিদার ও বলিষ্ঠ কৃষকদের পক্ষে সমস্ত দাক্ষিনাত্য ব্যাপিয়া কার্যক্ষেত্রের পরিসর বাড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে অর্থ সম্পদ ও খ্যাতি লাভের বহুসুযোগ জুটিল। শিবাজীর যুদ্ধ ও লুণ্ঠনে সহকারী হইয়াই এই কোমরাণা গরীব প্রজা লোকেরা সেনাপতি ও সম্ভ্রান্ত পুরুষের পদে উঠিতে পারিল। সুতরাং তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার রাজ্যাভিযানের সংগে একসূত্রে বাঁধা হইল। [১৫]

ভারত ইতিহাসের মধ্য যুগে যখনই বিরাট ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছে কোন কারণে তখনই শক্তিমান ভাগ্যান্বেষী কোন পুরুষ সেই অবস্থার সুযোগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে ও করেছে। উদ্ধৃত অংশ থেকে শিবাজীকেও তেমনি একজন ভাগ্যান্বেষী মনে হয়। লেখক লিখছেন: 'স্বাধীন রাজা হওয়া তাঁহার জীবন প্রভাতের এক মাত্র ইচ্ছা ছিল' এবং সেই সংগেই যোগ করেছেন:

> স্বাধীন জীবনের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল; কোন মুসলমান রাজার অধীনে সেনাপতি হইয়া অর্থ ও সুখ ভোগ করাকে তিনি দাসত্ব বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিলেন। [১৬]

এই কল্পনা করেই লেখক ইংরেজ রাজত্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম বিদ্বেষের মনোভাবকে শিবাজীর মনোভাব হিসেবে দেখালেন; যদিও তথাকথিত ধর্মদ্বেষী ঔরংজেবের শাসনেও হিন্দু মুসলিম ধর্মীয় বিদ্বেষের ভাব ছিল না, ঔরংজেব-এর শাসনেও কোন ধর্মীয় সংঘর্ষ ঘটে নি। তিনি লিখেছেন 'সমস্ত হিন্দু জাতিকে উদ্ধার বা রক্ষা করার ইচ্ছা' তাঁর মনে স্থান পেয়েছিল। অথচ এই লেখকই শিবাজীর বার বার সুরাট কর্ণাটক বা অন্যত্র লুণ্ঠনের যে বীভৎস বর্ণনা দিয়েছেন

সংগ্রহের জন্য হিন্দুধর্মের মানুষদেরও রেয়াৎ করেন নি ; অথবা বিশ্বেশ্বর ভট্টকে মোটা দক্ষিণা দিয়ে যেভাবে নিজের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করে রাজ্যাভিষেক করেছেন তাতে তাকে হিন্দুধর্মের রক্ষক ভাবার কোন ক্ষরে কারণ নেই । আবার এই লেখকই শিবাজীর রাজ্যের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বিরোধের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেন এবং এ ব্যাপারে শিবাজীর পর্বে যখন ব্রাহ্মণদের বিরোধ বাঁধলো এবং ব্রাহ্মণরা শিবাজীর ক্ষত্রিয়ত্ব অস্বীকার করে বসলো এবং 'হিন্দুধর্মের রক্ষক' শিবাজী সমস্ত ব্রাহ্মণ উচ্চ কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করতে চাইলো, তখন তার কোন ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিতে না পেরে নিশ্চুপ থাকেন ।[১৭] এই লেখক বারাদের সম্পর্কে লিখেছেন :

> সে যুগের সমাজের অবস্থা এবং লোকের মনের প্রবৃত্তি যেরূপ ছিল তাহাতে জাতি অপেক্ষা নিজ বংশ, স্বদেশ অপেক্ষা পৈতৃক জৌহরী অধিক বেশী মূল্যবান বলে বোধ হইত । দেশের রাজা ও রাজবংশের ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে অনেক স্থলে জমির স্বত্ব বড় অনিশ্চিত এবং গোলমেলে হইয়া উঠিয়াছিল ; একই গ্রামের উপর অধিকার দাবি করিত, তিন চারজন দাবিদার (যথা, দেশাই, মনবী, অবশ্য - তাহা ছাড়া দেশের রাজা) এবং পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া অথবা বিদেশী আক্রমণকারীর পক্ষে যোগ দিয়া নিজ অধিকার স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিত, স্বজাতীয় রাজা বা দেশের বিচারালয় এই ব্যক্তিগত স্বার্থের সহায়ক না হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ত্যাগ করিয়া দেশের শত্রুকে ডাকিয়া আনিত । .... নিজের বংশের বা জাতের স্বার্থ অপেক্ষা দেশের হিত যে বড় তাহা রাজা-প্রজা উচ্চ-নীচ কেহই বুঝিত না, ভাবিত না । সকলেরই চেষ্টাই সকলেরই চেষ্টা নিজ ধন

ও বল, মর্যাদা ও সামাজিক পদ বৃদ্ধি করা, তাহা স্বরাজ্যেই হউক, আর পরাধীনতা স্বীকার করিয়াই হউক [১৬] ~~মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যথার্থ চিত্র এতে হিন্দু~~

মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যথার্থ চিত্র; এতে হিন্দু দেশপ্রেম যুক্ত করা অনৈতিহাসিক, মারাঠা রাজপুত সবার সম্পর্কেই একথা সত্য। শিবাজী কর্তৃক কর্মচ্যুতির ইন্ধন কারণ অবশ্যই রাজার সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপের আশংকায়; কিন্তু এই ব্যাপারটি কোন মুসলিম নরপতি করলে তা অবশ্যই হিন্দু ধর্ম বিদ্বেষ হিসেবে দেখা দিত। রাজপুত মোগলের বিরোধও অনৈতিক অনুরূপ কারণ থেকেই দুটি সামন্ত শাসকের বিরোধ, ধর্মের সংগে এর কোন বড় সম্পর্ক ছিল না। বৃটিশপূর্ব যুগে যে হিন্দু মুসলিম বিরোধ ছিল না তার প্রমাণ মেলে এমন কি সিপাহী বিদ্রোহে সেনা ও ~~[illegible]~~ সেনাপতিবিন্যাস দেখেও, হিন্দু মুসলিম সম্মিলিত হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে মুসলিম মোগল বাহাদুর শাহকে নবাব করার জন্য। কিন্তু বৈদিক ভারতবর্ষই ~~স্বর্ণযুগ এবং~~ ভারতবর্ষের সুবর্ণযুগ এবং মুসলিম শাসনে তা বিপন্ন ও নষ্ট হয়েছে ঐ ধারণা থেকে মধ্যযুগের কেন্দ্রীয় সামন্তশক্তির সংগে প্রাদেশিক সামন্তশক্তি মারাঠা বা রাজপুত শাসকের বিরোধকে হিন্দুর জাতীয় অভ্যুত্থান হিসেবে ইতিহাসে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু পুনরুত্থানের আস্তিক বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এইসব মারাঠা বা রাজপুত চরিত্রকে নিয়ে হিন্দু পুনরুত্থানের স্বপ্নকে রূপায়িত করেছে সাহিত্যে, ইতিহাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসের ক্ষেত্রেই এই ভাবনা ছড়িয়ে আছে। ইংরেজের ছত্রছায়ায় বর্ণীয় আর্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধির ভিতর দিয়ে ভবিষ্যতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন এবং ইংরেজ শাসনকে 'বর্ণীয় আর্য'-র বিকাশ ও সমৃদ্ধির

অন্য একটি বর্ণবহির্ভূত স্তর হিসেবে তাঁরা গণ্য করেছিলেন। আনন্দমঠে এইজন্যই সন্তানরা ইংরেজ রাজত্বকে মিত্ররাজ্য মনে করেছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়, বঙ্কিম উপন্যাসে সমস্ত দেশপ্রেমিক চরিত্রই 'আর্য' হিন্দু, কেউই 'অনার্য' নয়।

হিন্দুদের বাহুবল প্রতিপন্ন করতেই বঙ্কিম রাজসিংহ উপন্যাস লিখেছিলেন লিখেছেন ; বলেছেন, 'যখন বাহুবল মাত্র প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে'।[?] কিন্তু শুধুমাত্র বাহুবল প্রতিপন্ন উদ্দেশ্য হলে বঙ্কিম চন্দ্রগুপ্তকে নিতে পারতেন বা মুসলিম পূর্ববর্তী যে কোন বীরকে গ্রহণ করতে পারতেন, যেখানে ইতিহাসের আলোকাভাবে তার কল্পনা আরও বেশী পাখা মেলতে পারতো। এমন কি, বঙ্কিম তাঁর সমকালীন সিপাহীবিদ্রোহের কোন হিন্দু বীরকে নিয়েও হিন্দুর বাহুবল দেখাতে পারতেন ; কিন্তু দেখান নি। কিন্তু বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসের পটভূমির দিকে লক্ষ করলেই আমরা দেখবো যে সচেতনে বঙ্কিম মুসলিম পূর্ববর্তী কোন চরিত্র বা পটভূমিকাই তার উপন্যাসে গ্রহণ করেন নি ; কেননা সেরকম চরিত্র ও পটভূমি গ্রহণ করলে মুসলিম শাসনে প্রাচীন ভারতের গৌরব নষ্ট হয়েছে, হিন্দু ধর্ম সভ্যতা নষ্ট হয়েছে বা তুলনায় হিন্দু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা দেখানো সম্ভব নয়। ঐ জন্যই তিনি চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্তে রাজপুতানার ক্ষুদ্র ভূস্বামী রাজসিংহকে গ্রহণ করেন, ঔরঙ্গজেবকে করেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা যদিও, কিন্তু ইতিহাসে হিন্দুদ্বেষী হিসেবে যে তিনি চিত্রিত। শিবাজীর 'চৌথ' সম্পর্কে আমরা নীরব থাকতে পারি, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের জিজিয়া? অথচ বারবার ও অন্যান্য যুদ্ধে শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করার প্রয়োজনেই এই কর বসানো হয়েছিল, তাও ব্রাহ্মণ, সৈন্য, নারী, শিশু, খঞ্জ পঙ্গুকে বাদ রেখে ; এরই পাশাপাশি শুধুমাত্র মুসলমানদেরও 'জাকাৎ' কর দিতে হতো। এমন কি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান শাসকরা তাদের

মুসলমান প্রজাদের উপরেও জিজিয়া কর বসাচ্ছেন।[৯৯] সুতরাং হিন্দু-গরিষ্ঠ দেশে বেশী রাজস্ব প্রয়োজনেই এই কর বসানো, সামন্ততান্ত্রিক শোষণে বিপর্যস্ত কৃষক ও কারিগরকে শোষণের একটি উপায়মাত্র, অন্যান্য শোষণের মতোই; এর সংগে ধর্ম বিরোধের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ভারত ইতিহাসে জিজিয়া কর বসানোর জন্য ঔরংজেব হিন্দুধর্মবিদ্বেষী হিসেবেই পরিচিত এবং লেখক সেজন্যই তাকে গ্রহণ করেছেন। হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ব্যাপারেও ঔরংজেব উদ্যোগী হয়েছিলেন, যদিও ঐতিহাসিক বক্তব্য তা ধর্মবিরোধের জন্য নয়, মন্দিরগুলো ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের ঘাঁটি হয়েছিল বলে।[১০০] কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হর্ষ অর্থের জন্য দেবমন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন একথা আমরা আগেই বলেছি। যাই হোক, হিন্দুধর্মবিরোধী হিসেবেই ঔরংজেব চিত্রিত ইতিহাসে এই সবের জন্য এবং ঔরংজেব সম্পর্কে লেখকের আকর্ষণও এই কারণে। লেখক উপসংহারে লিখছেন: 'অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে - হিন্দু হোক, মুসলমান হোক - সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই - হিন্দু হোক, মুসলমান হোক - সেই নিকৃষ্ট। ঔরংজেব ধর্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্মিক, এইজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত ও পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন।'[১০১] লেখকের এই বক্তব্য [illegible] অনুসরণে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যগুলির উত্থানপতন বিচার করলে পৃথিবীর ইতিহাসের ব্যাখ্যা পাল্টাতে বাধ্য। আর একই বিচারে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন, তাদের সমস্ত অত্যাচার বর্বরতা মনে রেখেও, 'ধর্মযুক্ত' মানুষের কাজ হিসেবেই বিবেচিত হবে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যায় আপত্তি নেই, চন্দ্রশেখর উপন্যাসে ওয়ারেন হেস্টিংসের গুণগানও অনুরূপ কারণেই তিনি ব্যক্ত করেছেন। মুসলিম ধর্মের প্রতি প্রতিহিংসা-

গোঁড়ামি ও হিন্দুধর্ম বিদ্বেষ - এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ঔরংজেব চরিত্র ও তার যাবতীয় দুষ্কর্মের ব্যাখ্যা। যার জন্য লেখকের গল্পের সম্ভাবনাও এই মনোভাবের মধ্যে নিহিত ; ঔরঙ্গজেব-এর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই চঞ্চলকুমারী এই হিন্দুধর্মের চরম শত্রুর চিত্র পদদলিত করে আর তারই ফলশ্রুতিতে ক্রমশঃ গল্প এগিয়ে চলতে থাকে। কিন্তু লেখক তার এই চরিত্র ব্যাখ্যার একটি সম্ভাবনার কথা মনে রাখেন না বা প্রয়োজন বোধ করেন না যে ঔরঙ্গজেব সত্যিই যদি [illegible] গোঁড়া মুসলিম হন এবং মুসলিম ধর্মের গোঁড়ামী থেকেই তার যাবতীয় হিন্দুবিদ্বেষ জন্মে, সে গোঁড়া মুসলিমদের অবশ্যই তাতে অনুমোদন থাকবে এবং গোঁড়া মুসলিম ঔরঙ্গজেবের চিত্রকে পদদলিত করায় ঔরঙ্গজেবের মতো তাদেরও ক্রোধ ও ঘৃণাকে উদ্রিক্ত করবে। ধর্মের গোঁড়ামি ও বিদ্বেষকে ঔরংজেব চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু কি ভাবে করা হয়েছে দেখা যাক :

> হিন্দুর অনিষ্ট করিতে তাঁহার জন্ম, হিন্দুর অপরাধ বিশেষ প্রশস্ত। এক হিন্দু মহারাজা পুনঃ পুনঃ অপমান করিয়াছে, আবার রাজপুত অপমান করিল। মহারাষ্ট্রীয় বড় কিছু করিতে পারেন নাই, রাজপুতের সম্বন্ধে কিছু করিতে পারিতেছেন না। অতএব বিষ উদ্গীরণ করিতে হইবে। অতএব রাজসিংহের [illegible] অপরাধে সমস্ত হিন্দুজাতির উপরই প্রযুক্ত করিলেন। .... ইতিপূর্বেই বাদশাহ, জেজেয়ার পুনরাবির্ভাবের আজ্ঞা প্রচারিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। হিন্দুরা ভীত, অত্যাচারগ্রস্ত, মর্মপীড়িত হইল। [illegible] ক'রে সহস্র সহস্র হিন্দু বাদশাহের নিকট দরখাস্ত করিল, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের দয়া ছিল না। শুক্রবারে যখন বাদশাহ মসজিদে ঈশ্বরকে ডাকিতে যান, তখন লক্ষ লক্ষ

হিন্দু সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট রোদন করিতে লাগিল। দুনিয়ার বাদশাহ দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত আজ্ঞা দিলেন, 'হস্তীগুলা পদতলে ইহাদিগকে দলিত করুক।' সেই বিষম জনসম্মর্দ হস্তি পদতলে দলিত হইয়া নিবারিত হইল।

..... ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুতীর পর্যন্ত হিন্দুর দেবপ্রতিমা চূর্ণীকৃত, বহুকালের গগনস্পর্শী দেবমন্দির সকল ভগ্ন ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তাহার স্থানে মুসলমানের মসজিদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির গেল; মথুরায় কেশবের মন্দির গেল; বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর যাহা কিছু স্থাপত্য কীর্তি ছিল, চিরকালের জন্য তাহা অন্তর্হিত হইল।

..... বাদশাহ রাজসিংহের উপর আজ্ঞা প্রচার করিলেন, জেজেয়া দিতে হইবেই, তাহা ছাড়া রাজ্যে গোহত্যা করিতে দিতে হইবে, এবং দেবালয় সকল ভাঙ্গিতে হইবে। [১৭২]

বলাবাহুল্য এটা ইতিহাস নয়, ইতিহাসের বিকৃতি মাত্র; যে মনোভাব থেকে হিন্দু কলেজের মুসলিম ছাত্রকে 'মহম্মদের ঘোড়া' বলা হয়েছিল, ঘোড়ার সংগে তুলনা করা হয়েছিল, সেই মনোভাবই এখানে ঔরঙ্গজেবের চরিত্র চিত্রণে প্রকাশিত। কিন্তু চঞ্চলকুমারীর ' চিত্রদলনের' প্রতিক্রিয়া হয় উল্টো দিকে যখন রূপনগরের রাজা বিক্রম সোলাঙ্কির কাছে চঞ্চলকুমারীর পাণি গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে পত্র পাঠালেন তখন রূপনগরের যে চিত্র আঁকলেন তাতে ইতিহাসের ছবিই পাই, হিন্দু প্রতিক্রিয়া অনুপস্থিত:

রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজগণ মোগল বাদশাহকে কন্যা দান করা অতি গৌরবের সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সে স্থলে রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবী রাজার যে অদৃষ্টে এই শুভ ফল বড়ই আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল। বাদশাহের বাদশাহ – যাঁহার সমকক্ষ মনুষ্যলোকে কেহ নাই – তিনি জামাতা হইবেন, চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন – ইহার অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রজাবর্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। রাণী দেবমন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিলেন; রাজা এই সুযোগে কোন্ ভূম্যধিকারীর কোন্ কোন্ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন, তাঁহার ফর্দ করিতে লাগিলেন।[১০৩]

এই পরিপূর্ণ উৎসাহচিত্তের মধ্যে কেবল চঞ্চলকুমারীর সর্বাঙ্গ নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে, এ সম্বন্ধে মোগলদ্বেষিণী চঞ্চলকুমারীর সুখ নাই।[১০৪] এই পরিপূর্ণ মোগলপ্রীতির পরিবেশে একটি মোগল বাদশাহের মেয়ে তাও কেন 'মোগলদ্বেষী' এ কেনের কোন ব্যাখ্যা লেখক দেন না। একইভাবে বঙ্কিম রাজপুতনার রাজন্য বর্গের মধ্যে একমাত্র রাজসিংহই বা কেন হিন্দুধর্ম রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ [illegible] বা ভিক্ষুক হিসেবে, কেন বা তথাকথিত হিন্দুধর্মের ধ্বংসকারী ঔরঙ্গজেবের সংগে সংযুদ্ধে আবদ্ধ হন, অথবা হিন্দুধর্মরক্ষক রাজপুতদের সহযোগী নয় কেন, তার ব্যাখ্যাও লেখক করেন নি:

> দক্ষাল বাবা বলিলেন, '.... এই মহাপাপিষ্ঠ পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ ঔরঙ্গজেবকে বধ করিলে পৃথিবীকে পুনরুদ্ধার করা হইবে। এমন পুণ্য আর কোন কার্যে নাই, মহারাজ মতান্তর করিবেন না।

> রাজসিংহ বলিলেন, 'সকল মোগল বাদশাহই দেখিলাম - পৃথিবীর কণ্টক । ঔরংজেব শাহজাঁহার অপেক্ষাও কি নরাধম ? মুসলমান হইতে আমাদের যত অবনতি ঘটিয়াছে, ঔরংজেব হইতে কি তত হইয়াছে ? ...
>
> দয়াল শাহ বলিলেন, 'মহারাজ, সমস্ত রাজপুতানা একত্র হইলে মোগলকে সিন্ধু পার করিয়া রাখিয়া আসিতে কতক্ষণ লাগে ?'
>
> রাজসিংহ বলিলেন, 'সে কথা সত্য । কিন্তু তাহা কখনও হইয়াছে কি ? এখনও তো সে চেষ্টা করিতেছি - ঘটিতেছে কি ? তবে সে ভাবনা কি প্রকারে করিব ?'[১১৫]

এইভাবেই তিনি দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের মানুষকে মুখোমুখি দাঁড় করালেন এবং দ্বন্দ্বের সমাপ্তিও ঘটালেন পরিপূর্ণভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষ দিয়েই :

> ...রাজমন্ত্রী দয়াল সে প্রকৃতির লোক নহেন । তিনিও দুর্দম পুরুষ । আনন্দে মুসলমানের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন । ঔরংজেব হিন্দুধর্মের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল । প্রতিশোধের মুখে ইনি কাজিদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলেন । কোরাণ দেখিলেই কূপে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন ।[১১৬]

এইভাবে লেখক হিন্দুধর্মের প্রতি অত্যাচার দিয়ে গল্প শুরু করলেন এবং মুসলিম ধর্মের প্রতি অত্যাচার দিয়ে গল্প শেষ করলেন । দ্বন্দ্বের এই বিশিষ্ট গঠনের সংগে সংগে লেখক উপন্যাসের বিভিন্নধর্মী পাত্রপাত্রীদের চরিত্রগুলোকে এমনভাবে গড়ে তুললেন যাতে তুলনায় হিন্দু চরিত্রগুলোকে মহত্তর মনে হয় । এই মনোভাব যে চরিত্র চিত্রণের সময় লেখকের মনে ক্রিয়া করেছে তার প্রমাণ লেখকের মন্তব্য থেকে পাওয়া যায় । লেখক মন্তব্য করেছেন : 'রাজা যেরূপ হয়েন, রাজানুচর ও

রাজদৌবল্যজন প্রবৃত্তির সেইরূপ হয়। উদীপুরী ও চঞ্চলকুমারীর তুলনায়, জেবউন্নিসা ও নির্মলকুমারীর তুলনায়, মানিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা যায়। ঔচিত্য এ সকল কল্পনা।'[107] দুটি সাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থার মানুষের জীবনযাত্রার প্যাটার্নে ও মূল চিন্তাধারায় যে ভিন্ন থাকবে একথা ভুলে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] নিয়ে তাদের জীবনে নিযুক্ত আছেন এবং হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ এই ধারণা থেকে হিন্দু চরিত্রের জীবনের প্যাটার্নে ঐতিহ্যিক শতাব্দীর প্রচলিত হিন্দু ধারণা অনুযায়ী রূপকল্প দিয়ে গেছেন। তেমনই ড. [illegible] শিকদার যখন বলেন 'চঞ্চলকুমারী [illegible] বা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের একটি অংশ হিসেবে দেখা হয় নি'[108] তখন সেকথা মেনে নিতে অসুবিধে হয়, কেননা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে কিছুটাই উপন্যাসের মেরুদণ্ড হিসেবে [illegible] উপন্যাস-কাহিনীকে গঠন করে গেছে।

রাজসিংহ উপন্যাসের মূলকাহিনী ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহের বিরোধ ও এই বিরোধের প্রধান কারণ চঞ্চলকুমারীর ঔরঙ্গজেবকে অপমান ও রাজসিংহের চঞ্চলকুমারীকে বরণ, যুদ্ধের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য মোগলদের জিজিয়া মন্দির ধ্বংসের আদেশ ইত্যাদি কারণগুলোও যোগ করেছেন। মূলকাহিনীর সূত্রে কয়েকটি গৌণ কাহিনী উপন্যাসে স্থান করে নিয়েছে — মবারক-দরিয়া-জেবউন্নিসা কাহিনী এবং মানিকলাল-নির্মলকুমারীর কাহিনী। মবারক-দরিয়া-জেবউন্নিসার প্রেমকাহিনী বিচ্ছিন্নভাবে মনোজ্ঞ হলেও মূল কাহিনীর সঙ্গে তা মূলত সংযোগহীন, কেননা জেবউন্নিসাকে বাদ দিয়েও উপন্যাসে মূলকাহিনীর সঙ্গে মোবারক যুক্ত হতে পারতো, লেখক অবশ্য জেবউন্নিসার প্রেমের অনুরূপ মোবারকের মৃত্যু ও মানিকলাল কর্তৃক তার পুনর্জীবন প্রাপ্তির ব্যাপারটিকে গল্পের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন, কেননা মোবারক গোপনে সদাশয়ের ছদ্মবেশে ঔরঙ্গজেবকে ভ্রান্তপথ দেখিয়ে রাজসিংহের বিজয়ে

সাহায্য করে, আর অন্যদিকে স্বার্থ খুঁজে উৎসাহ দরিয়ার সাহায্যে লেখক মোবারকের পরিণতি ডেকে আনেন। তবুও এই পর্বের সুযোগেই লেখক মোগল শাহজাদীর কুটিল-কামুক চরিত্রকে স্পষ্ট করার সুযোগ নেন যাতে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তার একটা প্রতিতুলনা পাঠকের মনে জাগে। অন্যদিকে মানিকলাল নির্মলকুমারী ইত্যাদি হিন্দু চরিত্রের মধ্যে একটা প্রতিতুলনার সুযোগ করে দেন। কিন্তু উপন্যাসের জন্য উপকাহিনীটি - মানিকলাল নির্মলকুমারী - উপন্যাসের মূল কাহিনীর মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, রাজসিংহের চঞ্চলকুমারী হরণে সাহায্য বা চঞ্চলকুমারীর প্রতিজ্ঞা রক্ষায়, এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হলে রাজসিংহের সঙ্গে তার বিবাহ হবে না একথা আমাদের মনে রাখতে হবে, এই চরিত্র দুটি অনিবার্যভাবে আবশ্যক ছিল। কিন্তু এখানেও, উপন্যাসের প্রয়োজন ছাড়াও, প্রতিতুলনার নিপুণতায় লেখকের মন কাজ করেছে: মানিকলাল ধর্মভীরু ক্ষত্রিয় সামন্ত প্রভুভক্তির আদর্শ ও শৌর্যের নিদর্শন, সাহসিক অভিযানের চাতুর্যের দৃষ্টান্ত, মুসলিমের বিরুদ্ধে তার শত্রুতা। অন্যদিকে, নির্মলকুমারীও মুসলিমের প্রতিরোধে উজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে তুলনায় দুর্বল ও ঘটনাবহুল এই উপন্যাসে লেখক দুর্বোধ্য ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে কাহিনী গড়ে তুলেছেন বটে, কিন্তু যে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ঘটনার টানাপোড়েনে ইতিহাসের ঘটনাবলী গড়ে ওঠে ও ইতিহাস ও চরিত্রকে প্রভাবিত করে সেই অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক টানাপোড়েন থেকে ঘটনা গড়ে না উঠে শুধু ব্যক্তির মান অপমান ঈর্ষা দ্বেষের প্রতিক্রিয়ায় ঘটনা গড়ে ওঠে বলে, ঘটনাগুলো শুধু ঘটনাই থেকে যায়, কোন ঐতিহাসিক বিস্তৃতি লাভ তার ঘটে ওঠে না।

অবশ্য ইতিহাসের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণার জন্যই - 'ঔরঙ্গজেবের অধর্মই তাই তাহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল' - এছাড়া ভিন্ন পথ তাঁর ছিল না। তবুও আরো স্পষ্টভাবে বলা চলে যে, এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণার

সাহায্যেই তিনি তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী উপন্যাস গড়ে তুলতে পেরেছেন । তবে এই বিশেষ বক্তব্য প্রমাণ করতে গিয়েই তাঁর পক্ষে বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য ঘটনা একাকার হয়ে যায়, দুটোর ভেতরে কোন পার্থক্য তাঁর চোখে পড়ে না । তাই শৈবলিনীর মতো চরিত্রের উন্মাদিনীর কথায় বিশ্বাস ও বিচলিত হওয়া, নির্জন স্বামীর প্রতি প্রেম নিবেদন তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়; একদিকে তিনি শৈবলিনীকে পৌরাণিক নিষ্ঠার বিদ্রোহী করেছেন আবার তারই মাধ্যমে তার কেমন পুজো আদায় করেন এমন একটা নির্ণয় দেন । তেমনি এই সুযোগে তিনি উপন্যাস বক্তব্য প্রকাশ করবার সুযোগ পেন এই চরিত্রকে দিয়ে এবং শৈবলিনীর যে তার অতীতের দুঃস্বপ্ন বাইরে থেকে আনুকূল্য পাই হয়, ভিতর থেকে, একেবারে পাঠককে দেবার সুযোগ পান । তাই এই চরিত্রের জন্যই নির্জন স্বামীর বিন্দুর কথায় তৈলঙ্গ যোগবলে অবস্থান ও উন্মাদিনীকে তিনি দেবতার আশ্বাসী করে দেন । অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনার মাধ্যমে তিনি ঘটনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন, যেমন শৈবলিনীর লোকালয়ের দুজনের সাক্ষাতে চন্দ্রশেখরের উপস্থিতি বা নিষ্ঠার দরিয়ায় লোকালয়ের হত্যা, দরিয়ার বুকুরে থেকে যোগবলে অমানি ধরো অবস্থান, অলিকলাদের গোপন কেনার পোশাক হরণ ও গোপন কেনার মতো আকস্মিক ঘটনাদি অনেক ঘটনাই যা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না । তাছাড়া অন্য কথার মুক্ত উন্মাদিনী তোমার কেউ না দিলে ব্যাধিগ্রস্ত চন্দ্রশেখর স্বামীর দিয়ে বলে না এই সংবাদ ও উন্মাদিনীর আচার ব্যাধির একটাই বিশ্বাসের অযোগ্য কাহিনী । কিন্তু [illegible] চন্দ্রশেখর স্বামীর চিত্ত দমনের ভেতর দিয়ে যে কাহিনীর তিনি সূচনা করেছেন, ঘটনার দুর্লভিক ভেতর দিয়ে শৈবলিনীর পরাজয় ও পরিণতে তিনি যে কাহিনীকে শেষ করেছেন এবং কাহিনীর এই দুর্লভ্যতাই পাঠককে বিশ্বাস অবিশ্বাসের অবসর না দিয়ে ঘটনাকে শেষ

পর্যন্ত টেনে নিয়ে এবং লেখক তাঁর উদ্দেশ্যটি জন লাভ করেন। উপন্যাসের কাহিনী গঠনের পটভূমি আমরা দেখেছি, বিপরীত চরিত্রগুলোর পারস্পরিক প্রতি-তুলনা থেকে লেখকের উদ্দেশ্যটি আরও স্পষ্ট হবে।

ঔরংজেব ও রাজসিংহ দু'জনাই বড় যোদ্ধা বা শৌর্যের দিক থেকেই তাও কিছু নয়, তারা উভয়ে সম্পূর্ণভাবে বিপরীত চরিত্রের। রাজসিংহ সুদক্ষ কুশলী বীর, উদার মহানুভব ও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অন্যদিকে ঔরংজেব উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছেন ধর্মান্ধ হিন্দুবিদ্বেষী, কুটিল, ক্রূর, নারী সম্পর্কে লালসাপূর্ণ স্বভাব, এমনকি, সুদক্ষ কুশলী বীরও নয়। মবারককে পরাজিত করে চঞ্চলকুমারীকে উদ্ধার বা ঔরংজেবের বিরাট সৈন্য বাহিনী সত্ত্বেও তাঁকে পার্বত্যভূমিতে ফাঁদে ফেলে পরাজিত করার ক্ষেত্রেই রাজসিংহের বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা, রণচাতুর্য প্রকাশিত। ঔরংজেবকে অন্য দিকে এই যুদ্ধের সময়েই শক্তির বহুলব্যবহারহীন ঔরংজেবের চিত্র পাই, তিনি নিজে পথের খোঁজ করছেন যে পথে সৈন্যদের নিয়ে এসেছেন তা থেকে বেরোবার কোন পথ আছে কিনা। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের ঔরংজেব আর উপন্যাসের ঔরংজেবে পার্থক্য অনেক। নারীর সম্ভ্রম রক্ষায়, শ্রদ্ধার স্বীকৃতি দানে, শত্রুকে ক্ষমার ক্ষেত্রেও রাজসিংহ প্রশংস্য। চঞ্চলকুমারীকে উদ্ধার, বিবাহ প্রস্তাবে তার ও তার পিতার সম্মতির জন্য অপেক্ষা, মবারকের প্রেম ও দরিয়ার সম্পর্কে তা বজায়, নারী শ্রদ্ধার আবেদনে বিজয় অভিযান স্থগিত, যুদ্ধের সময়েও সৈন্যদের সম্পর্কে সহৃদয় পৌরুষ এবং এ ব্যাপারে তার প্রমাণ। অন্য দিকে, আপন ভাইয়ের বিধবাকে আত্মসাৎ, বিবাহিতা নারী জেনেও চঞ্চলকুমারীকে প্রেম নিবেদন, নিজ আত্মজা মোবারককে হত্যার সকলের আদেশ দান, শিবিরেই সৈন্যদের সম্পর্কে অবজ্ঞা, আচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে দিয়ে রাজসিংহের ঠিক বিপরীত চিত্রই এখানে প্রকাশিত। রাজসিংহ যেখানে

চরম হিন্দুবিদ্বেষী ঔরংজেবকেও দয়ায় ও করুণায় সাগর বানিয়েছেন আর ঔরংজেব আর্ত হিন্দুপ্রজাদের শাস্তি দিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছেন। 'রাজা যেরূপ হবেন, রাজানুচর ও রাজপরিজন প্রকৃতিও সেইরূপ হয়' - এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অন্যান্য চরিত্রও চিত্রিত হলো। তারাও অনুরূপভাবে বিপরীত ধর্মী চরিত্র হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। চঞ্চলকুমারী ও উদিপুরী এই দুই রাজমহিষীর চরিত্রে এই বিপরীত ধর্মীতা লক্ষণীয়। চঞ্চলকুমারী চরিত্রে চিরন্তন ভারতীয় আদর্শ নারী জীবনের শালীনতায় পরিপূর্ণ; একটি পুরুষকে সে মনে মনে স্বামী হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে এবং তার সঙ্গে বিয়ে না হলে তার মৃত্যুই কাম্য; এমন কি এই শালীনতার বিবাহ হেতু রাজসিংহ তাঁর অপরিচিত নয়, পরাজিত, তাই পিতার সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত সে বিবাহে অনিচ্ছুক এবং বিবাহপূর্বে মনে স্বামীর সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কের কথাও সে চিন্তা করতে পারে না। অন্য দিকে মুসলমান ও হিন্দুস্থানের উদিপুরী স্বামী সম্রাটকেই স্বামী হিসেবে বরণ করে এবং বর্তমান স্বামী সম্পর্কে কোনরকম প্রীতি শ্রদ্ধার বিশ্বাস না রেখে সে আবার গোপনে ও অবাধ সম্ভোগে তাকে গ্রহণ করতে চেয়েছে এমন মুক্ত দেহে পুলকিত হয়। ইন্দ্রিয় লালসা ও ভোগ প্রবণ অনিবার্যভাবে এক নষ্টনারী হিসেবেই উদিপুরী উপন্যাসে চিত্রিত।

অনুরূপভাবে, জেবউন্নিসা ও নির্মলকুমারীর চরিত্রের তুলনা করলেই এই বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যাবে। জেবউন্নিসা নারীজীবনের চরম উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতীক, বিলাসচঞ্চল নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্রস্বভাব চরিত্র হিসেবেই সে এ উপন্যাসে রূপায়িত। জীবনে বহু পুরুষকে সে ভোগ করেছে, কিন্তু তা দেহাসক্তি মাত্র মাত্রই, কোন পুরুষ সম্পর্কে তার ভালবাসা বা মমতা নেই। আত্মসুখ ভিন্ন অন্য কোন নীতি নিয়ম ধর্মে তার বিশ্বাস নেই। মোবারককে সে ভোগ করেছে, [illegible]

এবং যে মুহূর্তে সেভাবে XXXXX ব্যাপারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তেই ক্রুর প্রতিহিংসায় সে তার মৃত্যুর আয়োজন করেছে। তার আকস্মিক পরিবর্তন দেখাবার প্রয়োজনে, ডাকিনীদের মুখের কথার সার্থকতার পুরস্কার হিসেবে মোবারকের জন্য এই পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, উপন্যাসের পরিণতির মুখরক্ষা প্রভাবের জন্যও; নতুবা দীর্ঘদিন ধরে অনুরূপ জীবন ও অনুরূপ প্রতিভার মধ্যে থাকিয়ে রাখা। সাৎ মোবারকের জন্য এই দুশমনী একান্তভাবে চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি নয়। তবুও দরিয়া নির্ভরশীল নারী বঙ্কিমচন্দ্রের নারী জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী; পুরুষের মনে মোহময় প্রভাব, যেখানে বিবাহের প্রতিশ্রুতি বাধাগ্রস্ত করে, উপন্যাসের প্রেমের প্রচারকে সেখানে জীবন করে বিবাহিত হয়; কাজেই দরিয়া কালস্রোতে উপন্যাসের দুর্যোগে সমাজ মুখ দেখায়। আবার নির্মলকুমার বিরহী উপন্যাসের শিল্পে সাংবাদিক আচরণ করে। অনুরূপভাবে, শানিকনাসের ক্ষেত্রে, নবাব প্রত্যুত্তর, উদ্ধত ও কৌশল এবং অহংকারী নারী সম্পূর্ণ পুরুষের ও একনিষ্ঠতা তার স্বভাবসঙ্গত। মোবারক দীর্ঘ দিন অন্দরে, তবে সে পরাজিত ও ব্যর্থ নয়। এই রূপে প্রতিহিংসার তার সুযোগ ঘটে না এবং বিশ্বাসঘাতকতাই করে সে শানিকনাসের প্রতি কৃতজ্ঞতায়। কিন্তু তার চরিত্রের দোষ বিবাহিতজীবনে একনিষ্ঠতার অভাব, নারীলোলুপতায় সে গোপনে গোপন মহলে প্রবেশ করে, বেগমদের সর্বপ্রকার অপমান সে এই লোলুপতার জন্য সহ্য করে এবং এরই কারণে বিবাহিত জীবনের একনিষ্ঠতা হারায়। আর এইভাবে, উপন্যাসের জীবন ও সেই জীবনের রূপায়ণে, উপন্যাসের নায়িকা সংস্থান ও চরিত্র-রূপায়ণের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরলেন, প্রত্যক্ষ এই একটি শ্রেষ্ঠতা তিনি প্রতিপাদন করেছিলেন ধর্মতত্ত্ব বইটিতে। ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে বঙ্কিমের উপন্যাসের পার্থক্য এখানেই যে, এই উপন্যাসে তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বিস্তৃ

হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে আবৃত্ত করেছেন; যদিও স্পষ্টভাবে এই বিরোধ রূপায়িত হয়নি। আর তাই, বঙ্কিমচন্দ্রের দাবি সত্ত্বেও, রাজসিংহকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলার কোন কারণ নেই, কেননা উপন্যাসের প্রাথমিক শর্ত যে বাস্তবতা, যে বাস্তবতার দিক থেকে সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস মূলতঃ অভিন্ন, কেননা 'প্রথমটি বর্তমানের বাস্তবতা বর্ণনায় নিযুক্ত, দ্বিতীয়টি অতীতের বাস্তবতা বর্ণনায় নিয়োজিত'[১১২], সেই বাস্তবতা — আওরঙ্গজেবের রাজপুত-বিরোধের বাস্তবতা — এখানে অনুপস্থিত; পরিবর্তে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের যে বাস্তবতা — যে বাস্তবতার একদিকে আকাঙ্ক্ষা স্বাধীন জীবনের [illegible] প্রতি-শাসনের প্রত্যাশা ও অন্যদিকে বৈষম্যের বিক্ষোভ — সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু-মুসলমানের বাস্তবতাকে বঙ্কিম অতীতে আরোপ করেছেন। এই রাজসিংহ কোন অর্থেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিচয়বাহী নয়। বরং এই দোষ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য [illegible] ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা [illegible] চন্দ্রশেখর ও [illegible] দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে রাজসিংহের কোন মূলগত কোনো পার্থক্য নেই।[১১৩]

৭.

আনন্দমঠ উপন্যাসে স্বদেশিকতা প্রচারিত এ সম্পর্কে দ্বিমত নেই। দ্বিমত আছে স্বদেশিকতার স্বরূপ সম্পর্কে; উপন্যাসে প্রাধান্যভাবে ছড়িয়ে থাকা প্রবল মুসলিম বিদ্বেষকে অনেক সমালোচকই স্বীকার করতে চান না। তাঁরা ধর্মীয় বিরোধ নয়, উপন্যাসে বিদেশী শাসন সম্পর্কে বিরোধই লক্ষ করেছেন। এ সম্পর্কে [illegible]

গ্রহণের পূর্বে আনন্দমঠের স্বদেশিকতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

১. আনন্দমঠে দেশধারণা ও হিন্দুধর্ম ধারণা মিলেমিশে একাকার। প্রথমে 'অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি', 'মা যা ছিলেন' তারপর, 'কালী - অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্ব, এইজন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান - তাই মা কঙ্কালমালিনী।' এই দেখ 'মা যা হইয়াছেন।' তার সবশেষে এক দশভুজা মূর্তি - 'দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত' - 'মা যা হইবেন।' সন্তানদের স্বদেশ দেশধারণা হিন্দু ধর্মধারণার সঙ্গে একাকার হয়ে আছে।[১১১]

২. আনন্দমঠের সন্তানরা সকলেই বৈষ্ণব, শক্তি উপাসক বৈষ্ণব। কেননা 'প্রকৃত বৈষ্ণবের ধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেননা বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা। দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজন্যকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। .... বীরের উপাসনা বৈষ্ণবের দ্বারা - দেবদ্রোহীদের নিধন দ্বারা - আমরা তাহা করি।'[১১২] সুতরাং হিন্দু ধর্মধারণা নয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মধারণার সঙ্গে সন্তানদের স্বদেশিকতার ধারণা জড়িয়ে আছে। কেননা ঐ ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের প্রভুর সমাজের প্রতিষ্ঠিত স্বার্থদের রক্ষাকারী ও পালনকারী বিষ্ণুই সন্তানদের উপাস্য দেবতা।

৩. সন্তানদের দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। 'সন্তান দ্বিবিধ - দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুটের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত, তাহারা সর্বত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্তা।'[১১৩]

৪. এই সঙ্গে সন্তান সম্প্রদায়ের যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত ধ্বনিগুলি ও তাদের দীক্ষার বিষয়টি স্মরণ করতে চাই। বঙ্কিম উপন্যাসে সন্তান সম্প্রদায় পারস্পরিক সাক্ষাতে 'হরে মুরারে' বলে পরস্পরের কাছে পরিচিত হয়েছে, যুদ্ধের সময়ে, সর্বদাই 'হরে মুরারে' বা 'হরি হরি' ধ্বনি দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দীক্ষার সময়েও তারা হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী 'যথাবিধি স্নান, সংযম এবং অনশন' থেকে হিন্দু দেবতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। এবং তারা যে প্রতিজ্ঞার সঙ্গে 'সনাতন ধর্মের জন্য যুদ্ধ অঙ্গীকার করিয়া' যুদ্ধের প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাও রাখে।

উপরোক্ত পরিচ্ছেদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশিকতা ও স্বাধীনতার ধারণা যোগ করলে আমরা আনন্দমঠ উপন্যাসের দীক্ষা সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা করতে পারি। তিনি বলেছেন: 'সমাজের যে অবস্থা ধর্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়।' এবং 'স্বদেশী রাজা অনেক সময় স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশী রাজা অনেক সময় স্বাধীনতার মিত্র।'[১১৪] অর্থাৎ স্বাধীনতা সম্পর্কে আধুনিক ধারণার সঙ্গে বঙ্কিমের ব্যাখ্যাত স্বাধীনতার ধারণার বিরোধ আছে। আধুনিক স্বাধীনতার ধারণা রাজনৈতিক বা বংশের সঙ্গে জড়িত, বঙ্কিমের স্বাধীনতার ধারণার কেন্দ্রবিন্দু অন্য দিকে ধর্ম। বিদেশী শাসন সর্বদাই [illegible] শোষণের মাধ্যম জন্যই মানুষ

বা ত্রিপুর প্রতিষ্ঠা থেকেই বিদেশী শাসনের বিরোধিতা করে, ইংরেজ শাসনকালে বাংলাদেশের অশিক্ষিত কৃষক শ্রেণীর অসংখ্য বিদ্রোহই তার প্রমাণ ; বিশেষ কোন তত্ত্ব প্রতিপাদন বা বিশেষ কোন ধর্মস্থাপনের জন্য এ বিদ্রোহ নয়। অন্য দিকে, বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ধর্মার্থে, সনাতন ধর্মস্থাপনের জন্য। আর সেখানেই সন্তানদের দেশপ্রেমের ভাবনা পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম পরিমণ্ডলে সৃষ্টি হয়েছে, পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের দেবদেবী ও দেশমাতৃকা একাকার হয়ে গেছে। তার পরবর্তী মূর্তিপূজার বিরোধী দেশের অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণ এই দেশপ্রেমের ভাবনা থেকে বাদ পড়ে গেছে। দেশকে জগদ্ধাত্রী কালী ও দশভুজার রূপকে দেখা বা হিন্দু দেবী মূর্তির সামনে হিন্দু প্রথায় শপথ গ্রহণ ইত্যাদি মুসলিম জনসাধারণের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না কেননা ঐ ভাবনা তাদের ধর্মভাবনার বিরোধী। যুগান্তর অনুশীলনের রাজনীতি থেকে আসা বহু সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন সমিতিতে গীতার সঙ্গে আনন্দমঠের স্থান ছিল, আবার সেই গুপ্ত সমিতিতে মুসলমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অন্য দিকে, দেশের অশিক্ষিত সাধারণ হিন্দু, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রভাবে যাদের জীবন এমনিতেও দুর্বিষহ, তাদের পক্ষেও পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম স্থাপনে প্রবল উৎসাহ না থাকাই স্বাভাবিক। বরং, অর্থনৈতিক শোষণের একই জাঁতাকলে পিষ্ট হিন্দু ও মুসলিম কৃষক শ্রেণী সমগ্রভাবে মিলিত হিসেবে বরং আত্মীয়তা অনুভব করেছে বেশী ও একত্রিতভাবে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে। এইসব সাধারণ হিন্দুকে সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা প্রেরণা দেবেনা জন্যই তাদের লুটপাটের লোভের লোভ দেখাতে হয়। সাধারণ সন্তানরা লুটপাটের লোভেই সন্তানদের দলে যোগ দিয়েছিল একথা সত্যানন্দই বলেন। অন্য দিকে দীক্ষিত সন্তান সম্প্রদায়, যাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র, সনাতন হিন্দু

প্রতিষ্ঠার পথ নিয়েই এগোয়; মুসলিমদের আবহমানের যে ভূমিকা ও আকাঙ্ক্ষা সেই একই আকাঙ্ক্ষা ও ভূমিকা পালন করতে চেয়েছে আনন্দমঠের দীক্ষিত সন্তান সম্প্রদায়। আর এখানেই বঙ্কিমের ঐতিহাসিকতার [illegible] বিশিষ্ট ধারণা কাজ করেছে। আমরা আগেই দেখেছি যে মুসলিম শাসনের পতনেই হিন্দু-ধর্মের নবজন্ম সম্ভব এই ধারণা থেকে উনিশ শতকীয় পুনরুত্থানেই প্রবল। হিন্দু ধর্মাশ্রিত দেশীয় ধারা মুসলিম বিদ্বেষ ও প্রতিক্রিয়া হয়ে পড়ে। আর হিন্দুধর্মের উন্নতির প্রাথমিক সোপান হিসেবে মুসলিম ঐতিহ্যের পতন [illegible] স্থাপন ও বৃটিশ বিজয়ও এখানে অনিবার্য [illegible]। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ [illegible] তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ [illegible] গিয়েছে। আনন্দমঠের মহাপুরুষ চরিত্রে এই ধারণা প্রকাশ পেয়েছে:

> প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ... এখন এদেশে অনেকদিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে - কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই - শিখায় এমন লোক নাই; ... ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক শিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ... যতদিন না হিন্দু আবার [illegible] জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।[১১০]

আনন্দমঠের মহাপুরুষের এই বক্তব্য কোন বিচ্ছিন্ন মতবাদ নয়। এরূপ এ মতবাদ স্বয়ং বঙ্কিমের, তাঁর বিভিন্ন রচনায় ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠার অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া হিসেবে 'দেবদ্বেষীদিগের নিধন' প্রশংসনীয় হয়ে পড়েছে। সুতরাং শুধু মুসলিম বিদ্বেষ বিচ্ছিন্নভাবে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। মুসলিম জনসাধারণকে হত্যা। মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘটনা উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক আক্রোশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। কোন কোন সমালোচক আনন্দমঠে বর্ণিত মুসলিম বিদ্বেষকে মুসলমান বিরোধী ব্রিটিশ বিদ্বেষের প্রকাশ করতে গিয়ে আসলে বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকেই নির্মূল করে ফেলেন; সেই সঙ্গে উনিশ শতকীয় হিন্দু পুনরুত্থানের স্বরূপ নির্ণয়েরও বিকৃতি ঘটান। বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষকে স্বীকার করতে গিয়ে সমালোচকদের একথা স্বীকার ভিন্নতা নেই করার কথা। ইতিহাস রচনার উপাদানের জন্যে বঙ্কিমের ছিল না একথা স্বীকার করেই ড. অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন: 'মুসলমান রাজশক্তির দুঃশাসনচিত্র দেখানোও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল' এবং 'মুসলমান রাজশক্তি ও মুসলমান জনসাধারণ তো ঠিক এক নয়, একথা মনে রাখা উচিত।' উনিশ শতকীয় বাঙালীর শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক মনোভঙ্গির কথা স্মরণে রেখেই ড. পোদ্দার বক্তব্যের যাথার্থ্য স্বীকার করতে হবে এবং 'মুসলমান রাজশক্তির দুঃশাসনচিত্র' দেখিয়েই যে ইংরেজ রাজত্বের যাথার্থ্য বঙ্কিম প্রমাণ করতে চেয়েছেন একথাও আমরা আগেই বলেছি। তবে মুসলমান রাজশক্তি ও মুসলমান জনসাধারণ যে ঠিক এক নয় একথা আনন্দমঠ ৫ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র রাজশক্তির চরিত্রেও শাসক পাত্রদের প্রভাবকাজ পাঠে নেই স্বীকার করেছেন, যেমন ইংরেজের ও রাজসিংহ উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক ঘটনা বাংলার রাজশক্তি হচ্ছে ধর্মের ভিন্নতায় তাদের সামাজিক ভিন্নতাও দেখা দিয়েছে, তবে এখানেই

তাঁর মুসলিম ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবও স্পষ্ট । এই মনোভাব নিয়েই 'দেবীচৌধুরাণী' থেকে লিখনের মধ্য দিয়েই ক্রমান্বয়ে আনন্দমঠে 'সনাতন ধর্মকে' শত্রু মুক্ত করার চেষ্টা । অন্যদিকে, ড. অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন : 'ইংরেজ বিরোধী মনোভাব সমসাময়িকের রুচিতে আঘাত করিয়াছে' এবং গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রচলিত সংস্করণের 'যবন নিপাত' 'ম্লেচ্ছ' ইত্যাদির পরিবর্তে প্রথম সংস্করণে 'ইংরেজ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল একথা উল্লেখ করেছেন । কিন্তু ঐতিহাসিক যাথার্থ্যের পটভূমিতেই এই বিতর্ক দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু শব্দের মধ্যেই মাত্র নয় । তাই বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন ইংরেজ সম্পর্কে বিরূপতা থাকতে পারে, অস্বীকার নয়, কিন্তু ইংরেজ আনুগত্যের প্রশ্নে বিরূপতার অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্য ও ঐতিহাসিক ভাবনায় হিন্দু মধ্যবিত্তের ঔপনিবেশিক মনোভাবকেই প্রতিফলিত করা যায় । অতএব, 'ভারতীয় হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের পক্ষে এক জন বঙ্কিমচন্দ্র আমরা পেয়েছি যে জাতীয়তাবাদের জন্ম দেন যা জাতীয়তাবাদ একদিকে যেমন বৃটিশ শাসন নিরপেক্ষভাবে বিরূপ এবং অন্যদিকে তেমন সাম্প্রদায়িক ভাবধারায় পরিপূর্ণ ।'[১১৮] এই বক্তব্যই যথার্থ ঐতিহাসিক সত্য ।

আনন্দমঠ উপন্যাসের শুরু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ দিয়ে দিয়ে । কিন্তু লেখক যে ঐতিহাসিকের দায়বদ্ধতায় নিযুক্ত থাকবেন না তারও প্রমাণ সেই বাস্তব [illegible] বর্ণনাতেই পাওয়া যায় । যে ইংরেজদের লোভ ও শাসনের নিষ্ঠুর দায়ে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মরেছে সেই দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব থেকে তিনি তাদের রেহাই দিলেন, দায় চাপালেন রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী মহম্মদ রেজা খাঁর উপরে, লিখেছেন : 'কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময় সরফরাজ হইব । একেবারে শতকরা দশটাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল । বাংলায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িল ।' এই পরিবর্তনের প্রয়োজন

ছিল । হিন্দু ধর্মের রক্ষক হিসেবে যে বিবেকানন্দকে দেখানো হয়ে থাকে বাংলার এক দুর্ভাগা মানুষের মুক্তার সেবা হিসেবে দেখানো চলে না । বরঞ্চ, মুসলিম বিদ্বেষ প্রকাশের প্রয়োজনে 12 দাঙ্গা বহরমপুর তাঁর উপর চাপানো অভিযোগের দিক থেকেই এ প্রয়োজন । অন্য দিকে, গ্রন্থের প্রতিনায়ক ও 'রুগ্ন জনবান' বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ওরা নির্দেশের কেন্দ্র' বলে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রন্থের বাইরে দিয়ে আসা [illegible] দিক থেকে প্রয়োজন হলেও প্রাসঙ্গিক নয় । বিশ্লেষণের অনুসরণে, যে কোন অনুচ্ছেদেই, নিছক দুষ্ট চরিত্র ও প্রতিনায়ক 'প্রকাশ' হয় না । বাঙালী রাজনীতির দুর্জয় দৈত্যাদি শাসকের এ শহর শাসিত গ্রাম বাংলার মুক্তি হিসেবে প্রয়োজন, কিন্তু বাস্তবের চরম দুর্দৈব পুনরুক্তি বাঁচার প্রয়োজনেই প্রতিনায়কদের পরিচয় বেরিয়ে আসার কথা । কেননা সমকালীন কালে এই বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই শাসিত গ্রামে দুর্ভাগা মানুষ দৈত্যাদি বিভাগে বাংলার শহরের লোক গড়ে উঠেছে, তারা অনাহারে ছিল এ বড় বৈষয়িক দেশ নিয়ে । কিন্তু লেখকের প্রয়োজন তাঁর রাজনৈতিক পার্টির [illegible] দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার [illegible] থেকে দেখানো হয় । বঙ্কিমচন্দ্র কল্যাণীকে [illegible] থেকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজনে ছিল অন্য লেখক [illegible] বিশ্লেষণের নাম নেই হয়েছে । কল্যাণীর এবং তার [illegible] পরে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ কল্যাণী-মুক্তাগাছিতে স্মরণ প্রতীকী রূপে হয় । কেননা যে মানুষ মানুষ তখন এই কন্যাকে বাঁচিয়ে রাখা করতে সেই মানুষ দুটি নিরন্তর মানুষ মুক্তি থেকে আসবেন সম্ভাবনার কথাই প্রকাশ করে দেখা গেছে । মনে রাখতে হবে, মুক্তাগাছীকে আমাদের নিশ্চিত জেনে রাখতে হবে । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কল্যাণীকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজনেই লেখককে এই প্রতিকূল [illegible] প্রকাশ করতে হয় কল্যাণী লেখকের বিপরীত নারীজীবনের পারিবারিক প্রশান্তি করবে আর অন্য দিকে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্থানধর্মের আদর্শ । আর এই বিচ্ছিন্ন করার জন্য কিছু

পরেই তাই বন্দী মহেন্দ্রদিগের উদ্ধারে ভবানন্দ উপস্থিত হন। মুক্তিলাভের পরে ভবানন্দের কথায়ই সন্তান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের প্রয়োজন পাঠক প্রথম জানতে পারে :

> কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে বউ-ঝি রাখিয়া সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশে রাজার সঙ্গে খাজনাদেওয়ার সম্বন্ধ, আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে? [১১৯]

এখানে অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা আছে, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত যায়, কিন্তু অনেক পরে, তার আগে দীর্ঘদিন ধরে অনেক কিছু রয়েছে, অনেক অভিযোগ, কুলমানধর্ম সবকিছু নষ্ট করার অভিযোগ, তাই 'এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?' কথা হচ্ছে এই, যে দেশে এখন নবাবের জীবন পর্যন্ত সর্বদাই বিপন্ন এবং এই সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও অরাজক অবস্থায় ইংরেজের ভূমিকা সম্বন্ধে লেখক এ ব্যাপারে নীরব। তাছাড়া, মুসলিম শাসন সম্পর্কে ইংরেজের নানাবিধ মিথ্যা অপপ্রচার এখানে স্থান পেয়েছে যা মুসলিম শাসকদের অযোগ্যতা ও মুসলমান বিদ্বেষের সহায়ক। অথচ ঐ একই সময়ে বাংলাদেশের কৃষক তাঁতি ইত্যাদি সাধারণ মানুষদের প্রতি ইংরেজ কুঠিয়ালদের অত্যাচার সম্পর্কে উপন্যাস নীরব। অবশ্য হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তার ভক্তি পরিস্ফুট, সর্বত্রই বাঞ্ছনীয়। তাই, ইংরেজের রাজত্ব প্রবর্তনের প্রাক্কালে মুসলিম শাসক যখন সন্দেহবশে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে তখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ইংরেজ ও নবাবের আইন শৃঙ্খলার তুলনা করলেন, 'সে কারাগার অতি ভয়ানক, যে যাইত সে প্রায় বাহির হইত না; কেননা বিচার

করিবার লোক ছিল না। ইংরেজের জেল নয় — তখন ইংরেজের বিচার ছিল না। আজ নিয়মের দিন — তখন অনিয়মের দিন। নিয়মের দিনে আর অনিয়মের দিনে তুলনা কর।'[১২০] এই তুলনা অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধে বারে বারেই করেছেন এবং ইংরেজের শাসনের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করেছেন। এখানেও এই কাহিনীর মাঝে অবশ্য মুসলিম সম্প্রদায়কেই দায়ী করা হলো:

> আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শুয়োর খোঁয়াড় আগুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। ভাই আজ সেইদিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু পরমগুরু, যিনি অনন্ত জ্ঞানময়, সর্বদা শুদ্ধাচার, যিনি লোকহিতৈষী, যিনি দেশহিতৈষী, যিনি সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রচার জন্য শরীর পতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন — যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার স্বরূপ মনে করি, যিনি আমাদের মুক্তির উপায়, তিনি আজ মুসলমানের কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারে কি ধার নাই?[১২১]

তাই, 'সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াই, আমরা যেখানে মুসলমানের গ্রাম পাইতেছি, সেখানেই আগুন জ্বালাইয়া দিল।' শুধু এখানেই নয়, উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে লেখক [illegible] মুসলমানদের অত্যাচারিত হবার বর্ণনা দিয়েছেন, সন্তান সম্প্রদায়ের বর্ণনা এই রকম:

> কেহ গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে, বলে, ভাই, বিষ্ণুপূজা করবি? এই বলিয়া ২০।২৫ জন জড় করিয়া, মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়। মুসলমানেরা প্রাণরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়, সন্তানেরা তাহাদের সর্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে

> বিতরণ করে। লুটের ভাগ পাইয়া গ্রাম্য লোকে তুষ্ট হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিষ্ণুর পাদস্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে। লোকে দেখিল, সন্তানত্বে বিশেষ লাভ আছে। বিশেষতঃ, মুসলমান রাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহচিত্ত ছিল। অতএব দিনে দিনে সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিনে দিনে শত শত মাসে মাসে সহস্র সহস্র সন্তান আসিয়া জীবানন্দ ভবানন্দের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া দলবদ্ধ হইয়া দিগ্দিগন্তরে মুসলমানকে শাসন করিতে বাহির হইতে লাগিল। . . . যেখানে মুসলমানের গ্রাম পায় দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করে।[১২২]

মুসলিম বিদ্বেষ সম্বন্ধে উপরের উদ্ধৃতি যথেষ্ট। নানা গ্রন্থে নানাভাবে লেখক এই বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন। সন্তান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা থেকেই এটা স্পষ্ট যে এই বিদ্বেষ প্রতিষ্ঠিত সন্তান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আর কেউ কেউ মসজিদ ভেঙে রাধামাধবের মন্দির গড়ার চিন্তাও করে।[১২৩] উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডে যুদ্ধে বিজয়ী সন্তান সেনার বর্ণনায় এই বিক্ষোভ ও অত্যাচার লেখক বর্ণনা করেছেন :

> গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে

আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, 'মুই হেঁদু'।

... হিন্দুরা বলিতে লাগিল, 'আসুক সন্ন্যাসীরা আসুক, মা দুর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন আসুক।' মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, আল্লা আকবর। এতনা রোজের পর কোরাণ সরিফ বেবাক কি ঝুটো হলো', মোরা যে পাঁচু ওয়াক্ত নামাজ করি, তা এই তেলক কাটা হেঁদুর দল ফতে করতে নারলাম।[১২৪]

এই বিদ্রোহ যে কোন কাল্পনিক বিষয় নয়, সম্পূর্ণ উপন্যাসের পটভূমি জুড়েই রয়েছে, তা সন্তানদের অধিনায়ক সত্যানন্দের মহেন্দ্রকে বলা কথা থেকেও জানা যায়। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলেছেন: 'আমরা রাজ্য চাহি না - কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।' তাদের বিদ্রোহ করার বিষয়, সত্যানন্দের [illegible] পূজা বন্ধ করে দেওয়া [illegible] ('মুসলমান [illegible] ঠাকুরের পূজা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পাপের কখন পবিত্র হয় না।') তার এক স্পষ্ট ইঙ্গিত এই মুসলিম জনসাধারণের হত্যা ও অত্যাচারের দিকে নির্দিষ্ট নয়; তিনি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। সুপ্রকাশ রায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন: 'আনন্দমঠের সমগ্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে সন্তানদের বিদ্বেষবহ্নি প্রশমিত করার জন্য যে পরিমাণ নীরব, সবংশে সবংশে নিরস্ত্র মুসলমান জনসাধারণের সম্বন্ধে সে পরিমাণই নীরব।'[১২৫]

এ নীরবতা উপন্যাসের থীমের অনুসারী; মুসলিম শাসনে হিন্দুধর্ম বিনষ্ট হয়েছে বলে মুসলিম শাসনের ধ্বংস ও হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় সন্তানদের যুদ্ধের আয়োজন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী ইংরেজ শাসককে অস্বীকার করা বঙ্কিমচন্দ্র তথা বাঙালী হিন্দু বুদ্ধিজীবির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আনন্দমঠ মধ্যবর্তী পথের

হিসেবে, ইংরেজ শাসন অনিবার্য হিসেবে তাদের মনে হয়েছে, 'ইংরেজ রাজ্যে প্রজা-সুখী হইবে - নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে।' মহাপুরুষ ও সত্যানন্দের কথোপকথন নিম্নরূপ :

> যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, 'তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমানের রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। ...
>
> সত্য - মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয় নাই - এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।
>
> তিনি - হিন্দু রাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না - তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। ...
>
> শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, 'হে প্রভু, যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?
>
> তিনি বলিলেন, 'না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।'[১১৫]

ইংরেজ সম্পর্কে 'বঙ্গীয় আর্য'র উক্তি যদি আমরা স্মরণ করি, ইংরেজ রাজত্বকে বস্তুত স্বামী তাদের মঙ্গলের দান হিসেবে দেখেছিল একথা যদি মনে করি, তবে উপন্যাসের এই বক্তব্যে আমাদের অবাক হবার কিছু থাকে না। তবে মহাপুরুষের বক্তব্যে শুধুমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যই প্রকাশিত নয়, উনিশ শতকীয় শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর মনোভাবই সুনিপুণ প্রকাশিত। মুসলিম শাসনে হিন্দুর সর্বনাশ ও ইংরেজ শাসনে তার প্রতিকারের বিশ্বাসটি উনিশ শতকীয় হিন্দু শিক্ষিতের মত বিশ্বাস, বঙ্কিমচন্দ্রেরও।

ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র বিকৃত করেছেন। সন্ন্যাসীবিদ্রোহের আধুনিক দৃষ্টিতে লেখা ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করে একথা বলছি না। কিন্তু বাংলাদেশের তৎকালীন

অরাজক অবস্থার ও সাধারণ মানুষের সম্পর্কে মমতাহীন নিষ্ঠুর অবহেলার দায়িত্বের সিংহভাগ যে ইংরেজের, দেশের অবস্থাকে যে ইংরেজ নতুন [illegible] আরও জটিল ও অরাজক করে তুলেছে, বঙ্কিম এ সম্পর্কে নীরব থেকে [illegible] তথা মুসলিম নবাবশক্তিকেই এ ব্যাপারে পুরোপুরি দায়ী করে ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন। অবশ্য এ বিকৃতি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্তের সাধারণ মনোভাব। আর এই বিকৃতি না ঘটালে বঙ্কিমের পক্ষে উপন্যাসের সমাপ্তির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইতিহাসের এ বিকৃতি সত্ত্বেও তাঁকেও ইতিহাসের মুখোমুখি মাঝে মাঝে দাঁড়াতে হয়েছে। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে সন্তানেরা যে রাজস্ব লুণ্ঠন করে তা ইংরেজের, দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকের বুকের রক্ত জল করা পয়সা; কৃষক অনাহারে মরে আর তার উপার্জন যায় কোলকাতায়; কোলকাতা থেকে [illegible] ছোটে। আর এই লুণ্ঠন রোধ করতে শেষ পর্যন্ত [illegible] ইংরেজকে, কামান বন্দুক নিয়ে। আর বঙ্কিমচন্দ্র না চাইলেও, এ ব্যাপারটি প্রকাশ করে [illegible]। তাই [illegible] সবার শেষে যে ইংরেজের প্রয়োজন ও উপকারিতা [illegible] সত্যানন্দের বুঝতে অসুবিধা হয় না। নতুবা বোঝা তাঁকে এখন ইংরেজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইংরেজের কর্তৃত্ব এই মুসলমানের দুঃশাসন থেকে মুক্ত নয়, সন্তানদের নাশ হবে মুসলমান, একথাও উপন্যাসের চরিত্রের মুখে বারবার শোনা যায়, সমাপ্তির আগেও:

তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কাপ্তেন টমাসকে শান্তি বলেছে:

> সাহেব, ... তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু মোসলমান মারামারি হইতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।

তৃতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে কাপ্তেন টমাসকে ভবানন্দ বলিলেন, 'কাপ্তেন

সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ ? ... ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।'

এইসব সংলাপের সংগে দেবেন্দ্রর নীল প্রসঙ্গের সময় সত্যানন্দর উক্তি - 'আমরা রাজ্য চাহি না ...' ইত্যাদি - স্মরণ করলে বরং মহাপুরুষের উক্তির সংগেই উপন্যাসের গঠনের সামঞ্জস্য বেশী; উপন্যাসের শেষপর্বে সত্যানন্দর - 'এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল' সংলাপ উপন্যাসে কিছুটা বিচ্ছিন্ন মনে হয়। তবে সত্যানন্দর এই সংলাপের মধ্যেই মহাপুরুষ ইংরেজশাসনকে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের যে মধ্যবর্তী পর্ব হিসেবে বোঝানোর সুযোগ পেয়েছেন। আর এই তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় তত্ত্ব। সুতরাং আনন্দমঠের জাতীয়তাবাদ উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু জাতীয়তাবাদের রূপায়ণ ছাড়া আর কিছুই নয়; তাও সম্পূর্ণ হিন্দু জনসাধারণকেও এই জাতীয়তাবাদের সংগে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি, সুশিক্ষিত কিছু আনুগত্যশীল মধ্যবিত্ত এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিল; সুতরাং জনসাধারণকে লুটপাটের লোভে একত্রিত করা হয়েছে। আনন্দমঠের বঙ্কিম জাতীয়তাবাদ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে একথা ঠিক; সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে গান্ধীর রামরাজ্য পর্যন্ত তার প্রভাব লক্ষ্য করার। এমনকি, দেশের জনসাধারণের মূল শত্রু ইংরেজের মুখোমুখি হবার পরের প্রত্যাবর্তন, উপন্যাসের সমাপ্তিতে, তাও ভারতইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে প্রতিফলিত হয়েছে। 'দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধনলাভ ...' ইত্যাদি বলে মহাপুরুষের ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রতিরোধের সংগে গান্ধীর চৌরিচৌরার ঘটনায় 'অহিংসা' লঙ্ঘনের প্রতিবাদে আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা অনেকেরই মনে পড়বে। আর আনন্দমঠের রূপায়িত এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাবেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে

মুসলিম জনসাধারণ শুধু রাজনৈতিক স্রোত থেকে আলাদা হয়ে গেছে; যার সর্বশেষ পরিণতি ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ। সেজন্যই আনন্দমঠের জাতীয়তাবাদ ভারত ইতিহাসে একটি বিষবৃক্ষ বিশেষ; তার ফল আজকেও প্রত্যেক মানুষকেও ভোগ করতে হচ্ছে। কেননা, হিন্দু মুসলমানের মিলিত ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতবাসীর যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বঙ্কিমচন্দ্র তা থেকে অনেক দূরবর্তী হিন্দুর সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথাই বলেছেন, এবং যে ভাষায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নির্দেশ প্রদান করেছেন তা আমাদের আদর্শবাদ থেকে অনেক দূরবর্তী।[125] আর এর ফলে হিন্দু উচ্চ মধ্যশ্রেণীর রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীল অংশও বহুলাংশে প্রভাবিত হলো।[126] এবং সে প্রভাব এক-তরফা আজও বর্তমান।

বিষবৃক্ষের ও দুর্গেশনন্দিনী রচনার কথা বাদ দিলেও, উপন্যাস হিসেবেও আনন্দমঠের ত্রুটি অনেক। তাই সর্বত্র যে কারণে, উপন্যাসের সঙ্গত সাহিত্যিক নিষ্ঠা ও প্রতীতি কোথাও কিছুটা দুর্বল ও আকস্মিক হয়ে পাঠকের বিশ্বাসে আঘাত করে। উপন্যাসে লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করলেও তার সঙ্গে ঘটনা ও চরিত্র পরিবেশন পাঠকের বিশ্বাসযোগ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের কিছু লেখকের কল্পনা কাহিনী বা চরিত্রের সংগঠন সম্পর্কে সীমাহীন থাকতে পারে, অথবা পাঠককে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করানো তাঁর কর্তব্য। এ কর্তব্যচ্যুতি নিশ্চয়ই উপন্যাসিকের পক্ষে গৌরবের নয়।[127] উপন্যাসের শুরুতে মন্বন্তরের পটভূমির যাথার্থ বাদ দিলে, আনন্দমঠ ও পদচিহ্ন গ্রামের সন্নিকটে মুসলিম শাসন কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও সন্তান সম্প্রদায় এর বিশাল দুর্গ আয়োজন ও শাসকের নিশ্চেষ্টতা পাঠকের বিশ্বাসে আঘাত করে; সমানভাবেও অস্বাভাবিকভাবে হেতুহীন, পাঠকের বিশ্বাসযোগ্য উপন্যাসের বাস্তব পটভূমি হিসেবে চিত্রিত হয়নি। অন্য দিকে, বঙ্কিমচন্দ্র কল্যাণী

সুকুমারীর পদচিহ্ন গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ার ক্ষেত্রেও সঙ্গতি আছে, এমনকি, তাদের বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারটিও অসম্পূর্ণ নয় একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু মহেন্দ্রকে সন্তানধর্মে দীক্ষিত করার জন্য এবং কল্যাণীকে বঙ্কিম ব্যাখ্যাত আদর্শ হিন্দু নারীর জীবনের পর্যায়ে স্থাপন করার জন্য লেখকের এই বিচ্ছিন্নতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখানেও কল্যাণীর পুনর্দর্শন ও আত্মহত্যার প্রয়োজন লেখকের শুধু প্লটের দিক থেকে প্রয়োজন হলেও পাঠকের বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। মহেন্দ্রর সন্তানধর্ম গ্রহণে বিলম্ব না ঘটলেও কল্যাণীর মহেন্দ্রর সন্তানধর্ম গ্রহণে নিজেকে বাধা হিসাবে ভেবে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। কিন্তু লেখকের প্রয়োজনেই কল্যাণীকে মৃত্যু থেকে পুনঃ আত্মহত্যার চেষ্টাও করতে হয়, আর এখানেই লেখক আদর্শ হিন্দু নারীর মূর্তি গড়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে পর্যায়ে বদ্ধ রেখেছেন। তার দিকে, জীবনের সঙ্গে কেন্দ্রে মহেন্দ্র সন্তানধর্ম এবং জীবানন্দ শান্তির জীবনের এই পরিণতির [illegible] করতে হয়। আর এভাবেই [illegible] মহেন্দ্রকে দীক্ষা দেবার পরে বর্ণনার পরে মৃত্যু, শান্তির নয়। সন্তানধর্মের সার্থকতার পরেই আবার মহেন্দ্র কল্যাণী জীবিত এই খবর পান। মহেন্দ্রকে সন্তান ধর্মের সুখ শান্তি থেকে সম্পূর্ণ ভাবে ফিরিয়ে দেবার জন্যই লেখককে সন্তান ধর্ম থেকে তাকে অন্যভাবে শান্তির সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু এই অবিশ্বাস্য ঘটনার মাধ্যমে লেখক আরও প্রয়োজন সিদ্ধ করেছেন। জীবানন্দ এসে সুকুমারীকে নিয়ে ভরুইপুরে গেল এবং এভাবে লেখক জীবানন্দের পূর্বজীবন ও জীবানন্দ-শান্তির কাহিনী সূচনার সুযোগ করে নিলেন; অন্য দিকে, জীবানন্দের পূর্বজীবনের সঙ্গে জীবানন্দের কল্যাণীকে দেখে আবার শান্তির সুযোগ নিয়ে তিনি কল্যাণী-জীবানন্দ কাহিনীটি উপন্যাসে যুক্ত করলেন। সমস্ত ঘটনাগুলির মধ্যে যে অবিশ্বাস্যতা আছে একথা লেখক মনে রাখতে

পারেন না আপন স্বষ্টু প্রমাণের ব্যাকুলতায়। সমস্ত উপন্যাস জুড়েই লেখক এইভাবে অবিশ্বাস্য ঘটনার পর ঘটনা জুড়ে কাহিনী গড়ে তোলেন বলে উপন্যাসের চরিত্রসমূহও বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব চরিত্র হিসেবে গড়ে ওঠে না। সেজন্যই, এই উপন্যাসের প্রধান যে চরিত্র সত্যানন্দ, যিনি সমস্ত কর্মকাণ্ডের হোতা ও নেতা, তার চরিত্রও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। ঐ সুন্দর ও সুপুরুষ সন্ন্যাসী পুরুষ [illegible] সাধনায় নিজেই ব্যস্ত থাকেন, একবার সাধনার জন্য বাইরেও যান এমন উল্লেখ আছে, কিন্তু যুদ্ধসংকুলে তাঁর সঙ্গে তাকে কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট দেখা যায় না, অথচ যুদ্ধে জয়লাভের ব্যাপারেই সন্তানদের বুদ্ধির সাধন পূর্ণ করে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের বাসনা। তাঁর দ্বিতীয় চরিত্রের সংকটমুহূর্তে তাঁর গুরু আসবেন, মিথ্যা তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধি থাকবে উদ্দেশ্যহীন ব্যবহৃতেই বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘন করে চরিত্রটিকে প্রায় ঈশ্বর বৈশিষ্ট্য করে ফেলা হয়েছে, উপন্যাসের বাস্তব চরিত্র হয়ে ওঠে নি। অন্য দিকে ধর্মানুরাগ চরিত্রটি, যিনি সত্যানন্দকে [illegible] পরিচয়হীন হবার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের অদ্ভুত শিল্পী উপন্যাসের চরিত্র হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এইসব চরিত্র লেখকের বক্তব্য প্রকাশের বাহন বলে বাস্তব অবাস্তব লেখকের কাছে একাকার হয়ে যায়। ভবানন্দ চরিত্রেও পূর্বসূত্রীভাবে আকস্মিক রূপমোহ ও সেই রূপমোহের জন্য এতদিনের সন্তানধর্মের মুহূর্তে বিসর্জন, এমনকি সাধারণ মানবিক রীতিনীতি লঙ্ঘন, চরিত্রের পূর্বাপর পারম্পর্যসঙ্গতভাবে গঠিত নয়। কিন্তু ভবানন্দ-কল্যাণী-কাহিনী লেখকের একটি প্রিয় সংস্কারকে, 'সতী রমণীর অনুরূপ লাবণ্য, ঐ সংসারে তোমাকে ধিক্।', প্রকাশের বাহন বলে লেখক সেই সংস্কার প্রমাণেই ব্যাকুল; প্রীতি সম্প্রীতির প্রশ্ন তাঁর মনে থাকে না। পুরুষের উপরে সুন্দরী নারীর বিপদ্জনক প্রভাব লেখকের একটি প্রিয় বিষয়। কিন্তু

এই দ্বন্দ্বকে তিনি সমর্থন করতে পারতেন না বলেই তাঁর উপন্যাসে দ্বন্দ্বে বঙ্কিমের চরিত্ররা সর্বদাই শাস্তি পেয়েছে; ভবানন্দকেও তাই মৃত্যু বরণ করতে হলো। অন্য দিকে জীবানন্দ-শান্তি আখ্যানে লেখক তাঁর অন্য এক তত্ত্ব প্রমাণ করার আকুলতায় চরিত্রে ও ঘটনায় প্রচুর অসঙ্গতি আনেন। শান্তি চরিত্রের পূর্বাভিত্তিমান সত্ত্বেও এই চরিত্রের কার্যাবলী রোমান্স উপন্যাসের উপযোগী হয়ে, বাস্তবচরিত্র হিসেবে তাকে স্বীকার করা মুশকিল। তার পুরুষালী, সাধু সেজে, সাধুকে লুকিয়ে আক্রমণ করা, পরে পুরুষবর্জন ও জীবানন্দ সহবাসে পরিবর্তন, তার পুরুষবেশে আনন্দমঠে অবস্থান, যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতিকে আহত করে ঘোড়া থেকে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি অদ্ভুত বিষয় পাঠকের বিশ্বাসের অযোগ্য ঘটনা লেখক যোগ করেছেন। কিন্তু সার্থক সহধর্মিণীতত্ত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে লেখক এইসব অবিশ্বাস্য ঘটনা যোগ করতে বাধ্য হন। অন্য দিকে, মৃত্যুর মত পুরুষ অবহেলা করে যেভাবে জীবানন্দ প্রতিপ্রত্যাবর্তন ঘটান যেন এইভাবে শান্তির সঙ্গে যোগ করে তার শক্তিকে বিশিষ্ট করতে বাধ্য। কিন্তু লেখক/ তত্ত্ব প্রতিপাদনের প্রতিষ্ঠিত আকুলতায় বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্যের ভেদাভেদ স্বীকার করেন না। এই ঘটনার মাধ্যমেই শান্তিকে সাথে আনা, জীবানন্দের সঙ্গে একত্র বাস করেও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির সম্পর্ক বিযুক্ত থাকার সংযম, জীবানন্দের সন্তানধর্ম পালনে সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে বঙ্কিমের আদর্শ 'সহধর্মিণী' হিসেবে চিত্রিত হয়।

এছাড়াও, ভবানন্দের মৃত্যু সত্ত্বেও, জীবানন্দকে বঙ্কিম অলৌকিক উপায়ে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে তোলেন। লেখকের বক্তব্য, 'পাপ। আবার প্রশ্ন কি না। জীবানন্দের ন্যায় পুত্র শান্তির ন্যায় কন্যা। আবার গর্ভে ধরিবে কি ?', তাঁর এই পক্ষপাত স্পষ্ট। কিন্তু পক্ষপাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে লেখক বাস্তব অবাস্তব বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্যের ভেদাভেদ ভুলে গেলেন অন্য

তাঁর ~~[illegible]~~ উপন্যাসে বাস্তব মানুষের জীবনের টানাপোড়েনে স্থানকালবিধৃত বাস্তব মানুষকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি, স্থানকালবিধৃত বাস্তবজীবনের কোন প্যাটার্ন তৈরী করেননি। পরিবর্তে তৈরী করেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশিকতার প্যাটার্নকে আর স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠেছে তার প্রভাবিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মাশ্রিত জীবনের প্যাটার্ন; ভবানী-ব্রজেশ্বর, জীবানন্দ-শান্তি; আর এই প্যাটার্নকে জেনে শান্তি পেয়ে গেছেন আনন্দমঠে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ~~ঠিক~~ মন্তব্য করেছেন:

'বাস্তবিক আনন্দমঠ-এ ঔপন্যাসিক গুণ যে খুব বেশী আছে তাহা বলা যায় না। ..... আনন্দমঠের চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব নহে, তাহাদের এক পদ ~~[illegible]~~ বাস্তবলোকে ও অপর পদ আদর্শলোকে স্থাপিত রহিয়াছে।'[১১৬]

৬.

আনন্দমঠ দেবীচৌধুরাণী সীতারাম এই তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ~~[illegible]~~ তাঁর ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত অনুশীলন তত্ত্বের নিষ্কামকর্মতত্ত্বকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। আনন্দমঠে দীক্ষিত সন্তান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুশীলনের মাধ্যমে নিষ্কামকর্মের তত্ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা আছে; তাঁরা আপন সুখকে বিসর্জন দিয়ে সামাজিক (অবশ্য হিন্দু) সুখের প্রচেষ্টায় ব্রতী। অন্য দিকে, দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে একটি সাধারণ এক নারী প্রফুল্ল নিষ্কাম সাধনায় দীক্ষিত হয়ে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে একটি পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের সুখ শান্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। কিন্তু এই তত্ত্ব প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লেখক এই উপন্যাসে তাঁর শিল্প ~~[illegible]~~ বিষয়গুলিও নিয়ে এসেছেন। ~~[illegible]~~ সমাজনীতি ও কুলনীতি প্রভৃতির মধ্যে বাস্তব মানব সম্পর্কের বাধা-

তাঁর উপন্যাসে বাস্তব মানুষের জীবনের টানাপোড়েন স্থানকালবিযুক্ত বাস্তব মানুষকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি, স্থানকালবিযুক্ত বাস্তবজীবনের কোন প্রতিমূর্তি তৈরী হয়নি। পরিবর্তে তৈরী করেছেন উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশিকতার প্রতিমূর্তিকে তার প্রামাণিকভাবে ফুটে উঠেছে তার প্রসাধিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক জীবনের প্রতিমূর্তি: ভবানীকেন্দ্র, শ্রীমান্‌ আনন্দস্বামীর; তবে এই প্রতিমূর্তিকে ভেঙে স্বাধীন হয়ে পড়েছে আনন্দমঠ। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন:

'বাস্তবিক আনন্দমঠ এর উপন্যাসোচিত গুণ যে খুব বেশী আছে তাহা বলা যায় না। ..... আনন্দমঠের চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব নহে, তাহাদের এক পদ বাস্তবজীবনের, অপর পদ আদর্শলোকে স্থাপিত রহিয়াছে।'[১১২]

৫.

আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম এই তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্বে ব্যাখ্যাত অনুশীলন ধর্মের সিদ্ধান্তগুলিকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। আনন্দমঠে দীক্ষিত সন্তান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুশীলনের মাধ্যমে নিষ্কাম ধর্মের তত্ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা আছে; তাঁরা আপন সুখকে বিসর্জন দিয়ে সামাজিক (অবশ্য হিন্দু) সুখের প্রতি তৎপর কর্মী। অন্য দিকে, দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে একটি সাধারণ নারী গুরুর নিষ্কাম সাধনায় দীক্ষিত হয়ে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে একটি পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের সুখ শান্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। কিন্তু এই তত্ত্ব প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গেই লেখক এই উপন্যাসে তাঁর প্রিয় বিষয়গুলিও নিয়ে এসেছেন। ধর্মতত্ত্বে আত্মপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি যে ব্যক্তিগত মানব সম্পর্কের বাধা-

বাধকতা তথা সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু সমাজের পারিবারিক প্যাটার্নটিকে তিনি উপন্যাসে সযত্নে তুলে ধরেছেন ; উপন্যাসের প্রফুল্লর দীর্ঘ নিষ্কাম সাধনায় এই প্যাটার্নেরই উপযোগী হয়ে উঠেছে । আর ঐ বিশিষ্ট প্যাটার্ন লেখকের কাম্য বলেই উপন্যাসের শেষপর্বে শেষপর্বে এসে প্রফুল্ল আর সংবর্ধিত গৃহকর্ত্রী থাকেনি বরং হয়েছে, সুখী ব্রজেশ্বরকেও। বঙ্কিম প্রকাশিত প্যাটার্নের বাইরে যখনই যায় তখনই সে নিজের সংগে এবং সংগে তার পরিবারের আনুষঙ্গিক জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে, এ ঘটনা বঙ্কিমের সব উপন্যাসেই দেখা যায় । অবশ্য লেখক তাঁর তত্ত্ব প্রতিপাদনের তাগিদেই দেবীচৌধুরাণী প্রফুল্লকে এই তত্ত্ব প্রতিপাদনের সুযোগ দেন নি ; ফলে দীক্ষিত প্রফুল্লর সংসার জীবনের দুর্বিপাক সংগে দেবীচৌধুরাণী প্রফুল্লর দুর্বিপাক সম্ভাব্য পার্থক্য আমরা জানি না । অন্য দিকে, মুসলিম যুগের অরাজক অবস্থা চিত্রিত করে ইংরেজ শাসনের প্রতীক পুরাতনের বিকৃত চিত্র তুলে ধরে ইংরেজ শাসনের সার্থকতা প্রতিপাদনও বঙ্কিমের একটি প্রিয় বিষয় । বিভিন্ন উপন্যাসের পরিস্থিতি ও বিশ্লেষণের মধ্যে তার পরিচয় আছে ; দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসেও অনুরূপ পরিস্থিতি ও তাহার রূপায়িত হয়েছে । ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিপ্লবকে বাঙালী মধ্যবিত্ত যে সুনজরে দেখতো না তার প্রমাণ সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতায় প্রকাশিত । সারা উনিশ শতাব্দী যুড়ে ইংরেজ ও তার দেশীয় অনুচরদের শাসন শোষণে অত্যাচারিত কৃষক সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে ব্যাপক যে যে বিদ্রোহ গড়ে তুলেছে তার সম্পর্কেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী শাসন গোষ্ঠীর সাথেই বিদ্রোহী [illegible] মনোভাব পোষণ করতো । সেজন্যও ইংরেজের শাসন ও শোষণের প্রশংসার সংগে সংগে ঐ ইংরেজের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের বর্ণনাও বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রিত করতেন ; চন্দ্রশেখর আনন্দমঠ সীতারাম আদি উপন্যাসে এই ধারা ই রূপায়িত হয়েছে । ভবানী পাঠকের আত্মসমর্পণ ও আত্ম সমর্পণের মাধ্যমে ইংরেজের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরকে 'প্রকৃত দণ্ডে' গ্রহণের মধ্যে

এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। অথচ উপন্যাসে চিত্রিত পরোপকারী ও প্রজাবৎসল ভবানী পাঠককে কোন্ দোষে দ্বীপান্তর দেওয়া হলো এ বিষয়ে বঙ্কিম নীরব। জীবন নাট্যের নায়িকাকে হিন্দুর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও ভবানী পাঠকের দুর্ভাগ্যকে তিনি বৃটিশ 'ল' অ্যাণ্ড অর্ডার'-এর দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেছেন, সেজন্যই ভবানী পাঠকের দ্বীপান্তর। বৃটিশের সংগে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সংশ্লিষ্ট নবোদ্ভূত বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বিপ্লবকেই প্রাচীন শৃঙ্খলার প্রশ্ন হিসেবেই দেখা পছন্দ করে কেননা হিন্দু কৃষক বিদ্রোহ তাদের শ্রেণীর বিরুদ্ধেই আঘাত হানে। তাই এই বিদ্রোহের প্রাচীন শৃঙ্খলার প্রসংগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। বরং মুর্শিদাবাদের নবাবকে এক জায়গায় রাজা বলা হয়েছে এবং ইংরেজ রাজাকে হিন্দুর সর্বদা মান্য হিসেবে দেখা হয়েছে একথা স্মরণ করিয়ে লর্ড ক্লাইভকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর মনোভাব থেকেই প্রয়োজনে দেবীর কাছ থেকে টাকা নিলেও লর্ড হেস্টিংসের 'ডাকাতি' হিসেবে ঘৃণা করা পছন্দ হয়েছে। তাই এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন আনন্দমঠের ভবানন্দ পরিস্থিতি চিত্রিত হয়েছে ঠিক তেমনি দেবী চৌধুরাণীর ঐতিহাসিক ঘটনা হিন্দু বিদ্রোহ হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছে :

১. কোন্ দেশের মানুষের হিন্দুকে নেড়া মাথায় সোয়াস্তি নাই, টিকি রাখিলে গলগ্রহ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে কি বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, কি বউয়ের পেটে ছেলে রাখিয়া সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার রক্ষে একটা সম্বন্ধ, আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল

গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্ত যায়।[১৩০]

২০ বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক দস্যুভীতি কখনও কোন সভ্য দেশে হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। তখন দেশ অরাজক। মুসলমান রাজা গিয়াছে; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই – হইতেছে মাত্র। তাতে আবার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এ দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। ... অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, ঘরে পর্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এমনি গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। আর কেহ শাসন করে।[১৩১]

আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীর এই পটভূমি প্রায় একরকম, দুটোতেই সম্পত্তিবান মানুষের চোর ডাকাত সম্পর্কে ভীতি প্রবল। কিন্তু আগেও এটা অর্থ লক্ষ্য করার মতো। আনন্দমঠের পটভূমি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেকাল, তাই সর্ব জাতি কুল নষ্ট হবার প্রশ্নও উঠে; ইংরেজ শাসনের শুরুতে দস্যুভীতি থাকলেও, সর্ব জাতি কুল নষ্ট হবার কথা নেই এটা বিশেষ অর্থবহ, হিন্দু মধ্যবিত্তের আবার নৈতিকতার বিশেষ ধারণা প্রসূত বিবরণ। কিন্তু সম্পত্তিবান মানুষের পক্ষে সর্ব বলা হলেও, 'কাড়িয়া' খাওয়ার ব্যাপারটা সহ্য করা সম্ভব নয়। সেজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ভবানন্দ পর্যন্ত চোরকে যথাযথ শাস্তি দিয়ে সমাজ রক্ষা করতে বলেছেন। এই অরাজক অবস্থার উল্লেখের বিপরীতে ইংরেজ রাজত্বে আইনশৃঙ্খলার বিবরণ দিয়ে তিনি ইংরেজ শাসনের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টাই করেন:

ইংরেজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল।[১৩২]

কিন্তু এখানে এসেও বঙ্কিমচন্দ্র থামতে পারলেন না। সামাজিক জীবনের [illegible] ভুলে বঙ্কিম যেমন চরিত্রের শাস্তির ব্যবস্থা করেন, তেমনি বলে জোর করে সম্পদ হরণকারী ভবানী পাঠককে শাস্তিহীন রাখার উদাহরণ সম্পত্তিবানশ্রেণীর নীতিবোধে বিপজ্জনক মনে হল তাই ভবানী পাঠকের শাস্তির ব্যবস্থা হলো :

> ....ভবানী ঠাকুর মনে করিলেন, 'আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন' এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একবারে স্বীকার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস। ভবানী পাঠক হৃষ্টচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।[১৩৩]

প্রফুল্লর নিষ্কামধর্মের শিক্ষাগুরু এতদিন যে ডাকাতিকে নিষ্কামভাবে ঈশ্বর আদেশের অধীন নয় একথা বুঝলেও, ইংরেজের শাসনভার গ্রহণের সংগে সংগে প্রায়শ্চিত্ত করে এই পরিবর্তনে সমাজের প্রয়োজন হবে, কিন্তু সম্পত্তিবান মানুষের শ্রেণীচিন্তা থেকে ভবানী পাঠকের প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব ছিল না বলেই তাই এই শাস্তির ব্যবস্থা। একই প্রয়োজনে চৌর্য বৃত্তির সামাজিক ঐতিহাসিক কারণ সম্পর্কে নিরুত্তর থেকে তার শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছিল।

উপন্যাসের শুরু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত উপন্যাসের মতোই বাস্তব চিত্র দিয়েই শুরু হয়েছিল এবং তার একটিভাবে অন্যান্য উপন্যাসের মতোই প্রকাশ পরেই বঙ্কিমচন্দ্র-তত্ত্ব প্রতিপাদনের প্রয়োজনে উপন্যাসের কাহিনী যথারীতি বাস্তবতা পরিহার করে কল্পলোকের পাত্রপাত্রী হয়। জমিদার হরবল্লভ, তাঁর 'অনেক জমিদারী' 'দোতলা বৈঠকখানা' ঠাকুরবাড়ি, নাটমন্দির, দপ্তরখানা, খিড়কিতে বাগান, পুকুর' ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত, তার বৈবাহিকা প্রফুল্লর মা যার দিন চলে উপবাসে বা চরকায় সুতো কেটে পৈতে তুলে, প্রফুল্লর স্বামী ব্রজেশ্বর, যার প্রফুল্ল ছাড়াও দুই পত্নী আছে; বাড়ির

কর্তা হরবল্লভ সর্বার্থেই কর্তা, আভিজাত্যিক সমাজ কাঠামোর প্রতিভূ, পত্নী বা তিন পত্নীর সুন্দর সুপুত্র পুত্র কেউই তার মতামতকে উপেক্ষা করতে পারে না। বিধবা বার বিবাহ করলেও পুত্রবধূ প্রফুল্লকে গ্রহণ করে না। কিন্তু তিন খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত এই বাস্তব চিত্রণের পরেই বাস্তব থেকে অন্তর্ধানের সুযোগ খোঁজেন লেখক। তার মৃত্যুর পরে একাকী প্রফুল্ল [illegible] সঙ্গে বাস [illegible] করতো এবং এই [illegible] অশাস্তার গ্রামের জমিদার পরান চৌধুরীর গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্তী তাকে হরণ করে 'পরানবাবু জমিদারের বিহার স্থানে' নিয়ে গেল। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শিল্পীসুলভ একটি বাস্তবতার পরিচয় দিলেন, 'এখন [illegible] [illegible] যেহেতু [illegible] [illegible]; পৃথিবী বড় [illegible] রাখিতে পারে নাই', [illegible] [illegible] [illegible] 'রবীন্দ্র [illegible]' বঙ্কিমচন্দ্র সংবাদের প্রধিকাংশ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] বলা বাহুল্য, [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] প্রতিপাদনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁর উপন্যাসে কোন কোন [illegible] [illegible] নির্মাণে ও সংযোজনে (সততো) তাঁর এই [illegible] প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও '[illegible] [illegible] [illegible]' [illegible] [illegible] বিধবা [illegible] দুর্লভচক্রবর্তীর সঙ্গে [illegible] করে ও প্রফুল্ল [illegible] তার [illegible] [illegible] করে তিনি এই (অলৌকিক) প্রকাশ করেছেন। তার এই ঘটনার [illegible] দিয়েই তিনি প্রফুল্লকে দস্যু ভবানী [illegible] বৈষ্ণব কৃষ্ণগোবিন্দদাসের সম্মুখীন করলেন, ফলে প্রফুল্ল বৈষ্ণবের প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করলো, তার পরে পরেই সম্মুখীন করলেন ভবানী পাঠকের এবং অতঃপর প্রফুল্ল চরিত্র লেখকের নিষ্কাম [illegible] প্রতিপাদনের যন্ত্র হয়ে উঠলো। কিন্তু [illegible] তাঁর [illegible] পথে আনতে গিয়ে লেখক বাস্তব প্রবাহকে যথারীতি প্রকাশ করে গেছেন; যাত্র দু'জন মানুষ দেখে পাকী বেহারা, চক্রবর্তী [illegible] [illegible] [illegible] বা কৃষ্ণগোবিন্দের [illegible]

কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে লেখকের কোন প্রশ্ন জাগলো না। কিন্তু লেখকের তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য প্রফুল্লর পাল্কী থেকে পলায়ন জরুরী ছিল বা তার সংসারে প্রত্যাবর্তনের জন্য 'ডাকাত' হলে চলবে না অন্য কৃষ্ণগোবিন্দের গুপ্তধন প্রাপ্তির প্রয়োজন ছিল বলে ঘটনাগুলো ঘটে যায়, বাস্তবতা অবাস্তবতার প্রশ্ন লেখকের মনে জাগে না। দরিদ্র ও লাঞ্ছিত প্রফুল্ল অকস্মাৎ এই গুপ্তধন প্রাপ্তির সুযোগে সৌভাগ্য-বতী হয়ে ওঠে আর তার এই সৌভাগ্যের সময়েই ভবানী পাঠকের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তারপরেই ভবানী পাঠকের নির্দেশিত নির্দেশ ও শাস্ত্রানুযায়ী দীর্ঘ দশ বছরের শিক্ষায় তত্ত্ব দীক্ষিত দেবী চৌধুরাণীর আবির্ভাব। কিন্তু সাধারণ প্রফুল্ল থেকে শিক্ষায় তত্ত্ব দীক্ষিত দেবীর রূপান্তরের কাহিনীর বিবরণ মাত্র এই আছে, ভাল খাওয়া শোওয়া পরন পাড়ন বন্ধ ইত্যাদি, প্রফুল্লর মানসিক রূপান্তরের চিত্র উপন্যাসে উহ্যই থেকে যায়। সেজন্য তার একাদশীর দিন মাছ খাওয়া বা ব্রজেশ্বরকে বলা: 'তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চনা করিতে শিখিতেছিলাম — শিখিতে পারি নাই, তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ — তুমিই একমাত্র আমার দেবতা।'[১৩৪] এই বক্তব্যের মধ্যে পরিপূর্ণ বাঙালী বধূর প্রতীক চিত্রই মাত্র প্রকাশিত, নিষ্কামতত্ত্ব তার মানসিক কোন পরিবর্তন করেছে এমন প্রমাণ এখানে নেই। ড. অরবিন্দ পোদ্দার মন্তব্য করেছেন: 'দেবীর নিষ্কামধর্ম যেন প্রেমপুরের বিগ্রহ অবকাশের মত মূল কাহিনীর সহিত সম্পর্কহীন।'[১৩৫] তাছাড়া পরে শ্বশুরের সম্পত্তিকালের তাড়নায় ব্রজেশ্বরকে অর্থদান বা ইংরেজের সঙ্গে আক্রমণকালেও স্বামী ও শ্বশুরকে রক্ষার আকুলতা, সবকিছুর মধ্যেই তার সাধারণ হিন্দু নারীর মানসিকতাই প্রকাশিত। তাই উপন্যাসের এই পর্বের তত্ত্বপ্রবণতা ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মূল কাহিনীকে ভারাক্রান্তই করেছে মাত্র। তবে এই তত্ত্বপ্রতিপাদনের আকাঙ্ক্ষায় গড়ে তোলা পর্বের সুযোগে সুধীর

সংসার থেকে বিতাড়িত প্রফুল্লকে স্বামীর সংসারে ফিরে যাবার সুযোগ তৈরী করে দিতে পেরেছেন। কিন্তু এই কাহিনী গড়তে গিয়েও ডাকাত ভবানী পাঠকের কর্ণধার নাটকের প্রয়োজন কেন তা উপন্যাসে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। তাই 'ভবানী পাঠক যখন ডাকাইতিতে বাহির হইলেন, প্রফুল্ল ধনের জন্য লইয়া তাদের সঙ্গে চলিল'[১৩৬] এই সংযোগ আমাদের পীড়িত করে। দুঃখীদের অবস্থান যদি প্রফুল্লর পাওয়া ধন দিয়েই কমতে হয় তবে ডাকাতি কেন, আর এর আগেই বা ভবানী পাঠক দুঃখীদের কোন অর্থে সাহায্য করতো? আকস্মিক ধনপ্রাপ্তির জোর আকস্মিকভাবে অদ্ভুত অসাধুতায় ঢেকেছেন হাত থেকে ত্রাণ পাওয়া পর্যন্ত যে দেবী চৌধুরানী পর্ব তাতে আকস্মিকতা প্রফুল্ল, পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কেও সন্দেহেই সংশয় জাগে, কিন্তু প্রফুল্লর দেবী চৌধুরানী হবার প্রাথমিক শর্ত যে ভবানী পাঠকের কর্ণধার রাজা(বা রানী) তৈরী - ভবানী পাঠকের দিক থেকে এই তৈরীর আবশ্যিক ও বিশ্বাসযোগ্য কোন কারণ না থাকায় পরবর্তী অধ্যায় কাহিনী জোট যেন শূন্যের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে, আর উপন্যাসের বিভিন্নস্থানে সংসার জীবন ও স্বামী সম্পর্কে হিন্দু নারীর প্রচলিত সংস্কার প্রকাশ করে স্বামীর ঘরে ফেরার প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই দেবী তাঁর সাফল্যের যখন তা গ্রহণ করে তখন ই এই শূন্যের পরে গড়া দেবী চৌধুরানী-পর্ব শূন্য মাত্রেই পর্যবসিত হয়। আসলে বুঝি যে স্বামী গৃহে প্রবেশের সুযোগ না পেয়ে 'যে পথ খোলা থাকিলে আমি এ পথে আসিতাম না'[১৩৭] - প্রফুল্ল শুধু তাও টিকে থাকার জন্যই তেমন দেবী চৌধুরানী হয়েছিল এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র দেবী সানন্দে প্রফুল্লে প্রত্যাবর্তন করেছে, - এটাই উপন্যাসের গল্প।- সংসারে প্রত্যাবর্তনের পর প্রফুল্ল ও সাগরের সংলাপ এই xx রকম:

> .... সাগর জিজ্ঞাসা করিল, এখন গৃহস্থালিতে কি মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া, রাণীগিরির পর কি বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে? ...

প্রফুল্ল – ভাল বাসিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম, রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম নয়।[১৩৮]

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর জীবনের একটি প্যাটার্নকে রূপায়িত করেন, সে প্যাটার্ন হিন্দু ধর্মাদর্শের অনুমোদিত প্যাটার্ন, যে প্যাটার্নে একমাত্র পুণ্যবতী নারীদিগের ধর্মানুমোদিত ধর্ম ও কর্ম। এই প্যাটার্ন অনুযায়ীই স্বামীকে তার একমাত্র দেবতা বলে মনে করতে হয়, স্বামীর সর্বাঙ্গীণ তুষ্টি নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। অথচ 'বোকা বোকা, ভোলা ভোলা ... গাড়িমু ভাবহীন, পত্নীভাগী, কামুক, তুমি জ্ঞান-শক্তিহীন ব্রজেশ্বরের জন্য প্রফুল্লের প্রবল প্রেমের স্থান সমগ্র জীবন ধরে বাড়িয়া যায় না।'[১৩৯] এই প্যাটার্নেই ব্রজেশ্বরের মতো চরিত্রকে পুরুষ হিসেবে পূজা করতে হয়, তার সেবার ব্যবস্থা করতে হয়, অথচ এই 'স্বভাবতঃ বিবেকহীন, ও ভীরু পুরুষ'।[১৪০] এই প্যাটার্নের জন্যই সপত্নীদের সম্পর্কে কোন বিক্ষোভ নেই, এ আদর্শে প্রীতির ভাব: 'আমাকে ভাগ দাও', অর্থাৎ ঈশ্বরের একাধিক সেবার স্বামীর সর্বাঙ্গীণ সুখের জন্য আত্মবিলোপেই এই প্যাটার্নের অন্তর্নীতি। ঔপন্যাসিক বিবৃত করেন:

> ....প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সকলকে সন্তুষ্ট সুখী করিল। শাশুড়ী প্রফুল্ল হইতে এত সুখী যে প্রফুল্লের হাতে সমস্ত সংসারের ভার দিয়া, তিনি কেবল নাতিদের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে শ্বশুরও প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন। শেষে প্রফুল্ল যে কাজ না করিত, সেকাজ তার ভালো লাগিত না। ... ব্রহ্মঠাকুরাণীও রান্নাঘরের কর্তৃত্ব প্রফুল্লকে ছাড়িয়া দিলেন। ... যেদিন প্রফুল্ল দুই এক থালা না রাঁধিত, সেদিন কাহারও অনুব্যঞ্জন ভাল লাগিত না। ... শেষ নয়ান বৌও বশীভূত হইল। ... প্রফুল্লের যাহা কিছু বিবাদ, সে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে। প্রফুল্ল বলিত: 'আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন

তোমার, তেমনি শ্বশুরের, তেমনি নয়ান বৌয়ের। ... স্ত্রীলোকের পতি দেবতা, তোমাকে তারা পূজা করিতে পায় না কেন?' ...প্রফুল্লর পরামর্শে সব কাজ হইতে লাগিল বলিয়া, দিনদিন লক্ষ্মীশ্রী বাড়িতে লাগিল। ...শেষকালে শ্বশুর নিজে সমাদৃত করিয়া প্রফুল্লে গৃহিণীরোপণ করিলেন।[141]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের হিন্দুধর্মানুমোদিত নারীর জীবনের এই প্যাটার্ন বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট ও অনুমোদিত প্যাটার্ন, সমাজকল্যাণের এই সূত্র ছকের বাইরে যেতে তার নারী চরিত্রগুলি দুঃখ পেয়েছে, তারা শেষটিতে সবাই যাত্রে 'গৃহিণীরোপণ' ঘটেছে। এই ছকের প্রথম ও প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে নারীর একমাত্র দেবতা হিসেবে স্বামীকে দেখা, বহু কথিত সতীত্ববোধ: তথা বহুবিবাহের যাতনায় থেকেও তিনি এই উপন্যাসেই এঁকেছেন। পতি-দেবতা ধারণার প্রফুল্লকে বঙ্কিম স্বয়ং বলেছেন:

> ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দু সমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।[142]

বঙ্কিম অন্য মেয়েদের স্বামী দেবতার মতো পুরুষের স্ত্রী-দেবতার বিধান দেননি, অথচ পুরুষের পক্ষেও কুকুরের চেয়ে স্ত্রী 'আরও পরিষ্কার সান্ত।' কিন্তু এ প্রশ্ন ওঠে না যেহেতু বর্ণাশ্রমে অধিকার ভেদের মতো হিন্দু সমাজ নারী পুরুষের সমানাধিকার স্বীকার করে না। মাইকেলের দুই নারী চরিত্রের সঙ্গে তুলনায় বঙ্কিম মানসিকতার পশ্চাৎমুখী প্রবণতা লক্ষ করার মতো।

পিতাপুত্রের পিতৃআদর্শ সম্পর্ক অন্য দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রজেশ্বর চরিত্রে চিত্রিত করেছেন। পিতা সর্বাবস্থায় মান্য ও পূজ্য, এই পিতৃআদর্শ থেকেই ব্রজেশ্বর তাঁর পিতাকে মান্য করে, নতুবা উপন্যাসে চিত্রিত ব্রজেশ্বরের পিতা ঠিক মান্য চরিত্র নয়। সংসারের কর্তার কর্তৃত্বের দম্ভ, লোভ ও হৃদয়হীনতা ইত্যাদি অনেক অপগুণে চরিত্রটি চিত্রিত। তবুও ব্রজেশ্বর আদর্শ সন্তানের ভূমিকায় পিতার আদেশ মত একটির পর একটি বিবাহ করে, পিতাদের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে না, প্রথম স্ত্রী প্রফুল্লকে ত্যাগ করে পিতার কথামতো আবার বিতাড়িত পরিত্যক্তা প্রফুল্ল স্ত্রীর সংগে একটি রাত্রি কাটানোর লোভও ত্যাগ করতে পারে না। পিতার টাকার প্রয়োজনে শ্বশুরের কাছে অর্থ প্রার্থনা করতে সংকোচ নেই, না পেলে দুঃখ পায়। অন্য দিকে, প্রফুল্লর কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষা করে তার অর্থ পরিশোধের পরিবর্তে যখন তাকে অকৃতজ্ঞ হরবল্লভ ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করে তখন পিতৃভক্তিকে অতীব দুর্বলতায় ব্রজেশ্বর আশ্চর্যভাবে 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম ...' বলে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাবার চেষ্টা করে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তবুও ব্রজেশ্বর চরিত্রের পিতৃভক্তির প্রশংসা করে বলেছেন : 'বঙ্কিম ব্রজেশ্বরের চরিত্রে ... প্রেম ও পিতৃভক্তির সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন।'[১৪৩] কিন্তু 'ক্ষোভোবাদ' ও পুরুষের বীর্য- এই অনাচার পোষণ করা পুরুষের ~~পুরুষত্ব~~ কাছে প্রেম ঠিক সম্ভব নয়, তিনি স্ত্রীর সংগে যা করছেন তা প্রমাণ করে; এবং অন্য দিকে, পিতৃভক্তি দেখাতে গিয়ে তাকে 'মনুষ্যত্বের বিচারে' ব্যর্থ চরিত্র করা হয়েছে।[১৪৪] এই পিতৃভক্তির গোঁড়া হিন্দু ও পতিভক্তা প্রফুল্লও রেখেছে, ব্রজেশ্বরকে বলেছে : 'তোমার বাপকে কিছু বলিও না, আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না। তাতে আমি সুখী হইব না।' পিতার সর্বপ্রকার ইচ্ছা ও অত্যাচার নীরবে ও নতমুখে মানবের সবক্ষেত্রে ...

ঈশ্বরকে প্রশংসা করেছেন : 'দ্রুম গীতর - কালের সাধারে বাইশ বছরের ছেলে - হীনার পার হইলেও সেখানে কথা কহিত না - এখন যত বড় মুখ হয়েছে, তত বড় কথা শীঘ্র বাড়ে।' [illegible] ১৪০ এই কথাটা বঙ্কিম [illegible] সম্পূর্ণ তার হিন্দু কল্পনার [illegible] পর্ব থেকে সাধারণভাবে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনচিন্তা গড়ে উঠেছিল আর তারি ফলে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু সমাজের [illegible] মধ্যে যে প্রশ্ন তোলে তব উঠেছিল, এ সম্পর্কে সেকথা মনে পড়বে। পিতার আনুগত্য ও [illegible] জ্ঞানের [illegible] [illegible] কে বড় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই সময় : 'সমাজ [illegible] হিন্দু, পিতার আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করিবে না।' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হলে এই সম্পর্ক [illegible] যে [illegible] ['] একটি কথামালা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুসলমান নারী সম্পর্কে বক্তৃতা [illegible]। [illegible] দিক থেকে আদর্শ [illegible] [illegible] হিন্দু, [illegible] দৃষ্টিতে [illegible] আদর্শ উদাহরণ নিশ্চয়ই, [illegible] [illegible] [illegible] ব্যক্তিত্বহীন ও [illegible] করে ফেলেছেন। অন্যদিকে, [illegible] এতোদিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে যদি ঈশ্বরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা যেত, [illegible] না [illegible]; [illegible] হয়নি। [illegible] ঈশ্বরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঈশ্বরের [illegible] [illegible] নষ্ট হয়ে যায়, তাই

ভবানী পাঠকের আত্মসমর্পণ ও বিচারে দ্বীপান্তর । ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্তকাল জুড়ে গ্রামবাংলায় ইংরেজ ও ইংরেজ সহায়ক শ্রেণীর শোষণ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে পুরোপুরি সংঘর্ষে লিপ্ত জনসাধারণের কথা যদি মনে করি এবং তার সঙ্গে ইংরেজ ও তার সহায়ক শ্রেণীর বিপদজনক অবস্থাটা যদি স্মরণ করি তবে ভবানী পাঠকের এই আত্মসমর্পণ এই শ্রেণীর পক্ষে অনিবার্য ছিল বলেই মনে হয় । ইংরেজের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত ভবানী পাঠককে তাই বঙ্কিম প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি, কেননা এই সংঘর্ষ পরিণামে শুধুমাত্র ইংরেজকেই শত্রু ভেবে থামবে না, ইংরেজের সহায়ক এই নতুন শ্রেণীটির পক্ষেও বিপদ ডেকে আনবে । তাই ঐ সর্বত্যাগী সত্যানন্দ ও সন্তানদের যুদ্ধজয়ের প্রাপ্ত রাজ্য হাতে না রেখে ইংরেজের হাতে ছেড়ে দিতে বললেন তিনি, তার আমাদের স্বধর্ম জীবনের পাশাপাশি যে সর্বত্যাগী যুবকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংরেজ রাজে সহজ প্রতিবাদী ভাবিয়ে এসেছি । প্রত্যক্ষ যুদ্ধ দিয়ে সত্যানন্দকে চিকিৎসক বলেছেন :

> তোমরা আমাকে পরোপকারায় রত না থাকিতে বলিতেছ । ঠেকা নাহিক তুমি শাসনভার লও না । দুষ্টের দমন রাজা না করেন, ঈশ্বর করিবেন - তুমি আমি কে ?[১৬৩]

অথচ মজার কথা হল এই যে, মুসলিম শাসনের রাজা যখন দুষ্টের দমনে অক্ষম তখন নবীন ইংরেজদের প্রতিভূরা 'মাটি বেচা' নিয়েই মেতে পড়েছিল । অথচ সেটা ছিল প্রত্যক্ষ মুসলিম শাসনের শেষের দশা । ইংরেজ শাসনের প্রসারের সাফল্যে নিয়ে দেখাতে গেলে ইংরেজের শাসন যুগের শুরু সহজ অভিযানের সুনীতিও খুলে যেতে পারে । অথচ 'কাটা মাটি' ইংরেজ শাসনের আসল বিকাশের একটি ধারাবাহী রূপ চিত্রকেই পারে । তাই দুষ্টের দমনের জন্য ঈশ্বরের উপরে দায়িত্বটা ছেড়ে

আত্মরক্ষার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অথচ ড. অরবিন্দ পোদ্দার বিষয়টিকে অন্য ভাবে দেখেছেন। তিনি বলেছেন: 'অবক্ষয়ী বাবু চরিত্রের এই কালিমার পটভূমিতে দেবীচৌধুরাণী - ভবানী পাঠক এবং তাহাদের শিষ্যদের প্রজাপীড়ন-বিরোধী আন্দোলন বিশুদ্ধ গৌরবে এবং উজ্জ্বল মহিমায় দীপ্যমান। ... দেবী ও ভবানী পাঠকের দল দুর্বৃত্ত জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে এবং জমিদারের অনুচরদের দ্বারা লুণ্ঠিত অর্থ কাড়িয়া লইয়া দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করিতেছে। একদিকে দীন আত্মপরতা ও ভোগবাদের নিদারুণ প্রভাব, অপরদিকে অনুশীলন-আদর্শপরতা। বাস্তব জীবনের বীভৎসতা এবং দেবী চৌধুরাণীতে প্রকাশিত এই আদর্শবাদের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান, তাহার ভেতরেই অবক্ষয়ী বাবুদের উদ্ধারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল।'[১২৭] কিন্তু ড. পোদ্দারের এই বক্তব্য যথার্থ বলে গ্রহণ করে এই 'আদর্শ' [illegible] প্রধান চরিত্রটির [illegible] ও [illegible] যেমন, ও বঙ্কিমচন্দ্র যে উপন্যাস রচনা করেছিলেন তা [illegible] উল্লেখই [illegible] প্রমাণ করে। তাছাড়া, প্রফুল্ল যে ডাকাতি করে বা [illegible] ভবানী পাঠককে [illegible] জানানো না [illegible] মতো মানুষকে নিপুণ অর্থ প্রদান করে সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করে ও দেওয়া ইত্যাদি ঘটনাও তাঁর 'দুর্বৃত্ত জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' এবং এই 'আদর্শবাদ' দ্বারা 'অবক্ষয়ী বাবুকে উদ্ধার' করার কথা প্রমাণ করে না। বরং ভবানী পাঠকের কেবল অর্থ সংগ্রহের জন্য কথাই প্রমাণ করে। উপন্যাসের প্রফুল্ল চরিত্র, ব্রজেশ্বর, নিশি ইত্যাদি সব চরিত্রে পিতৃআদর্শ ও জীবনের আদর্শই চিত্রিত। আর এইভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র এক সত্যবতী নারীর স্বামী-গৃহ থেকে বঞ্চিত হয়ে অবশেষে পুনরায় স্বামী-গৃহে প্রত্যাবর্তনের কাহিনীর মধ্যে পিতৃআদর্শ হিন্দু জীবনের পারিবারিকতাই চিত্রিত করেন; স্বামী-স্ত্রী পিতা-পুত্র [illegible] পরম্পরা ইত্যাদি

সংঘর্ষের টানাপোড়েনে তিনি সনাতন ধর্মানুমোদিত জীবনের আদর্শকেই মুখ্য করে তুলে ধরেন। তাই উপন্যাসের শেষে বঙ্কিমের সদম্ভ ঘোষণা: 'আমি নতুন নহি, আমি পুরাতন', কিন্তুর্থে যথার্থ বলেই আমাদের মেনে নিতে কষ্টকর হবে।

বঙ্কিম উপন্যাসের কাহিনী বিভিন্ন থাকলেও মূলে ফিরে কয়েকটি বিষয়ই বার বার তাঁর উপন্যাসে এসেছে, উপন্যাস বিশেষে কিছু প্রকাশের তারতম্য ঘটে মাত্র, বস্তুত প্রশ্নের প্রাধান্যের তারতম্য ছাড়া বঙ্কিম উপন্যাসের বিষয় একটি। দুই নারী পুরুষের জীবনের বিপর্যয় বঙ্কিম-উপন্যাসের একটি প্রিয় বীজ; আবার নারীর হিন্দু আদর্শ নিষ্ঠার ভিত্তিতে দাম্পত্যের বাইরে এসে অন্যায় সম্পর্ক নারী জীবনে দুঃখ ও সেই নারীর প্রতি পুরুষের জীবনে নেমে আসা দুর্যোগ, এটিও বঙ্কিমের প্রিয় বিষয়। স্ত্রী-স্বামীর কৌতুক অভিযোগই এই উপন্যাসের মূলকাহিনী এবং এই কাহিনীর মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে পুরুষের দুঃখ ক্ষোভ ও অন্যদিকে নারীর নির্দিষ্ট আদর্শ-নির্ভর জীবনের বাইরে যাবার স্বাভাবিক পরিণাম চিত্রিত করেছেন। আর এই প্রিয় বিষয়কে রূপায়িত করতে গিয়ে যে পটভূমি তিনি বেছে নিয়েছেন ও সেই পটভূমিকে তার যে ভাবনা থেকে গড়ে তুলেছেন তাও তাঁর প্রিয়: সে ভাবনা উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু বাঙালী মধ্যবিত্তের আত্মগর্বের ইতিহাসের মূল্যায়ন। উপন্যাসের পটভূমি মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালীন বাংলাদেশ, পলাশীর যুদ্ধের বছর আটেক বা তার চেয়ে কিছু বেশী আগে। বঙ্কিম উপন্যাসে এই ধরনের

পটভূমিই গ্রহণ করা যায়, কেননা এই পটভূমি গ্রহণ করলেই মুসলিম শাসনের অরাজকতা প্রমাণ করা যায়, তাতে ইংরেজ রাজত্বের 'ল এ্যান্ড অর্ডার'-এর প্রতি প্রীতি জাগানো সম্ভব, বাঙালী মধ্যবিত্তের যা ছিল ; অন্য দিকে মুসলিম শাসকদের অত্যাচারে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুদের বিপন্ন সামাজিক জীবন দেখিয়ে একদিকে আপাততঃ ইংরেজ শাসনের প্রতি পক্ষপাত ও অন্য দিকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের, বঙ্কিমের ভাষায় 'বাহুবলী আর্য', হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা যায়। ইংরেজের প্রশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজ শাসনের প্রথম থেকেই নবীন উপনিষদকেন্দ্রিক আর্য হিন্দুর সভ্যতা যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও মুসলিমরা বিদেশী এবং তাদের শাসনকালেই যে হিন্দুধর্ম আর সংস্কৃতির ক্ষয় শুরু হয়েছে, এই ধারণা গড়ে উঠতে ও পরিপুষ্ট হয়েছে, একথা অন্যত্র আমরা বলেছি। তারই ফলে ইংরেজ শাসনের মধ্যভাগে বাংলাদেশের দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে ও ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি হয়। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে বঙ্কিমের যুগ পর্যন্ত সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু মুসলমানের জোর সাম্প্রদায়িক দাবী ওঠে নি ; শাসকশ্রেণী বহির্ভূত হিন্দু মুসলিম জনসাধারণ শোষিত মূক ছিল এবং অন্য দিকে সামন্ত-জমিদার শোষক সম্প্রদায়েও তেমনি একইভাবে হিন্দু মুসলিম জমিদারশ্রেণী একইভাবে মিশে গেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে বঙ্কিমচন্দ্র অতএব সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক বিচার করেছেন এবং তার ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যেই করেছেন তিনি সাম্প্রদায়িক দাবী নিয়ে। তার এই দাবী নিয়ে উপন্যাস শুরু তাঁকে করতেই হয়, কেননা তা নাহলে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী শাসক-সম্প্রদায়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই হিন্দুর রাজ শাসনের পবিত্র প্রতিশ্রুতি হিসেবে স্থাপন করা চলে না। যেমন ই, 'রাজসাহেব।

তীব্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ এই উক্তি। মুসলমান ফকির মাত্রেই প্রতিনিধি স্বরূপ মনে করার কারণ নেই।[১২৮] একথা মেনে নিতে অসুবিধে হয়। কেননা, শাসকদের ব্যক্তি দুষ্ট চরিত্র হলে হিন্দুসমাজে তার এতো তীব্র প্রতিক্রিয়া, চন্দ্রচূড়ের বিভিন্ন বক্তব্যে ও হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আকাঙ্খায় যা প্রকাশিত, তা হতো না। সেদিক থেকে চাঁদশাহ-ই বিরল ব্যতিক্রমী চরিত্র, যেজন্য চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ। সাহিত্যিকের, জাতীয়তাবাদীর, হিন্দু-মুসলমান নারী [illegible] মুসলিম শাসকদের [illegible] চরিত্র [illegible] দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন তার এই [illegible] হিন্দুদের [illegible] গৌরব ও [illegible] স্থাপন করেছেন, [illegible] একারণে [illegible] হয়েছে। [illegible] বিভিন্ন [illegible] হিন্দুর প্রাচীন ঐতিহ্য [illegible] উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন এই মনোভাব থেকেই, এমন কি [illegible] গৌরবের পরিচয় [illegible] চেষ্টা করেছেন।

> [illegible] এই আমাদের মতো হিন্দু? [illegible] আমাদের মত হিন্দু? [illegible] এই [illegible] মূর্তি [illegible] লোভিয়াছিল – এই [illegible] শৌর্য, [illegible] পুরুষ [illegible] পড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? .... এই সকল মূর্খ যাহারা পড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], বৈশেষিক,

> এ সকলই হিন্দুর কীর্তি - এখনও লোপ হয় নাই। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।[১৪২]

এই প্রাক্তন 'সুখস্মৃতি'কে মনে রেখে মধ্য যুগের ইতিহাসের দিকে তাকালে 'হিন্দুর' গর্ব করার মতো আর যেন তেমন কিছু চোখে পড়ে না আর তখনই তার অবশ্যম্ভাবী দায়িত্ব পড়ে মুসলিম ধর্ম ও মুসলিম শাসকদের। মুসলিম শাসনে অত্যাচারিত হিন্দু জনসাধারণ আত্মরক্ষায় [illegible], কোনমতে; নতুন সৃষ্টির পরিবেশ না থাকায় শুধু এক 'হিন্দুত্ব' এর [illegible]। আর এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতেই মুসলিম রাজাদের চিত্রিত হয়, শাসকদের অত্যাচার হয়, আর অনিবার্যভাবে মুসলিম শাসনের [illegible] হিন্দু রাজ্য [illegible] রূপে [illegible]। আর একটা বিষয় লক্ষ করবার মতো যে [illegible] উপন্যাসের মতো সীতারাম উপন্যাসেও [illegible] এই ব্যাপারে [illegible] রয়েছে:

> ... [illegible] মুসলমানের দৌরাত্ম্য বড় বেশী হইয়াছে; কিছু দমন হওয়া ভাল। চন্দ্রচূড় ঠাকুরের মনটা যে হিন্দুর আরও পরিষ্কার - মুসলমানের অত্যাচার একবেশী হইয়াছে যে, [illegible] আর [illegible]। তাই সীতারামের রাজত্বের [illegible] না করিয়াই চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার নানা আয়োজন করিয়াছিলেন।[১৪৩]

এই ব্যাপারে চন্দ্রচূড়ের উৎসাহ যে সীতারামের চেয়ে বেশী ছিল তা তার প্রমাণ আছে। [illegible] সৃষ্টির [illegible] সীতারাম [illegible] এবং [illegible] পরে [illegible] সীতারাম বাদশাহের [illegible], তখন

চন্দ্রচূড় সীতারামকে বলছে :

> সীতা আমাদিগের শুভাদৃষ্ট - হিন্দু মাত্রেরই শুভাদৃষ্ট ; কেননা আপনি মুসলমানের ~~দৌরাত্ম্য~~ প্রতি সংস্থাপিত হইলে, মুসলমান হইতে হিন্দুকে রক্ষা করিবে কে ? হিন্দুধর্ম আর দাঁড়াইবে কোথায় ? সীতা আপনারও শুভাদৃষ্ট ; কেননা, যে হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিবে, সেই মনুষ্য জন্ম পূর্ণ ও সৌভাগ্যশালী।[১৭]

এ ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে সীতারাম চন্দ্রচূড়েরই মতো। এ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিম মানস ও ... বঙ্কিম মানসের প্রকাশ এবং বাঙ্গালী নবদ্বীপ ... হিন্দুত্বের ... না আছে ; কিন্তু আজও এ অবস্থায় উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিম মানসের অভ্যন্তরেই প্রকাশিত। মুর্শিদকুলি খাঁ সীতারামের রাজ্য সম্পর্কে তাঁহার ... অনেক নিন্দুকের কথা শুনিয়াছেন ... এই মনোভাবই তুলে ধরে :

> ......শিবুটী বড় ... উন্নতি হইল। কেননা, হিন্দুর হিন্দুয়ানি বড় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, মুসলমানের ভয় তখন হইয়া উঠিল। নিত্য এবং মহাপুরে ... দেবালয় সকল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নিকটে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘরে ঘরে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, দেবোৎসব, নৃত্য গীত, হরিসংকীর্তনে দেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আবার এই সময়ে, মহাপাপিষ্ঠ, অনুদার মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদে আরূঢ় থাকায়, সুবে বাঙ্গালার অন্য সকল প্রদেশে হিন্দুর উপর অতিশয় অত্যাচার হইতেছিল - কেবল, সীতারামের তেমন অত্যাচার আর কোথাও ছিল না। মুর্শিদকুলি খাঁ শুনিলেন, যেখানে হিন্দু ধূলাবলুণ্ঠিত, কেবল এইখানে

তাহাদের বড় প্রভু। তিনি তোরাব খাঁর প্রতি আদেশ পাঠাইলেন -

'সীতারামকে বিনাশ কর।'[১৫২]

প্রসঙ্গত অনেকেরই সীতারাম উপন্যাসের চাঁদ শাহ ফকিরের কথা মনে পড়বে এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলিমবিদ্বেষী বলার বিপরীত প্রমাণ হিসেবে এই চরিত্রটি অনেকেই উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে চাঁদ শাহ ফকিরকে সমদর্শী করেই বঙ্কিমকে সীতারামের 'পাপ' প্রমাণ করতে হয়েছে, ফলে গল্পের প্রয়োজনেই চরিত্রটির সমদর্শী হবার দরকার ছিল, যেমন গল্পের প্রয়োজনে ওসমান ও আয়েষাকে গড়তে হয়েছিল, তার ব্যক্তিগত দৃষ্টি [illegible] প্রমাণের জন্য নয়; বরং ইতিহাসে যেমন মধ্যযুগ মুসলিম শাসনকালকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্যই আকবরকে হিন্দু পুনরুত্থানের প্রবক্তারাও সমদর্শী হিসেবেই আঁকেন; যেন [illegible] বছরের অত্যাচারীদের ধারায় আকবর বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু এখানেও অবশ্য পরিত্রাণ তৈরী করেন, হিন্দুর কাছে মুসলমানের ঐক্য ও প্রয়োজন দেখিয়েছেন, হিন্দুর সাম্রাজ্য স্থাপনের ঐতিহাসিক সম্ভাবনা বঙ্কিম পান না; সীতারামের ব্যর্থতাই তাকে দেখাতে হয়। আর এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবেই স্থির তিনি নিয়ে আসেন তার [illegible] প্রিয় তত্ত্ব - বহুপত্নীকতা ও তার অমোঘ পরিণাম, সীতারামের পতনের কারণ; আবার এই বহুপত্নীকতার কারণ হিসেবেও তিনি আনেন তার অন্যতম প্রিয় তত্ত্ব - নারীর হিন্দু ধর্মাদর্শের সুনির্দিষ্ট জীবনের প্যাটার্নের বাইরে যাবার [illegible] পরিণাম। কেননা, 'বেদনির্দিষ্ট বিবাহে স্বামী ও স্ত্রী কেবল 'তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হোক' বলেন না। পরিপূর্ণ দৈহিক মিলনের চুক্তিও করেন।'[১৫৩] আর শ্রী হিন্দু ধর্মনির্দিষ্ট স্ত্রীর এই জীবনের প্যাটার্ন থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে সীতারামের ও নিজের [illegible] বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

উপন্যাস শুরু হয়েছে মুসলমানের নিরর্থক অত্যাচার ও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার বর্ণনা দিয়ে । একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি । কিন্তু ফকিরের অর্থহীন যে 'নষ্টামি' দিয়ে বিরোধ দেখানো হয়েছে তা শিশুসুলভ ও অবিশ্বাস্য । কিন্তু এখানেও ঔপন্যাসিক 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?' এই হিন্দু-মাহাত্ম্য বাঁচাতে পারেননি । নবাবজাদাকে ফকিরের সঙ্গে এসে যে দু'জন ভিখারী এসে তারাও সম্ভবত হিন্দু এবং তাদের অর্থে 'উচ্চবংশী মানুষ' নবাবজাদার যেমন 'হিন্দু' বোধ হয়, তারাও নবাবজাদাকে মুসলিম ফকিরের অনুগামী [illegible] প্রতিবিধিত করে, হিন্দু হিসেবে কোন একাত্মবোধ বা সহানুভূতি বোধ করে না । অন্যদিকে সীতারাম যখন [illegible] প্রদেশে [illegible] নবাবজাদাকে [illegible] প্রচার করে এবং ফকির যখন [illegible] শ্রুতিতে [illegible] প্রচার করে 'হারেম' দিয়েছে, তখন [illegible] নবাবের বিখ্যাত জাতীয় ও [illegible] সন্দেহ করে পারে না সীতারামের 'অত্যাচার' প্রমাণ । তখনও হিন্দু [illegible] [illegible] [illegible] হিন্দুরাজ সেই প্রকাশ্য ও বিশেষ কোনটাই পূরণ করে না, [illegible] মুসলিম সম্প্রদায় [illegible] [illegible] না-ই [illegible] ও [illegible] সীতারামকে বিদ্রোহী হয়েও [illegible] । কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের এই আবরণ [illegible] লেখক প্রাচীন [illegible] লেখক [illegible] শান্তিপূর্ণ হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার বর্ণনা দেন : 'হঠাৎ সহসা জনতা দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে । একদিকে সব মুসলমান - আর একদিকে সব হিন্দু । [illegible] মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকগুলি [illegible] ভিখারী, হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকগুলি [illegible] - [illegible] । হিন্দুরা [illegible] [illegible] তারা [illegible] মুসলমানেরা

তাহাদিগের হাতে মরিতেছে, অনেকে পলাইতেছে। হিন্দুরা 'মার মার' শব্দে শঙ্কাপ্লাবিত হইতেছে। ... শ্রীর আর লজ্জা নাই, জ্ঞান নাই, ভয় নাই, বিরাম নাই - কেবল ডাকিতেছে - 'মার্ - শত্রু মার্'। সেখানে শত্রু, মানুষের শত্রু, হিন্দুর শত্রু - আমার শত্রু - মার্। শত্রু মার।'[১০৪]

মুসলিম বিদ্বেষ ও হিন্দু মুসলিম সংঘাত এই পটভূমিতে সীতারামের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের পরিবেশ তৈরীর সঙ্গে সঙ্গেই লেখক সীতারামের পতনের কারণ যে মুসলমান নয় সেটিও এর মধ্যেই দিয়ে রাখেন। সীতারামের বিবাহিত স্ত্রী শ্রী ত্রিশূলধারিণী হয়ে এই অভিযান চালাবার জন্য সীতারাম কর্তৃক [illegible] পরিত্যক্ত এবং শ্রীর জীবনের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ ছিল উপন্যাসে এমন কোন প্রমাণ নেই [illegible] শ্রী সীতারামের সম্পূর্ণ [illegible] সীতারাম তার প্রতি পূর্ণ ও [illegible] 'তুমি শ্রী ও এক সুন্দরী।' [illegible] সীতারামের ঔপন্যাসিক [illegible] আবার দিয়ে [illegible] হিন্দুকে হিন্দু না থাকিতে কে বলিবে?' একথা বলেও একই সঙ্গে 'শ্রী এমন শ্রী'। [illegible] না। [illegible] শ্রীর [illegible] ভাবকথা ও [illegible] সীতারামের [illegible] শ্রীর প্রতি ও [illegible] তবুও [illegible], কেননা 'শ্রী এমন শ্রী'। এভাবে [illegible] সীতারামের মুসলমানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করলেন যা পরবর্তীকালে তার জীবনে 'বিপর্যয়' সৃষ্টি করবে। কিন্তু সীতারামের জীবনে মুসলমান [illegible] বিপর্যয় সেখানে শ্রীর একটা [illegible] এবং সেই [illegible] সুন্দরী [illegible] নির্দেশিত ও হিন্দুধর্ম [illegible] একটি [illegible] আদর্শ [illegible], শ্রী সেই [illegible] আদর্শের [illegible] সীতারামের জীবনে বিপর্যয়ের বীজ বপন করেছে ও তাকে [illegible] সীতারামের জীবনে [illegible] এসেছে, [illegible]

বিশ্বাস ও সেভাবেই তিনি কাহিনী গঠন ও ব্যাখ্যা করেছেন । সীতারাম বঙ্কিম উপন্যাসের যথার্থ ভালো চরিত্র, পিতৃভক্ত; পিতার আদেশে স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিল ও ভুলে গিয়েছিল বটে, তবে স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে বঙ্কিম উপন্যাসের যথার্থ চরিত্রের মতো 'পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘনের একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া' স্ত্রীকে গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল । তার এই ইচ্ছার মুহূর্তেই শ্রী প্রিয়প্রাণ স্ত্রী হবার আপন আশা জানাতে পেরে, যেহেতু নারীর প্রিয়তম পুরুষ স্বামীই মাত্র, সেমুহূর্তেই সীতারামকে পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয় । হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের কাজ চলতে থাকে বটে কিন্তু শ্রী সীতারামের মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ছিল যে তার ফলে একদিকে রাজ্য স্থাপন কার্যেও সীতারাম সম্পূর্ণভাবে মনপ্রাণ সমর্পণ করতে পারছিল না আবার অন্যদিকে, অন্য দুই স্ত্রী নন্দা ও রমাকে নিয়ে - 'রমা দুঃখ, নন্দা লক্ষণ' - একদিনের দুটি সন্তানের জনক হয় । সীতারামের এই সকল মানসিক অবস্থায় অন্যদিকে পরিকল্পনায় শ্রীর মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটেছে এবং পরিবর্তন ঘটেছে বাস্তব চরিত্রের উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ঘটনার অনুক্রমে নয়, আকস্মিকভাবে । তীর্থপর্যটনকে পথ চলতে চলতে শ্রীর সঙ্গে জয়ন্তী নামী এক সন্ন্যাসিনীর আকস্মিক ভাবে পরিচয় হয় এবং এই পরিচয়েই আকস্মিকভাবে তার মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটে । জয়ন্তীর সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে যে শ্রী বলেছিল 'আমি ঈশ্বরও জানি না - স্বামীই জানি' বা 'স্বামী ছাড়িয়া ঈশ্বরও চাহি না' সেই শ্রীই এক বৎসর পর বলছে 'যে অনন্ত সুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মে মন স্থির করিয়াছে, তাহা ছাড়া আর কিছুই তাহার চিত্তে যেন স্থান না পায়।' কিন্তু শ্রীর পরিবর্তন উপন্যাসের বিশ্বাসযোগ্য কার্যকারণের ভেতর দিয়ে লেখক প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি । আর এই পরিবর্তিত শ্রীকে আসক্ত সীতারামের সম্মুখীন করেই লেখক সীতারামের জীবনে সংকট সৃষ্টি

করলেন :

> আগুন ছুনিয়াই ছিল, এখন জ্বলিয়া উঠিল; যদি শ্রী না আসিত তবে সীতারামের এত অবনতি হইত কিনা জানি না; কেননা, সীতারাম ত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, রাজ্য শাসনে মন দিয়া শ্রীকে ভুলিবেন ... অসময়ে আসিয়া শ্রী দেখা দিল, সে অগ্নিপ্রায় বালির জীবনের মত আকাঙ্ক্ষার বেগে আসিয়া গেল । ... কিন্তু শ্রী যদি আসিয়াছিল, তবে সে যদি নন্দার মত সাধ্বী স্ত্রী মধ্যে গৃহিণী হইয়া থাকিয়া নন্দার মত সীতার আত্মবৎ সেবাযুক্ত করিত, তাহা হইলেও সীতারামের এতটা অবনতি হইত না বোধহয়, কেননা, কেবল ঐশ্বর্য্য মদে যে অবনতিটুকু হইয়াছিল, শ্রী ও নন্দার সাহায্যে সেটুকুও কিছু শমিত হইত । বা শ্রী, যদি সাধ্বীরূপে গৃহিণী না থাকিয়া, চিত্তবিশ্রামে ভিখারিণীর মত রহিল, তবে সন্ন্যাসিনীর মত না থাকিয়া, সেইমত থাকিলেই এতটা প্রমাদ ঘটিত না । আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে তাহার মোহিনী শক্তির অনেক নাশ হইত । কিছু দিনের পর সাধের চৈতন্য হইতে পারিত ।[১৫৫]

অর্থাৎ সীতারামের সমস্যা মূলতঃ ভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রী সীতারামের স্ত্রী বলে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে এই ভোগের আকাঙ্ক্ষায় কোন অন্যায় নেই । সমস্যা দেখা দিয়েছে শ্রীর প্রচলিত জীবনের প্যাটার্নের পরিবর্তনে, আর এই প্যাটার্নের পরিবর্তন হলেই বঙ্কিমচন্দ্র নারী জীবনের স্থিরাদর্শ প্যাটার্নের পরিবর্তনের বিষময় ফল দেখিয়েছেন । প্রচলিত হিন্দু সমাজাদর্শ অনুযায়ী নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনসত্তা কোনদিনই স্বীকার করা হয়নি আর সেজন্যই বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যে নারীর অধিকার

নিভা স্বামী ও পুত্রের উপরে স্থাপিত রয়েছে। বিশেষতঃ বিবাহিত নারীর হিন্দু শিবাদর্শে জীবনের পরিচর্যা হচ্ছে সর্বসময়ে ও সর্বাবস্থায় স্বামীর অনুগামী ও সহযোগী হওয়া আর স্বামীর মনোরঞ্জন ও তুষ্টিই তাদের ঈশ্বরপ্রাপ্তির একমাত্র পথস্বরূপ; অন্যপক্ষে তাদের অধিকার ও প্রয়োজন কোনটাই হিন্দু শিবাদর্শ জীবনের পরিচর্যায় স্বীকার করা হয়নি। হিন্দু সমাজে এ নারীর এই শিবাদর্শ জীবনের পরিচর্যার বঙ্কিম সমর্থক ছিলেন না? তাঁর সব উপন্যাসেই নারীর এই শিবাদর্শ জীবনের বাইরে বারবার বিদ্রোহ বিপ্লব পরিণতি দেখানো হয়েছে; শ্রী ও এমনই অনুরূপ একটি চরিত্র। স্বামী নিরপেক্ষভাবে ও স্বামী-সতীর সম্পর্কের স্বাভাবিকতা স্বীকার করে মনুষ্যত্বের প্রবৃত্তির শিখায় আর স্বামীকে দেবতা না দেখে কৃষ্ণকে দেবতা ভেবে ও আত্মসমর্পণ ও সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ তথা মুমুক্ষুধর্মপালনের আকাঙ্ক্ষায় তার শিবাদর্শ নারীজীবনের পরিচর্যা থেকে সরে আসা তার কাছেই হলো সীতারামের জীবনের চরম পরিণতি। সতীর স্বামীসেবা যে কর্তব্য তা শ্রীর মুখ দিয়ে সেকথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: 'স্বামিসেবায় যে ধর্ম, তাহাতে সর্বত্র কর্মফল সমর্পণপূর্বক আমার নিত্য অনুসন্ধান করিলেই হইবে, নচেৎ হইবে না? স্বামীসেবা কি তোমার অনুমোদ্য কর্ম নহে?'[157] শ্রী-সীতারামের কথোপকথনেও বঙ্কিমচন্দ্র একথা বলেছেন:

শ্রী - যেদিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সেদিন গিয়াছে।

সীতারাম - সেকি? কেন গিয়াছে? কিসে গিয়াছে?

শ্রী - আমি সন্ন্যাসিনী; সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়াছি।

সীতারাম - পতিশুশ্রূষার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। পতি সেবাই তোমার ধর্ম।[158]

এইভাবে নিষ্কাম ধর্মের তত্ত্বের সাহায্যে তিনি প্রচলিত সনাতনধর্মের হিন্দু ধর্মাদর্শের নারী জীবনের প্যাটার্নকেই সমর্থন করলেন, 'অনুশেয়' ও 'অনাসক্ত' কর্ম হিসেবেই তিনি বিবাহিত নারীর 'পতিসেবা'-কেই নির্দিষ্ট করলেন 'ধর্ম' হিসেবে। এই প্রসঙ্গে 'যে স্ত্রী সন্ন্যাস, জ্ঞানযোগ ও মন্ত্রাস্ত্রের সাহায্যে নিজেকে অপূর্ব শক্তির আধারে পরিণত করিয়াছিল, সেই স্ত্রীই এই হিন্দু নারীর প্রকৃত মূল কারণ। তাহার শক্তিই সীতারামকে দুর্বল এবং তাহার দুর্বলতাই সীতারামকে উন্মার্গবর্তী চিত্ত করিয়াছিল।' - এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে ড. অরবিন্দ পোদ্দার যখন যোগ করেন: 'স্ত্রী-মানবিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে তাদের সম্পর্কহীন কতকগুলি ধর্মীয় জ্ঞান ধারণা, আচার আচরণ, তত্ত্বাদেশের যোগ সম্বন্ধি। এই পরম ধর্মবোধই প্রকৃত সমস্ত বিপত্তির মূলে। কে জানে, অন্তরে অন্তরেতন মনেও বঙ্কিমচন্দ্র এই পরম (absolute) ধর্মাচরণের ব্যর্থতা ও নিষ্ফলতার কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কিনা।'[১৫২] তখন তাঁর এই মন্তব্যের যথার্থ সম্পর্কে সন্দেহ থাকে। কেননা, শ্রী ও বিবাহিত নারীর হিন্দু ধর্মাদর্শ অনুমোদিত (absolute) ধর্মাচার তথা জীবনের প্যাটার্ন থেকে (পতিসেবায় স্বামী-সম্ভোগ ও স্বামী-অনুসরণ) বিচ্যুত হয়েছিল বলেই তার ও সীতারামের উভয়ের জীবনেই বিপত্তি ঘটেছিল। যে ধর্মীয় বোধ থেকে সে নতুন জীবনের প্যাটার্নকে গ্রহণ করেছিল তা হিন্দু সমাজাদর্শ অনুমোদন করে না। সেই ধর্মবোধ মানব সম্পর্কের দিক থেকে নয়, বরঞ্চ হিন্দু শিবাদর্শ নারীজীবনের প্যাটার্নকে ছেড়ে দেওয়ায় যে ব্যর্থতা ও নিষ্ফলতা - সেটাই বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন। তাই 'আসক্তি' যুক্ত হলে যেহেতু ভালো লাগা মন্দলাগার প্রশ্ন আসে, প্রাধান্য ব্যবহারও যেহেতু তখন 'পতিসেবা' ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রিত করবে, তাই এই সেবা আসক্তিহীন ও 'অনুশেয়' কর্তব্য মাত্র; অতএব বিপরীত দিক থেকে

গ্রন্থির ব্যাপারটা বাদ দেওয়া সম্ভব হয়েছে ।

ভবিষ্যৎ গণনার বিষয়টিও গল্পের বিশেষ পর্যায়ে প্রচুর প্রভাব ফেলেছে । স্ত্রী-র ভবিষ্যৎ গণনায় 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রীর' সংবাদটি না থাকলে গল্পের বর্তমান গঠন সম্ভব ছিল না । যদি, দুর্গা থেকে পলায়নকালে যদি স্ত্রী তার এই ভবিষ্যৎ গণনা না জানতো তবে সীতারামকে ত্যাগ করার আকাঙ্ক্ষা জাগতো না এবং জয়ন্তীর মতোও সমাজ হয়ে পরিবর্তিত মানসিকতায় সীতারামের লক্ষ্মীর হয়ে সীতারামের পতনের কারণ হতে হতো না । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসেই ভবিষ্যৎ গণনাকে উপন্যাসে এমনভাবে ব্যবহার করেন যেন মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ আগাগোড়াই পূর্বনির্দিষ্ট এবং মানুষ যতই চেষ্টাই করি এই পূর্ব-নির্দিষ্ট জীবনকে কোনভাবেই পরিবর্তন করতে পারবো না । আর এই ধারণা থেকেই যেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি অদৃষ্টের স্রোতে ভেসে যাবার জন্যই তৈরী হয়ে থাকে । মধ্যযুগীয় এই ভবিষ্যতের অতিপ্রাকৃত ধারণা, আধুনিক আত্মপ্রত্যয়শীল সমাজ ও জীবনের বিপুল পরিবর্তনকারী ঊ-শতী মানুষের আত্মশক্তি একেবারে বিশ্বাসহীন করে এই ধারণা মানুষকে অদৃষ্টের হাতে এক ক্রীড়নক মাত্র পরিণত করে । তার বিভিন্ন রচনা পাঠ করায় প্রায়শঃ এই ধারণা পাঠকের মনে বদ্ধমূল না হয়ে যায় না যখন প্রথম থেকেই জ্যোতিষ গণনার মতো একটি অবৈজ্ঞানিক ও অনুমাননির্ভর বিষয়কে গল্প বিষয়ের মূলে চরিত্রের মনে প্রবেশ করানো হয় তখন চরিত্রের পরবর্তী সুখের বা দুঃখের পরিণতিকে মানানো বিষয় বলে মনে হয় । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে ভবিষ্যৎ গণনা প্রথমে মনে নিয়ে পরে যেন জ্যোতিষের ভবিষ্যৎবাণী প্রমাণেই লেখকের লক্ষ্য হয়ে পড়ে । সীতারাম উপন্যাসেও লেখক সীতারামকে না মানলেও পাঠককে মেনে নিয়ে ভবিষ্যৎ গণনাকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, গণনায়ের মূল যে অনিবার্য নয়, মানানো যায়, উপন্যাসের গঠনেই তা বোঝা যায় । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র-এর মতো বিশ্বাসী হিন্দু ধর্মাদর্শের পক্ষে এই পূর্বনির্ধারিত ধারণার

ধারণা অনিবার্য ছিল তার এই ধারণাই অবশেষে চতুর্বর্ণভিত্তিক সমাজের যথার্থ প্রতিপাদনে সক্ষম । হিন্দুআদর্শ হিন্দুজীবনের আচারে বিশ্বাসী জন্যই বঙ্কিম উপন্যাসের বারবার জ্যোতিষ প্রাধান্য পায়, পুরোহিতশাসিত অভিজাতদের মধ্যে পাঠকের পরিচয় ঘটে তার বর্ণনাবলেও এমনকি নির্যাতিত নিম্নবর্গেরই আদর্শের থেকে দিতে বাধা থাকে না । 'বিষবৃক্ষ' থেকেই দেবীচৌধুরাণী প্রমুখ বাঙালীহিন্দু মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক পৌরাণিক পৌরাণিকতার দুটি মত বজায় রাখাই অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো জ্যোতিষ ভবিষ্যদ্বাণী অভিপ্রায়ে সীতারামেরও প্রয়োজন ছিল । ভবিষ্যৎ বলবার সুযোগই গঙ্গারামের কাহিনী উপন্যাসে এক বিরাট স্থান গ্রহণ করেছে । গঙ্গারামকে কৌশলে বাঁচাতে এসেছেই ভক্তিমতী উন্মাদিনী শ্রী সীতারামের সাথে সংঘর্ষ থেকে পলায়ন ও হিন্দু রাজ্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় ব্রহ্মচর্যের বুদ্ধি তার এ ব্যাপারে গঙ্গারাম সীতারামের সহায়ক । কিন্তু সীতারামের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্রে সীতারামের প্রতিশোধ কাহিনী এখানে মুসলমানের অন্যতম অধীনস্থ ও পরিচালিত রাজ্যের রাণীরই বিরুদ্ধে গড়ে ওঠেনি । এই মুসলমানের সহায়তা নিয়ে ষড়যন্ত্রে একদিকে সীতারামের ধ্বংস ঘটানোর আয়োজন করে তুলেছেন এবং অন্যদিকে শ্রী-কে ভবিষ্যৎ গঙ্গারামের মধ্যে রেখে তুলেছেন । কেননা এই মুসলমান শক্তিই সীতারামের হিন্দুত্বের মূল অন্তরায় ও সহকারীরাজে বিচার ও দণ্ড, তার প্রতীক এই দণ্ড থেকে বাঁচাতে গিয়েই 'মুক্তা' হিসেবে শ্রী-কে সীতারামের সম্মুখীন হতে হল, তারপর থেকেই সীতারামের দুঃখ পতনের শুরু । অন্যদিকে গঙ্গারাম পুনরায় শিবির থেকে যোগ দিয়ে সীতারামের পতনে সহায়তা করতে গিয়ে তাকে বলেই সীতারামের হাতে তার মৃত্যু ঘটে । তবে এখানেও সীতারামের গঙ্গারাম রেখাতে কাছারের শব্দের নেবার সময়ে শ্রীকে দেখে গঙ্গারামের প্রায় সীতারামের হাতের সামনে মাথা পেতে দেওয়া আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র । সীতারামের মুসলমান লেখকের কাছে অবশ্য যেহেতু শ্রী সীতারামের বিবাহিতা ১ম স্ত্রী এবং সেজন্যই

কাব্যের মুখ থেকেও লেখক সীতারামকে যেন [illegible] মোহান্তদের [illegible]
রক্ষা করেন ; কিন্তু সীতারাম [illegible] হয়ে শান্তি থেকে বাধা [illegible]
[illegible] ফেলে দিয়ে সীতারামের হাতে মৃত্যুবরণ করে শ্রী [illegible] ও
সামাজিক শান্তি দুটিকেই নষ্ট করে ফেলে। অন্যদিকে, সীতারামের [illegible]
[illegible] সাংসারিক জীবনের [illegible] শ্রী [illegible]
[illegible] করে নারীর [illegible] জীবনের [illegible]
[illegible]। শ্রীকে [illegible] বিশ্লেষণ করে শ্রীর [illegible] ও
[illegible] নারীর [illegible]। কিন্তু
[illegible] শ্রী [illegible] সীতারামের
[illegible] সীতারামকে [illegible] করে সীতারাম ও [illegible]
[illegible]। কিন্তু [illegible] শ্রীর [illegible]
[illegible] সীতারামের [illegible]। কিন্তু [illegible]
[illegible] সীতারামের [illegible] শ্রী [illegible]
মৃত্যুবরণ করলো। কিন্তু [illegible] সীতারামের [illegible]
[illegible] সীতারামের [illegible]
[illegible] না [illegible]।
সীতারামের [illegible]
এই [illegible] না করে অকস্মাৎ সীতারামের [illegible]
[illegible] এই [illegible] না, লেখকের [illegible]
[illegible]। [illegible] এই [illegible]

যেভাবে উগ্র আক্রোশে রবীন্দ্র বসু বিজাতীয় পুলিশ সম্বন্ধে লিখেছেন [illegible] তাতে পাঠকের একথা মনে হওয়া অসঙ্গত নয় যে, নিঃসম্পর্কিত নারী পুরুষের পারস্পরিক অসংসর্গ না থাকাই ভালো। নারীর হিন্দু সমাজনির্দিষ্ট জীবনের [illegible] বিপুলই প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীকে দুর্বৃত্তদের লালসার শিকার হবে এবং সমাজের পক্ষে কলঙ্কজনক এই অবস্থা থেকে, নিঃসম্পর্কিত নারীপুরুষের [illegible] আজই এরকম ঘটনার সৃষ্টি হয় বলেই চিন্তা করা হয়েছে।

কিন্তু হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে জীবনবোধের [illegible] খ্রীষ্টানদের পতন জাতি [illegible] দেখা দিতে পারে না, কেননা খ্রীষ্টানদের [illegible] নষ্ট। খ্রীষ্টানদের প্রায় [illegible] খ্রীষ্টানদের পতন। [illegible] হিন্দু [illegible] প্রতিপালনে [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] দেখান [illegible]। [illegible] হিন্দু [illegible] খ্রীষ্টান [illegible] [illegible] এই [illegible] পরিবর্তন [illegible] [illegible] পুলিশ [illegible] হিন্দু [illegible] [illegible] না। [illegible] এই [illegible] লেখক [illegible] [illegible] পুলিশের [illegible] এক প্রধান [illegible] (' [illegible] ') লিখেছেন, যেখানে [illegible] [illegible] : এখানে লেখকের [illegible] প্রয়োজন পুলিশের [illegible] হয়নি। কিন্তু এখানে লেখকের প্রয়োজন [illegible]

চন্দ্রচূড় ও শ্রীকে দেখে মুসলমান সেনা তাহাদিগকে পুরবাসিনী দেবী মনে করিয়া সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল।"[১৬৫] তন্ত্র পুরাণে এই রকম সংযোগ প্রয়োগ উপন্যাসে প্রচুর। তবে তন্ত্রপুরাণের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে আসলে এগুলোর বাস্তব অবাস্তব একাকার করে গেছেন। সীতারাম, চন্দ্রশেখর মৃণালিনী ও কপালকুণ্ডলা ইত্যাদিতেও উপন্যাসে তন্ত্র পুরাণের প্রভাবেই প্রয়োগ করতে হয়। তবে বঙ্কিমের ক্ষেত্রে তন্ত্র পুরাণের অতিপ্রাকৃত প্রসঙ্গ সবই বাস্তব কার্য-কারণ সম্পর্কে ঘটিত বর্ণিত ও পরিবর্তিত হয় না, সমালোচক এর অলৌকিক পরিবর্তনই দেখেছেন। প্রকৃত পক্ষে উপন্যাসের মধ্যেই তন্ত্র পুরাণ এসেছে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছেন।"[১৬৬]

xxxxউল্লেখপঞ্জীxxxxx

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

(বঙ্কিম উপন্যাসের সমস্ত উদ্ধৃতি বঙ্কিম রচনাবলীর (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ) ১ম খণ্ড থেকে নেওয়া। সেজন্য কোথাও কোথাও শুধুমাত্র পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে)

১। বাংলা উপন্যাসের ধারা, অচ্যুত গোস্বামী, পৃ. ৫১ কলকাতা, ১৩৬৮

২। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃ. ১৭৬ কলকাতা, ১৩৮৩ (দ্বি)

৩। বঙ্কিমমানস, অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ. ৫৩ কলকাতা, ১৩৭৫

৪। ঐ পৃ. ৫৭

৫। সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা, মুখিয়া, থাপার ও বিপানচন্দ্র, পৃ. ৪৬ কলকাতা, ১৩৭৮

৬। ঐ পৃ. ৪৬

৭। ঐ পৃ. ~~xxxx~~ ৫১

৮। উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত, পৃ. ৪৩ কলকাতা, ১৩৭৮

৯। সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা, পৃ. ৪০

১০। উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, পৃ. ৩১

১১। বঙ্কিমচন্দ্র, সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃ. ৭৩, কলকাতা, ১৩৪৪

১২। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ১, পৃ. ১৩৪

১৩। ঐ, পৃ. ১৩৩

১৪। বঙ্কিম রচনাবলী ১, পৃ. ১৩৭, কলকাতা, ১৩৬৩

১৫। ঐ, পৃ. ১৩৯

১৬। বাংলা উপন্যাসের স্বরূপ ও প্রকৃতি, কার্তিক লাহিড়ী, পৃ. ২৮ কলকাতা, ১৩৭৯

১৭। রচনাবলী ১, পৃ. ১৩১

১৮। ঐ, পৃ. ১৩৬

১৯। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫৯, কলকাতা, ১৩৬৪

২০। কার্তিক লাহিড়ী, পৃ. ৩৫

২১। রচনাবলী ১, পৃ. ১৭২

২২। ঐ, পৃ. ১৬২

২৩। ঐ, পৃ. ১৬৭

২৪। কার্তিক লাহিড়ী, পৃ. ৩৪

২৫। রচনাবলী ১, পৃ. ১৬১

২৬। ঐ, পৃ. ১৭০

২৭। ঐ, পৃ. ১৬৩

২৮। ঐ, পৃ. ১৭৪

২৯। কার্তিক লাহিড়ী, পৃ. ২৯

৩০। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৬১

৩১। প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, পৃ. ১৭

৩২। অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ. ৫৮

৩৩। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১১
কলকাতা, ১৯৭৬,

৩৪। রচনাবলী ৬, পৃ. ২৮১

৩৫। ঐ পৃ. ২৯০

৩৬। ঐ, পৃ. ২৪৫

৩৭। রচনাবলী ২ পৃ. ৩২৭ কলকাতা, ১৩৮৭.

৩৮। কার্তিক লাহিড়ী, পৃ. ৩৬

৩৯। প্রফুল্ল কুমারদাশগুপ্ত, পৃ. ২০০

৪০। ঐ, পৃ. ২০৪

৪১। রচনাবলী ৬, পৃ. ২২৪

৪২। ঐ, পৃ. ২২৮-৯

৪৩। ঐ, পৃ. ২২৯

৪৪। ঐ, পৃ. ২০৮

৪৫। ঐ, পৃ. ২২৪

৪৬। ঐ, পৃ. ২৩৪

৪৭। প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত, পৃ. ২২৬

৪৮। রচনাবলী ৬, পৃ. ২৫০

৪৯। অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ. ৫১

৫০। ঐ, পৃ. ৬০

৫১। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১৯

৫২। রচনাবলী ৬, পৃ: ২৬৯

৫৩। ঐ, পৃ: ৫০৯

৫৪। ঐ, পৃ: ৩০৯

৫৫। ঐ, পৃ: ৫৫০

৫৬। অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ: ৭৫

৫৭। রচনাবলী ৬, পৃ: ২৬২

৫৮। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১০২

৫৯। ঐ, পৃ: ১২৯

৬০। অশ্রু ও গোস্বামী, পৃ: ৭৫

৬১। রচনাবলী ৬, পৃ: ২৬৬

৬২। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৬৩

৬৩। রচনাবলী ৬, পৃ: ২৭২

৬৪। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ১৭২

৬৫। রচনাবলী ৬, পৃ: ৩৪০

৬৬। [illegible], পৃ: ১০১

৬৭। অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ: ৪ ১১

৬৮। রচনাবলী ৬, পৃ: ৫৬৮-৯

৬৯। অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ: ১৭

৭০। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৬৫

৭১। রচনাবলী ৬, পৃ: ৪০০

৭২। ঐ, পৃ: ১২৫

৭৩। রচনাবলী ৬, পৃ. ৪১৩

৭৪। ঐ পৃ. ৪৭৩

৭৫। ঐ, পৃ. ৪৩২

৭৬। ঐ, পৃ. ৪৬২

৭৭। ঐ পৃ. ৪৬৪

৭৮। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩৪

৭৯। রচনাবলী ৬ পৃ. ৪৭৩

৮০। The Bengali Novel, Humayun Kabir, P. 17. Calcutta, 1968.

৮১। রচনাবলী ৬, পৃ. ৪৫২-৩

৮২। ঐ, পৃ. ৪৭৩

৮৩। ঐ, পৃ. ৪৩৫

৮৪। ঐ পৃ. ৪৩৬

৮৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৭৩

৮৬। কার্তিক লাহিড়ী, পৃ. ৫১

৮৭। অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ. ৬২

৮৮। রচনাবলী ৬, পৃ. ৪৭৫

৮৯। হুমায়ুন কবীর, পৃ. ১৬

৯০। রচনাবলী ৬, পৃ. ৪৪২

৯১। ঐ, পৃ. ৪১৬

৯২। ঐ, পৃ. ৪৬১

৯৩। প্রভাত গোস্বামী, পৃ. ৭৬

৯৪। অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ. ৬৩

৯৫। শিবাজী, যদুনাথ সরকার, পৃ. ২৮-২ কলকাতা, ১৯৭৩.

৯৬। ঐ, পৃ. ২২

৯৭। ঐ, পৃ. ২২০

৯৮। ঐ, পৃ. ২২৩-৪

৯৯। দ্র. সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মের ঐতিহাসিক রচনা, পৃ. ৪৬

১০০। দ্র. ঐ পৃ. ৪৭

১০১। রচনাবলী ৯, পৃ. ৭২০

১০২। ঐ, পৃ. ৬৬৫

১০৩। ঐ, পৃ. ৬২৩

১০৪। ঐ, পৃ. ৬২৩

১০৫। ঐ, পৃ. ৭২৩

১০৬। ঐ, পৃ. ৭২৩

১০৭। ঐ, পৃ. ৭২৩

১০৮। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে রাজসিংহ, অমূল্যকুমার সিকদার, পরিচয়,
চৈত্র সংখ্যা - আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৭৩

১০৯। ঐ, পৃ. ৪৪৮

১১০। ঐ, পৃ. ৪৬৫

১১১। রচনাবলী ৯, পৃ. ৭২১

১১২। ঐ, পৃ. ৭৫০

১১৩। রচনাবলী ১, পৃ. ৭৫০

১১৪। রচনাবলী ২, পৃ. ৬০১

১১৫। রচনাবলী ১, পৃ. ৭৬৭

১১৬। দ্র. চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ভবতোষ দত্ত, পৃ. ১৪৮-৯
কলকাতা, ১৯৭১,

১১৭। অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ. ১০৬

১১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, [illegible],
কলকাতা, ১৯৮০
পৃ. ৭০

১১৯। রচনাবলী ১, পৃ. ৭২৭

১২০। ঐ, পৃ. ৭৩৭

১২১। ঐ, পৃ. ৭৪২

১২২। ঐ, পৃ. ৭৫৭

১২৩। দ্র ঐ, পৃ. ৭৬

১২৪। ঐ, পৃ. ৭৭৫

১২৫। কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্র, সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২৫২
কলিকাতা, ১৩৭০.

১২৬। (ক) রচনাবলী ১, পৃ. ৭৮৭

১২৬। (খ) সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২৫২

১২৭। মিত্র, পৃ. ৭৫

১২৮। কার্তিক লাহিড়ী, পৃ. ৭১

১২৯। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৭৭

১৩০। রচনাবলী ১, পৃ. ৭২৭

১৩১। ঐ, পৃ. ৬১২-৩

১৩২। রচনাবলী ৬, পৃ. ৮৭১

১৩৩। ঐ, পৃ. ৮৭১

১৩৪। ঐ, পৃ. ৮৪৮

১৩৫। অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ. ১১৬

১৩৬। রচনাবলী ৬, পৃ. ৮১১

১৩৭। ঐ, পৃ. ৮০৭

১৩৮। ঐ, পৃ. ৮৭০

১৩৯। সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১৬৪-৫

১৪০। সুকুমার দাশগুপ্ত, পৃ. ৩২১

১৪১। রচনাবলী ৬, পৃ. ৮৭০-১

১৪২। ঐ পৃ. ৮১০

১৪৩। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৭১

১৪৪। সু. সেনগুপ্ত, পৃ. ৩৭

১৪৫। রচনাবলী ৬, পৃ. ৭১৭

১৪৬। ঐ, পৃ. ৮৬

১৪৭। অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ. ১১৭-৮

১৪৮। সেনগুপ্ত, পৃ. ৩৭১

১৪৯। রচনাবলী ৬, পৃ. ৮১৩

১৫০। ঐ, পৃ. ৮৮১

১৫১। ঐ, পৃ. xxx ১১৭

১৫২। ঐ, পৃ. ৮১৭

১৫৩। সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২১৩

১৫৪। রচনাবলী ১, পৃ. ৮৮১

১৫৫। ঐ, পৃ. ১০৮

১৫৬। ঐ, পৃ. ১৪০

১৫৭। ঐ, পৃ. ২০০

১৫৮। ঐ, পৃ. ২১১

১৫৯। জ্যোতিষ ঘোষাল, পৃ. ১২২

১৬০। রচনাবলী ১, পৃ. ১০৩

১৬১। কার্তিক লাহিড়ী, পৃ. ৮২।